নবাব

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

১৩২৮

আড়াই টাকা

৬১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয় হইতে
শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচি কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

কান্তিক প্রেস
২২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত

নবাব

প্রথম পরিচ্ছেদ

ডাক্তার

শীতের প্রভাত। কুয়াশায় চারিধার তখনও ঢাকিয়া রহিয়াছে। প্রকাণ্ড এক গৃহের দ্বারে সজ্জিত গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। রবার্ট জেঙ্কিন্স আসিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইলে ভিতর হইতে নারী-কণ্ঠে কে কহিল, "বাড়ীতে এসে খাবে ত?"

রবার্ট জেঙ্কিন্স শব্দ লক্ষ্য করিয়া পশ্চাতে ফিরিলেন। মুখে তাঁহার ঈষৎ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "[illegible] জেঙ্কিন্স্।" সাধারণের সম্মুখে এই নারীকে 'মাদাম' বলিয়া সম্বোধন করিতে জেঙ্কিন্সের একটু চাড় দেখা যাইত। ইহাতে মনের মধ্যে তিনি কেমন-একটু আনন্দ বোধ করিতেন! যে নারী অকুণ্ঠিত চিত্তে আপনার সর্ব্বস্ব তাঁহাকে দান করিয়াছে, তাঁহার অবসরটুকুকে আনন্দের বিভায় মণ্ডিত করিয়া তোলে, তাহাকে 'মাদাম' বলিয়া আপ্যায়িত না করিলে বিবেকেও যে একটু আঘাত লাগে! জেঙ্কিন্স বলিলেন, "আমার জন্য তুমি মিছে বসে থেকো না, বুঝেছ? আমি আজ প্লাস্ ভাঁদোমে খাব। নিমন্ত্রণ আছে!"

মাদাম জেঙ্কিন্স কহিলেন, "ও! নবাবের ওখানে?" মাদামের স্বরে ঈষৎ শ্রদ্ধা মিশানো ছিল। সে শ্রদ্ধা এই নবাবের নামে! আরব্য উপন্যাসের নায়কের মতই দৈত্য-প্রদত্ত বিপুল ঐশ্বর্য্য-সম্ভার লইয়া যে নবাব অকস্মাৎ এই পারি সহরের বুকে আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছে, যার আলোচনায় সারা পারি সহর আজ এই এক মাস মাতিয়া রহিয়াছে, সেই নবাব!

স্বর ঈষৎ নামাইয়া মাদাম কহিলেন, "কিন্তু মনে আছে—আমি যা ... আমার সে কথা রাখবে ত? দেখো—কথা দিয়েছ।"

... ভঙ্গীতে বোধ হইল, কথাটা কিছু কঠিন এবং সে কথা রক্ষা ... ও নিতান্ত সহজ নহে! জেঙ্কিন্স কোন উত্তর দিলেন না; ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত করিলেন। মুখে তাঁহার হঠাৎ একটা কাঠিন্যের ছাপ ফুটিল। কিন্তু সে শুধু মুহূর্ত্তের জন্য। ধনী রোগীর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে বসিয়া মিথ্যা আশ্বাস দিয়া সৌখীন ডাক্তারদিগের মুখ ও চোখ কেমন-একটা চতুরতায় অভ্যস্ত হইয়া উঠে। ডাক্তার জেঙ্কিন্স পর মুহূর্ত্তেই মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "কথা যখন দিয়েছি, তখন তা রাখবই, এ তুমি নিশ্চয় জেনো, মাদাম জেঙ্কিন্স। নাও, এখন যাও। জানলাগুলো বন্ধ করে থাকো গে—আজ ভারী কুয়াশা হয়েছে।" জেঙ্কিন্স বিদায় লইলেন।

রবার্ট জেঙ্কিন্স ডাক্তার—জাতিতে আইরিশ, সাস্মিত মুখ, উজ্জ্বল চক্ষু, সুস্থ সবল দেহ, সাজসজ্জা পরিপাটী, বেশ-ভূষাতেও সৌখীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। উপাধি তাঁহার প্রচুর, খ্যাতি-প্রতিপত্তিও সামান্য নয়—বিস্তর বিজ্ঞান-ও-সেবা-সমিতির সদস্য এবং সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সেগুলিকে তিনি অনুগৃহীত করিয়াছেন। বেথলিহাম আতুরাশ্রম তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক কীর্ত্তি। অর্থাৎ এক-কথায় পার্লের আবিষ্কারক ডাক্তার জেঙ্কিন্স সর্ব্বত্র সর্ব্বঘটে বিরাজমান। একতিল

বিশ্রাম নাই,—সারা পারি সহর তাঁহার কার্য্যপটুতায় ধন্য-ধন্য করিতেছে। পারিসে সমস্ত সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য গৃহের তিনি চিকিৎসক। ছোট ছেলের দাঁত-ওঠা হইতে বৃদ্ধ ডিউকের সর্দ্দি-কাশী অবধি সমস্তই ডাক্তার জেঙ্কিন্সকে দেখিয়া বেড়াইতে হয়।

কুয়াশার রন্ধ্র ভেদ করিয়া ডাক্তার জেঙ্কিন্সের ব্রুহাম আসিয়া হোটেল দ্য মোরার সম্মুখে থামিল। প্রকাণ্ড সজ্জিত অট্টালিকা, গাড়ী থামিতেই দ্বারে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ডাক্তার জেঙ্কিন্স গাড়ীতে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন; ঘণ্টার শব্দে মুখ তুলিয়া চাহিলেন, গাড়ী হইতে নামিলেন।

কুয়াশা থাকিলেও ডাক্তার বেশ স্পষ্টই দেখিলেন, কাতার দিয়া পথে আরও দশখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। অপ্রসন্নভাবে তিনি ভাবিলেন, "যত সকালেই আসি না কেন, দেখি, আমার আগেই বিস্তর লোক এসে জমেছে।" তথাপি এ বিশ্বাস তাঁহার মনে বিলক্ষণ ছিল, যিনি যখনই আসুন না কেন, সংবাদ পাঠাইয়া ডাক্তার জেঙ্কিন্সকে কখনও প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না। তাঁহার জন্য ডিউকের দ্বার অবারিত।

এই প্রাসাদ-তুল্য গৃহে ডিউক দ্য মোরার বাস। ডিউকের খাস-কামরার সম্মুখে বড় একখানা ঘর। সেই ঘরে অসংখ্য উমেদার উদ্‌গ্রীবভাবে বসিয়া আছে,—কখন্ কাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবে,—হুজুরে হাজির দিবার সেলাম আসিয়া পৌঁছিবে!

ডাক্তার জেঙ্কিন্স কাষ্ঠ অভিবাদন করিয়া দ্বার-রক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার পালা চলেছে?"

রক্ষক মৃদু স্বরে যে নাম উচ্চারণ করিল, তাহা শুনিলে উপস্থিত জন-সঙ্ঘে ক্রোধের রক্ত শিখা যে বিদ্যুতের মত ঝিলিক্ হানিয়া যাইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশের এতগুলা সম্ভ্রান্ত লোক কাজের জন্য

কতক্ষণ বসিয়া আছে, তাহার ঠিক নাই, আর ডিউক কি না থিয়েটারের নগণ্য একটা পোষাকওয়ালার সহিত আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে! কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে নামটা কাহারও শ্রুতিগোচর হইল না।

কতকগুলা শব্দের ঝঙ্কার,—আলোর একটা রশ্মি···জেঙ্কিন্স ডিউকের কক্ষে প্রবেশ করিলেন; একটা সংবাদ পাঠাইবারও প্রয়োজন তিনি বোধ করিলেন না। চিম্‌নির দিকে পিছন করিয়া, উন্নত শির তুলিয়া কৌন্সিলের সভাপতি ডিউক একটা পোষাক হাতে লইয়া দর্জীর সহিত কথা কহিতে [illegible]লেন। আগামী বল্‌-নাচে ডচেস্ কি পোষাক পরিবেন, সেই [illegible] ডিউক দর্জীকে কয়েকটা উপদেশ দিতেছিলেন। "গলার দিকে সামান্য ফ্রিল দিয়ো; কফে মোটে ফ্রিল হবে না।···এই যে, ডাক্তার জেঙ্কিন্স!···আমার একটু মাপ করবেন।"

জেঙ্কিন্স অভিবাদন করিয়া ঘরের মধ্যে পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। জানালা খোলা ছিল। জেঙ্কিন্স আসিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইলেন। নিম্নে প্রকাণ্ড বাগান—সীন্ নদীর তীর অবধি শ্যামল তরুলতাগুলিকে কে যেন বেশ গুছাইয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে! তাহার অন্তরালে সেতু এবং ও-পারের গির্জ্জার চূড়া ছায়ার মত ফুটিয়া আছে। কুয়াশার পটে পেন্সিলের রেখায় কে যেন প্রকৃতির এক টুক্‌রা দৃশ্য আঁকিয়া রাখিয়াছে। ঘরের দেওয়ালে ডচেসের তৈল-চিত্র; চিম্‌নির মাথায় ডিউকের মৃণ্ময় মূর্ত্তি, এই মূর্ত্তি গড়িয়াই কেলিসিয়া গত সালোঁয় শ্রেষ্ঠ পদক লাভ করিয়াছে।

"হ্যাঁ, তারপর, জেঙ্কিন্স, খবর কি, বল?" দর্জীকে বিদায় দিয়া ডিউক ডাক্তারকে সম্ভাষণ করিলেন।

ডাক্তার কহিলেন, "কাল রাত্রে থিয়েটারে থাকার দরুণ আপনার চেহারা একটু খারাপ দেখাচ্ছে যেন!"

[illegible]ক কহিলেন, "রেখে দাও তোমার কথা! এর চেয়ে কবেই বা

আর ভাল থাকি? তবে তোমার পালে মন্দ বোধ কচ্ছি না! একটু যেন জোর পাচ্ছি, তেজ পাচ্ছি···ওঃ, ছ'মাস আগে শরীরের যে দশা হয়েছিল—"

জেঙ্কিন্স ডিউকের বুকের উপর মাথা কাত করিয়া রাখিলেন। ডিউক গণিলেন, "এক, দুই, তিন, চার।" জেঙ্কিন্স তাঁহার বুকে কাণ পাতিয়া কহিলেন, "কথা কয়ে যান ত দেখি।"

ডিউক কহিলেন, "কাল ও কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে হে, ডাক্তার? সেই লম্বা লোকটা,—তামাটে রঙ, বেজায় বিশ্রী জোরে হাসছিল, অসভ্যের মত?—সেই যে কাল থিয়েটারে যার সঙ্গে ষ্টেজ-বক্সে তুমি বসেছিলে হে,—কে সে?"

"ওঃ, তার কথা বলচেন? সেই ত হল নবাব—জাঁস্থলে, যখের ধন নিয়ে পারিতে এসেছে। সহরে মস্ত হৈ-চৈ পড়ে গেছে, একেবারে!"

"বটে! ঐ সেই নবাব! আমিও তাই আন্দাজ করেছিলুন! সবাই ওর দিকে হরদম চাইছিল। অভিনেত্রীগুলোর অবধি আর অন্য দিকে নজর ছিল না! তুমি তাহলে লোকটাকে জানো বেশ—এঁ্যা? তা লোকটা কেমন?"

"আমি? হ্যাঁ, ওকে জানি বৈ কি একটু-আধটু, আমি হলুম গে ওর ডাক্তার। হ্যাঁ, বুক দেখা হয়েছে। না, এখন বেশ আছেন আপনি। ও, হ্যাঁ, নবাবের কথা হচ্ছিল না? সে আজ এক মাস হতে চলল—পারির বাতাস নবাবের কেবল সহ্য হচ্ছিল না, তাই আমায় ডাকিয়ে পাঠায়। সেই অবধি আমার সঙ্গে ওর আলাপ বেশই জমেছে। ওর সম্বন্ধে আমি বিশেষ এমন কিছু জানিনা বটে, তবে টিউনিস থেকে লোকটা একেবারে টাকার আণ্ডিল নিয়ে এসেছে। কোন্ বে'র কাছে কাজ করত। তা নবাবের মনটা এধারে বড় ভালো, ভারী সাদা-সিধে লোক, দয়া-ধর্ম্মও বেশ আছে—"

বাধা দিয়া ডিউক কহিলেন, "টিউনিসে? তা, নবাব নাম হল কেন?"

"ঐ ত মজা! পারির ধরণই ত এই। বিদেশী পয়সাওলা লোক দেখলেই ওরা 'নবাব' খেতাব দিয়ে বসে থাকে, তা সে যেখানকারই লোক হোক্ না কেন! যাহোক একে কিন্তু খেতাবটা মানিয়েছে। তামাটে রং, জ্বল্‌জ্বলে চোখ, আর অগাধ টাকা! তা হক্-কথা বল্‌ব, টাকাটা সৎকার্য্যে খুবই ব্যয় করছে! ওর কাছে আমি বিলক্ষণ ঋণীও আছি—" ডাক্তারের স্বর কৃতজ্ঞতায় নম্র হইয়া পড়িল,—"ওরই সাহায্যে আমি এই বেথলিহেম আতুরাশ্রম খুলেছি কি না! আশ্রমটার সম্বন্ধে মেসেঞ্জার কাগজে খুব লিখেচে। লিখেচে, এত-বড় সদাশয়তার কাজ বোধ হয় দেশে এক শ' বছরের মধ্যে আর দুটি হয় নি। দেখাচ্ছি,—কাগজখানা বুঝি আমার সঙ্গেই আছে।"

কথা শেষ করিয়া ডাক্তার পকেটের মধ্য হইতে ভাঁজ-করা একখানা খবরের কাগজ টানিয়া বাহির করিলেন। কাগজখানা মলিন—দেখিলে মনে হয়, বহুবার ইহাকে লোকসমাজে বাহির করা হইয়াছে। ডিউক কিন্তু বাজে কথায় ভুলিবার লোক নন! বক্র দৃষ্টিতে কাগজখানার দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন, "তোমার নবাবের তাহলে অঢেল টাকা আছে, বল। শুনচি, কার্দ্দেলাকের থিয়েটারটা নাকি ওরই টাকায় ভাল করে ফের খোলবার ব্যবস্থা হচ্ছে, মঁসিয় ভঁর দেনা ঐ লোকটাই শুধে দিয়েছে, বোয়া ল্যান্দ্র ওর জন্যে আস্তাবল খুলচে, বুড়ো সোলবাক্ ওকে বিস্তর ছবি এঁকে দিচ্ছে। এ সব ত অল্প টাকার খেলা নয়।"

জেঙ্কিন্স হাসিলেন; হাসিয়া কহিলেন, "তবে খুলেই সব বলি, ডিউক সাহেব! আসল কথা কি জানেন, নবাব বেচারা আপনার নামে একেবারে মরে আছে। এখানে এসে 'সহুরে' বলে নাম কেনবার ঝোঁক ওর বেজায়। আপনাকেই ও আদর্শ ঠিক করে সেই-

ভাবে চলচে। আপনার কাছে আর লুকোব না, অর্থাৎ আপনার সঙ্গে একবার মিশতে পেলে ও বেচারা বর্তে যায়।"

"জানি—আমিও সে কথা শুনেচি। মঁপাভ আমায় বলছিল, এ বিষয়ে আমার মতও চাইছিল সে।...কিন্তু কি জান? ঢুদিন আরও সবুর করে আমি সব দেখতে চাই। লোকটার সত্যিই শাঁস আছে, না কি! বিদেশের টাকা-কড়ির ব্যাপার—বুঝলে—একটু সাবধান হয়ে মেশা উচিত।...তা বলে অন্য কিছু ভেবো না—আরে নাঃ, আমি তা বলচি না।...কি জানো, আমার নিজের বাড়ীতে অবশ্য নয়, তবে অন্য কোথাও, এই ধর,—থিয়েটারে, কি কোন পার্কে টার্কে, কি আর কারও বাড়ীতে—হঠাৎ যেন দেখা হয়ে গেল! বুঝলে?"

ডিউকের মুখের কথা লুফিয়া ডাক্তার কহিলেন, "তা বেশ,—সুবিধেও হয়েছে। আসচে মাসে মাদাম জেঙ্কিন্স বাড়ীতে একটা পার্টি দিচ্ছেন—তা অনুগ্রহ করে সেই পার্টিতে যদি আপনি —"

"বাঃ। এ হলে ত চমৎকার ব্যবস্থা হবে, ডাক্তার। নবাব যদি সেখানে আসে, তুমি আলাপ করিয়ে দিয়ো—ব্যস্!"

এই সময় দ্বার খুলিয়া ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "মন্ত্রীসভার সভাপতি-মহাশয় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন—তাঁর কি বিশেষ দরকারী কথা আছে।...নীচে পুলিশ সাহেবও বসে আছেন।"

ডিউক কহিলেন, "বলগে, আমি যাচ্ছি।... তার পর ডাক্তার, তোমার পার্ল টাই আপাতত তা হলে চলবে?"

"নিশ্চয়—যখন আবার ওটার উপকার পাওয়া যাচ্ছে।" ডাক্তারের মুখে প্রসন্নতার একটা স্নিগ্ধ কিরণ ফুটিয়া উঠিল। ডিউক তাঁহার গৃহে পদধূলি দিয়া নিমন্ত্রণ-সভাটিকে আপ্যায়িত করিবেন! সঙ্গে সঙ্গে নবাবকেও তিনি ডিউকের সহিত পরিচিত করাইয়া দিবার সুযোগ লাভ করিবেন। এতখানি সৌভাগ্য!

সেদিনকার মত বিদায় লইয়া জেঙ্কিন্স জনপূর্ণ ডিউকের প্রাসাদ ত্যাগ করিলেন। গাড়ীতে উঠিয়া কোচম্যানকে ইঙ্গিত করিলেন, ক্লাব—”

ক্যাবয়েলের সীমানায় আসিয়া ডাক্তার গাড়ী হইতে নামিলেন। ভৃত্যের দল ভিতরে বড় বড় কার্পেট নাড়িয়া ধূলা ঝাড়িতেছিল, ঘর সাফ করিতেছিল। ডাক্তার জেঙ্কিন্স রুমালে নাক ঢাকিয়া মার্কুইস মঁপাভ কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

মার্কুইস কহিলেন, “ডাক্তার যে! আরে এস, এস।”

জেঙ্কিন্স কহিলেন, “নীচে চাকরগুলো যে ধূলো উড়িয়েছে, কার সাধ্য তার মধ্য দিয়ে উপরে ওঠে।”

মার্কুইস কহিলেন, “বসো।”

ডাক্তার বসিলে মার্কুইস এক নিশ্বাসে আপনার উপসর্গাদির তালিকা দিয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে পার্লের গুণের কথাও বলিতে ভুলিলেন না। বলিলেন, পার্ল ব্যবহার করিয়া তিনি যেন আবার নবযৌবন লাভ করিয়াছেন। শুনিয়া মৃদু হাসিয়া ডাক্তার পার্লের পুনর্ব্যবহারে পরামর্শ দিয়া কহিলেন, “আচ্ছা, আমি তাহলে এখন চল্লুম।...নবাবের ওখানে আবার দেখা হচ্ছে ত?”

“নিশ্চয়। আজ সেইখানেই আবার খাবার কথা আছে! জান ত, মতলব যা বের করা গেছে,, সেটা ত সারা চাই,—না হলে কি ওখানে সাধ করে যাই? হুঁঃ, বাড়ী ত নয়, যেন চিড়িয়াখানা।”

ডাক্তার ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় যাহা কহিলেন, তাহার মর্ম্ম ইহাই দাঁড়ায়, যে নবাবের সঙ্গ শুধুই আনন্দের সৃষ্টি করে না, তাহার মধ্যে অস্বস্তিও বিলক্ষণ আছে, সত্য। তবু ইহার জন্য নবাবের উপর রাগ করা উচিত নয়। সভ্য সমাজের আদব-কায়দা জানিবার অবসর ত বেচারা কখনও পায় নাই! শুধু টাকাই রোজগার করিয়াছে! তা ছাড়া তাঁহাদের

কাজ লইয়াই কথা! একটু অসুবিধা হইলে সহিয়া যাওয়া ছাড়া ইত্যাদি।

মঁপাভঁ কহিলেন, "শিখতেও পারবে না কখনো। দেখ না, যে যাবে তারই সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশবে,—একেবারে হলা-হলা গলা-গলা ভাব! এতে কি আর মানুষের ভদ্রতা থাকে? ছ্যাঃ!...দেখেচ ত, বোয়া ল্যান্দ্র্ কি রকম ঘোড়া গচিয়েচে, এক-দম্ অপদার্থ—কাগজের ঘোড়া বললেও চলে; আর তাই কিনা ও হাজার টাকায় কিনলে! আমি বেশ বলতে পারি, বোয়া ল্যান্দ্র্ ওই ঘোড়ার জন্য বড় জোর পাঁচশ টাকা ছেড়েছে!"

"যাক্—নবাব কিন্তু বেশ ভদ্রলোক এদিকে।"

মঁপাভঁ কহিলেন, "কিন্তু নবাব ঘোড়াগুলো কেন নিয়েচে, তা জানো? হুঁঃ ওগুলো এককালে ডিউকের ঘোড়া ছিল কি না, তাই—"

"সে কথা ঠিক। ডিউকের চলা, বলা, হাসি-কাসি সমস্ত ধরণ-ধারণ নকল করবার জন্য নবাব উঠে পড়ে লেগেছে। জানেন, আজ নবাবকে গিয়ে এমন একটা খবর দেব যা শুনলে সে আহ্লাদে গলে যাবে।"

"কি খবর?"

"নবাবের সঙ্গে ডিউকের পরিচয় করিয়ে দেব শীগ্গির। সে বিষয়ে ডিউক আজ আমায় অনুমতিও দিয়েছেন।"

মার্কুইসের মুখ সহসা কঠিন হইয়া উঠিল। স্থির দৃষ্টিতে ডাক্তারের পানে চাহিয়া তিনি কহিলেন, "ডাক্তার,—আমাদের মধ্যে কোন রকম রাখারাখি ঢাকাঢাকি থাকাটা ঠিক নয়—তুমিও দাঁও বাগাতে চাও, আমিও তাই। তোমার গণ্ডীতে আমি কখনও পা দিতে যাই না, তুমিও আমার গণ্ডীতে পা দিতে এসো না। খবরদার! আমি যখন নবাবকে কথা দিয়েছি, ডিউকের সঙ্গে তার পরিচয় আমি করিয়ে দেব—তোমার সঙ্গেও যে ডিউকের পরিচয় হয়, তা আমারই দ্বারায়, মনে

আছে ত?—তখন নবাবের ভারও আমার। এতে তুমি হাত দিতে এসো না।"

জেঙ্কিন্সের বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। তাই ত! মার্ক্ইসের মত বন্ধু, ডিউকের কেহ নাই, এ কথা কে না জানে! মার্ক্ইস কহিলেন, "না, চুপ করে থেকো না সাফ বলে ফেলো। আমাদের মধ্যে এর একটা বোঝাপাড়া হয়ে যাক্—"

"নিশ্চয়! ইজ্জতের জন্যও বোঝা-পড়াটা দরকার—"

"ইজ্জত! অত বড় কথা নয়, ডাক্তার। ইজ্জত আবার কি? তার চেয়ে বল, নিজেদের স্বার্থের জন্য—"

ডাক্তার অপ্রতিভভাবে অস্পষ্ট দুই-চারিটি কথা কহিয়া বিদায় লইলেন। এখনও বিস্তর জায়গায় ঘুরিতে হইবে।

ডাক্তারের রোগীগুলি একেবারে সহরের সেরা রোগী! ঐশ্বর্য্যের কাহারও সীমা নাই! ধনীর প্রাসাদে কার্পেট-মোড়া সিঁড়ি বহিয়া পুষ্প-বাস-ফুল্ল কক্ষে গিয়া কোমল রেশমী কৌচে ক্ষণিকের জন্য শুধু বসিতে হয়। রোগ যেখানে বিলাসের মূর্ত্তি ধরিয়া সাজিয়া বসিয়া থাকে, রোগের শীর্ণ তপ্ত হাত যেখানে এতটুকু রুদ্রতারও আভাষ দিতে সাহস করে না, সেই সকল স্থানেই ডাক্তার জেঙ্কিন্সের প্রসার-প্রতিপত্তি! অর্থাৎ এ-সকল রোগীকে ঠিক রোগী বলা যায় না। হাসপাতালে গেলে এ সকল রোগীকে তখনই অসঙ্কোচে তাহারা বিদায় করিয়া দেয়। রোগের চিহ্ন শরীরের কোথাও নাই এবং ডাক্তারের সূক্ষ্ম-নিপুণ যন্ত্রগুলা রীতিমত অভিনিবেশেও শরীরের কোনস্থানে এতটুকু রোগ আবিষ্কার করিতে পারে না। বিলাসের জড়তায় মৃত্যু যেখানে বহুপূর্ব্বে বাসা বাঁধিয়াছে, সেখানে আবার নূতন করিয়া কোন্ রোগ উঁকি দিতে আসিবে? কি রোগ বাসা বাঁধিবে? মৃতের আবার রোগ কি! এ সকল রোগী ত বহুকাল হইতেই মরিয়া রহিয়াছে। প্রাণ কি কাহারও আছে? পোষাকের ভারে মৃত দেহগুলা

শুধু সাজানো আছে বৈ ত নয়! মাথায় কাহারও না আছে চিন্তা, প্রাণে না আছে আনন্দ, জীবনে কোন শৃঙ্খলা নাই—এ ত মৃতের দল! তাই ডাক্তারের পার্লের এতখানি নাম বাহির হইয়াছে। সে যেন চাবুক মারিয়া ইহাদের জীবনে একটু সাড় আনিয়া দিয়াছে।

কোন রোগী বলে, "ডাক্তার, থিয়েটারে না গিয়ে ত আর থাকা যাচ্ছে না।" রোগিণী বলে, "কাল ভারী জমকালো বল্ আছে, যেতে পাব ত?" ডাক্তার মৃদু হাসিয়া আশ্বাস দিয়া আসেন, "তা যেয়ো। কিন্তু দু তিন ঘণ্টার বেশী যেন থেকো না।" ইহাই তাঁহার রোগীর ইতিহাস, ইহাই তাঁহার চিকিৎসা-প্রণালীর সার মর্ম্ম।

এমনই রোগীর বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ডাক্তারের গাড়ী আসিয়া বিখ্যাত আর্টিষ্ট ফেলিসিয়ার গৃহের-দ্বারে দাঁড়াইল। ডাক্তার নামিয়া উপরে গেলেন—গৃহখানি তেমন বড় নহে; তবে সজ্জিত সুন্দর ঘরগুলি দেখিলে গৃহ-স্বামীর সুরুচি ও ভব্যতার পরিচয় পাইতে এতটুকু বিলম্ব ঘটে না। কবির মতই পরিচ্ছন্ন গৃহ।

পদশব্দে চমকিয়া ফেলিসিয়া ঘাড় ফিরাইল। "কে,—ডাক্তার?"

ডাক্তার নম্র স্বরে কহিলেন, "হ্যাঁ, তুমি কাজে এমনি মন দিয়েছিলে যে, আমার ডাকতে ভরসা হত না। নতুন কিছু গড়চ, বুঝি!"

ফেলিসিয়া মাটী দিয়া মূর্ত্তি গড়িতেছিল। কহিল, "কাল রাত্রে হঠাৎ কেমন খেয়াল হল! তাই আলো জ্বেলেই কাজে লেগে গেলুম। কাদুরের কিন্তু এতখানি জবরদস্তি পছন্দ হচ্ছে না।"

কাদুর ফেলিসিয়ার কুকুর। একজন দাসী তাহার পা দুইখানা ধরিয়া রাখিয়াছিল, ফেলিসিয়া তাহা দেখিয়া কাদুরের মূর্ত্তি গড়িতেছিল।

ফেলিসিয়ার কপালে হাত রাখিয়া ডাক্তার কহিলেন, "কিন্তু এখনও তোমার একটু জ্বর রয়েছে, দেখচি যে। অসুখ-শরীরে রাত জাগা, পরিশ্রম করা—এ ত ঠিক হচ্ছে না।"

ফেলিসিয়ার মুখে লজ্জার একটা রক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিল। চোখ দুইটি সরনের শান্ত শ্রীতে ভরিয়া গেল। ফেলিসিয়া কহিল, "কৈ! আপনার পালে ত কোন ফল হল না। আর কাজ! কাজ করলেই আমি থাকি ভাল। চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগে না, কেমন অস্বস্তি ধরে, কেবলই মনে হয়, জীবনটা কিছু নয়! ঐ জলের মতই ঘোলাটে হয়ে উঠছে! ঐ যে কন্স্তা,—ও তবু ঢের মনের সুখে আছে—একদিন ত ও সুখের মুখ দেখেচে—সেই সুখ মনে করে ও ভাল থাকে। কিন্তু আমার মনে করবার মত কিছু নেই ত! জীবনটা চিরদিনই একটানা বয়ে চলেছে—থাকবার মধ্যে আছে শুধু আমার কাজ, খালি কাজ। তাই কাজ করেই আমি থাকি ভাল।"

অসম্পূর্ণ মূর্তিটির পানে চাহিয়া, মূর্ত্তির গায়ে স্থানে স্থানে সরু তুলি বুলাইতে বুলাইতে তাহার কোনখানটা মুছিয়া, কোনখানে বা মাটির লেপ আরও ঘন করিয়া দিয়া ফেলিসিয়া কথা বলিতেছিল, আর তাহার মুখে মৌন বেদনার এক করুণ ছাপ ক্ষণে ক্ষণে ফুটিয়া উঠিতেছিল। তাহার বিষাদ-করুণায় মাখা সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতে শুনিতে জেঙ্কিন্সের প্রাণে এক নূতন ভাবের উদয় হইতেছিল। জেঙ্কিন্স কোন কথা বলিলেন না। তাহা লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ কি বলিয়া ফেলিয়াছে ভাবিয়া ফেলিসিয়া আপনা হইতেই কেমন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। সে প্রসঙ্গ উল্টাইয়া দিবার জন্য সে বলিল, "হাঁ, আপনার নবাবকে যে সে-দিন দেখলুম— শুক্রবার রাত্রে তিনি অপেরায় গেছলেন।" কথাটা শেষ করিয়া ফেলিসিয়া জেঙ্কিন্সের পানে চাহিল।

"তুমিও বুঝি অপেরায় গেছলে—?"

"হাঁ!—ডিউক একটা বক্সের টিকিট পাঠিয়ে ছিলেন।"

জেঙ্কিন্সের মুখে কে যেন এক-ঘা চাবুক মারিল। মুখ তাঁহার বিবর্ণ হইয়া উঠিল। ফেলিসিয়া বলিতে লাগিল, "আমি কন্স্তাঁকে কত করে

বল্‌লুম, আমার সঙ্গে যেতে। পঁচিশ বচ্ছর পরে সে আবার অপেরা দেখলে। ও যেন কি রকম হয়ে পড়ছিল! যখন নাচ হচ্ছিল, ওর সমস্ত মুখখানা তখন লাল হয়ে উঠেছিল—চোখ দুটো যেন জ্বলছিল—পুরোনো কথা বোধ হয় কিছু মনে পড়ছিল। হ্যাঁ, নবাবের চেহারাখানি বেশ,—আমার এখানে একদিন তাঁকে নিয়ে আসুন না—আমি তাঁর মাথার একটা ছক্ গড়ব।”

“সে কি করে হবে? না, না, সে হয় না! লোকটা ভয়ঙ্কর কুৎসিত যে।”

“মোটেই নয়। আমাদের ঠিক সামনের বক্সে তিনি বসেছিলেন—চমৎকার মূর্ত্তি—পুরুষের চেহারা বটে! মার্ব্বেলের মূর্ত্তির মত—ঠিক, এমন একখানি মূর্ত্তি ত ফস্ করে চোখে পড়ে না। আর যখন কুৎসিত বলেই আপনার ধারণা, তখন ভাবনাই বা কিসের! কোন ভয় নেই, ডাক্তার সাহেব, বুঝলেন।”

এ কথার উত্তরের আশামাত্র না করিয়া ফেলিসিয়া আবার মূর্ত্তি গড়িতে মন দিল। ডাক্তার কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যেই ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার ফেলিসিয়ার নিকটে আসিলেন, কহিলেন, “তাহলে আজ আসি, ফেলিসিয়া।”

ফেলিসিয়া তুলি রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, “চললেন! তাহলে তাঁকে আন্‌চেন ত একদিন?”

“কাকে আনব?”

“কেন, নবাবকে।”

“নবাবকে?”

“হ্যাঁ, নবাবকেই। না, আমি কোন ওজর শুন্‌চি না। আনতেই হবে। আনা চাইই। বাঃ, কেন আনবেন না?” ফেলিসিয়া আবার সহসা বসিয়া পড়িয়া ঘাড় ফিরাইয়া ফিরাইয়া মূর্ত্তিটিকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

যেন আনন্দের পুতলি ! কোন কিছুতে আকর্ষণ নাই, কোন কিছুর সন্ধান রাখে না, আত্ম-ভোলা সরলা বালিকা এই ফেলিসিয়া ! জেঙ্কিন্স বিদায় লইলেন। আজ তাঁহার মনের মধ্যে কাঁটার মত কি একটা বেদনা খচ্ খচ্ করিতেছিল।

বিদায় লইয়া ডাক্তার সহরের সীমানায় এক দরিদ্র পল্লার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। একখানা জীর্ণ বাটির দ্বারে গাড়ী থামিল। ডাক্তার গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ছিন্ন মলিন বেশ-পরিহিত অপরিচ্ছন্ন বালক-বালিকার দল অদূরে ধূলা-মাটি লইয়া খেলা করিতেছিল,—সজ্জিত গাড়ী দেখিয়া খেলা ছাড়িয়া সদলে আসিয়া তাহারা গাড়ীর সম্মুখে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

সিঁড়ি বাহিয়া বাড়ীর চতুর্থ তলে উঠিয়া ঘরের সম্মুখে আসিয়া ডাক্তার দাঁড়াইলেন ; ঘরের সম্মুখে একটা ছোট তামার পাত আঁটা ছিল। তাহাতে লেখা ছিল, "এম জুজ, একাউন্টাণ্ট।" পাতটার পানে চাহিয়া দেখিয়া ডাক্তার মৃদু হাসিলেন, পরে দ্বারের হাতলে ঘা দিলেন।

ভিতর হইতে কে দ্বার খুলিয়া দিল। ডাক্তার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কহিলেন, "ভালো আছ ত আঁদ্রে ?"

"আসুন, মসুঁ জেঙ্কিন্স।"

ডাক্তার আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "তুমি দেখচ্ আমার ব্যবহার-খানা। তুমি যে এই তোমার আত্মীয়দের ছেড়ে নিজের গোঁ-ভরে এতদূরে এসে বাসা নিয়েছ, তবু দেখ, আমরা এখানেও তোমায় দেখতে আসছি। আমার এতে মাথা হেঁট হয়, তা জানো ! যত বড় বড় ঘরে আমার কাজ—নিত্য আমায় এখানে আসতে দেখলে লোকে কি ভাববে,—কিন্তু কি করি ? না এলে তোমার মা ওদিকে কেঁদে-কেটে অনর্থ বাধিয়ে দেয়। তাই না এসেও পারি না। মোদ্দা আমার এ ভালো লাগে না।"

ডাক্তার জেঙ্কিন্স ঘরের চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। বালি-চূণ-খসা দেওয়াল, ঘরের মধ্যে দুই-চারিখানা জীর্ণ চেয়ার, একটা ছোট টেবিল, একখানা খাট, নূতন একটা ক্যামেরা, ইহাই ছিল গৃহের আসবাব। এক কোণে ধূলি-মাখা ছোট একটা ষ্টোভ্ পড়িয়া আছে, তাহারই পাশে লোহার একটা ছোট কেট্‌লি। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার আঁদ্রের পানে চাহিলেন। শীর্ণ দেহ, পাণ্ডু মুখ, দাড়ি কবে কামানো হইয়াছে ঠিক নাই, —খোঁচা খোঁচা কাটার মত সেগুলা আবার দেখা দিয়াছে। চোখে দারিদ্র্যের ছায়া আছে, তাহার মধ্য হইতেও একটা উজ্জ্বলতা উঁকি দিতেছে। জেঙ্কিন্স বলিলেন, "শোন আমার কথা। যে দিন তোমার মাকে আমি বিবাহ করেছি, সে দিন থেকে তোমাকেও আমি নিজের ছেলের মত দেখে আসছি। আমার সঙ্গে থেকে তুমি কাজ-কর্ম্ম কর, আমি থাকতে থাকতে আমার এই ঘরগুলো হাত করে নাও, ডাক্তারি করে ভদ্রলোকের মত থাকো, এই আমার ইচ্ছা। তোমার মারও সেই সাধ। কিন্তু তুমি, কোন কথা নেই, বার্ত্তা নেই, কাকেও কিছু না বলে ফস্ করে আমার বাড়ী থেকে চলে এলে! লোকে এতে কি ভাবচে, বল দেখি। এ শুধু আমায় অপদস্থ করা! লেখাপড়া ছেড়ে দিলে, নিজের ভবিষ্যৎটা মাটি করলে—সব খোয়ালে। কেন? না, যাতে পয়সা নেই, নাম নেই, ইজ্জৎ নেই, দুনিয়ার যত হতচ্ছাড়া বখা নিষ্কর্ম্মাগুলো যা করে দিন গুজরান করে, সেই হাভাতে পেশা তুমি নেবে, ঠিক করেছ! ছিঃ!"

"এ কাজে আমার আনন্দ হয়, করে সুখও পাই। আর এতে পয়সা নেই, তাই বা আপনাকে কে বললে! মানও যথেষ্টই আছে।"

জেঙ্কিন্স ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, "ছাই আছে! আমায় আর তুমি বুঝিয়ো না—আমার কিছু জানতে বাকী নেই। সাহিত্য-চর্চ্চায় আবার ইজ্জৎ! ও সব পাগলের কথা! যাক্, শোন, আমি কি বল্‌তে এসেছি। ও-সব লক্ষ্মীছাড়া খেয়াল ছাড়,—আমার পরামর্শ-মত কাজ কর, মান, সম্ভ্রম

—সব হবে। একটা মস্ত সুযোগ উপস্থিত, তা হেলায় হারিয়ো না। আমি বেথলিহাম আতুরাশ্রম খুলেছি, জান ত! এত বড় সদনুষ্ঠান একশো বছরের মধ্যে কারও মাথায় আসেনি, তাও জানো! এ কথা আমার নয়, খবরের কাগজে অবধি তাই লিখেচে। এর জন্য নাতোঁয়ারে বিস্তর জমি কেনা হয়েছে, সেখানে কাজও সুরু হয়েছে। আমার ইচ্ছা, সেখানকার ভার তুমি নাও, তুমিই সেখানকার কর্ত্তা হবে। তোফা বাড়ী পাবে, লোক-জন পাবে। একবার শুধু তুমি রাজী হও—বাস্, আমি গিয়ে নবাবকে এখনি বলচি—আমার কথা সে এখনই রাখবে।"

সহজভাবেই আঁদ্রে উত্তর দিল, "না।"

"না!" জেঙ্কিন্সের ললাট কুঞ্চিত হইল। তিনি বলিলেন, "বেশ! আমিও তাই ভেবেছিলুম, তোমার এ সুবুদ্ধি হবে কেন? তা বেশ, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলছ, ঠেলো। কিন্তু এক দিন পস্তাবে! আমি অবশ্য নিজে থেকে তোমায় সাধতে আসিনি—তোমার মার জেদেই এসেছিলুম। তা তাই হোক্, তোমার জেদই বজায় থাকুক। আমরা ত কেউ নই! তাই হবে—তুমি নিজে যে পথ ধরেছ, সেই পথেই থাকো। লিখে আবার মানুষের পয়সা হয়,—নাম হয়—! অভাবের মধ্যে পড়ে এর পর যখন ছটফট করবে, তখনই তোমার উচিত শিক্ষা হবে! আরো জেনে রাখো, ছুতো-নাতায় যে তখন আমার ওখানে গিয়ে পয়সার পিত্যেশ করে দাঁড়াবে, সে হবে না। আমি একটি কাণা কড়ি দিয়ে তোমায় সাহায্য করব না। আমার সঙ্গে যেমন, তোমার মার সঙ্গেও তেমনি তোমার সব সম্পর্ক চুকে গেল। বুঝলে? সে আর আমি—দুজনে আমরা এখন এক, এ জেনে রেখো!"

আঁদ্রের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। কাশিয়া সে উত্তর দিল, "বেশ। আমার কোন দুঃখ নেই। তবে মা যদি কখনও আমায় দেখতে চান ত এখানে তিনি আসতে পারেন তাঁকে বলবেন। আমার দ্বারা তাঁর

কাছে চিরদিনই অবারিত এইটুকু শুধু তাঁকে অনুগ্রহ করে জানাবেন। আপনার বাড়ীতে আমি আর কখনো যাব না, ঠিক জানবেন। এ কথার কখনও নড়চড় হবে না।"

ডাক্তার জেঙ্কিন্স কহিলেন, "কিন্তু, কেন—কেন—সে কথা শুনতে পাই না?"

"না। কোন প্রয়োজন নাই।"

ডাক্তারের অস্বস্তি বোধ হইল। দারিদ্র্য যাহাকে পিষিয়া মারিতেছে, এতখানি তাহার তেজ যে তাঁহার সম্মুখে শির একবার সে নোয়াইতে চাহে না! বাহিরে যাঁহার এতখানি প্রতিপত্তি, একটা হতভাগা সংস্থান-হীন ছোকরা কিনা সটান্ তাঁহার মুখের উপর সমানে এমন জবাব দিয়া গেল! আশ্চর্য্য! তিনি ভাবিয়াছিলেন, "বাড়ী ঢুকিতে দিব না" এই ভয় দেখাইলে আঁদ্রেকে আবার হাতের মধ্যে ফিরিয়া পাইবেন। কিন্তু আঁদ্রের সেই সুদৃঢ় ভাব ও কথার ভঙ্গী দেখিয়া পরাজয়ের ক্ষোভে প্রাণ তাঁহার পুড়িয়া গেল।

বিদায় লইয়া ক্ষুব্ধ হৃদয়ে ডাক্তার গাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন; কোচ্ম্যানকে আদেশ দিলেন, "চালাও প্লাস্ ভাঁদোম্—"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবাবের গৃহ

নবাবের গৃহের ভোজন-কক্ষে সেদিন সজ্জার ঘনঘটা! বিলাস ও ঐশ্বর্য্যের সমস্ত উপাদানে আধুনিক কেতায় সজ্জিত বিরাট কক্ষ উজ্জ্বল শ্রীতে মণ্ডিত। প্রকাণ্ড টেবিল ঘেরিয়া প্রায় বিশজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক

আনন্দ-কলরবে কক্ষটিকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। পারি সহর যাঁহাদিগকে বুকে ধরিয়া গৌরবান্বিত, তাঁহাদিগের সকলেই প্রায় আজ এই নিমন্ত্রণ-সভায় উপস্থিত,—ছিলেন না শুধু ডিউক। মুখে এক টুকরা রুটি পুরিয়া মঁপাভঁ কহিলেন, "হাঁ, কাল ডিউক আমাকে ডেকে আপনার কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেন,—বুঝলেন, নবাব বাহাদুর—?"

আনন্দে গর্ব্বে নবাবের বুক ফুলিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "তাই না কি! আমার কথা যে জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেন হঠাৎ?"

"হাঁ। শীগ্‌গির একটু ফুরসৎ পেলেই তিনি আপনার সঙ্গে আলাপ কর্‌বেন, বল্‌ছিলেন।"

"বটে। এ কথাও বলেছেন?"

"তা না ত কি! এই যে গবর্ণর সাহেব রয়েছেন, ইনিও সে কথা শুনেছেন।"

যাঁহাকে গবর্ণর বলা হইল, তিনি একজন খাটো ধরণের লোক, নবাবের অপর পার্শ্বে টেবিলের সম্মুখে বসিয়াছিলেন। মাথায় টাক। একমনে তিনি ভোজ্যবস্তুর সদ্ব্যহার করিতে ছিলেন। নাম তাঁহার পাগানেতি; কর্সিকা প্রদেশের তিনি গবর্ণর; মঁপাভঁ তাঁহাকে নবারের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। গবর্ণর কহিলেন "হ্যাঁ, ডিউক তাই বলছিলেন বটে।"

এই নিমন্ত্রণ-সভাটি দেশের বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন শ্রেণীর সম্ভ্রান্তগণ-সম্মিলনে সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। টিউনিসের বে'র প্রধান কর্ম্মচারী ব্রাহিম বে এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। দেউলিয়া-গ্রহণে সমধিক খ্যাতি-পরায়ণ কার্দ্দেলাক, চিত্র-ব্যবসায়ী সোল্‌বাক, তদ্ভিন্ন নবাবের মুর ও মিশরী বন্ধুগণ নিমন্ত্রিতের দলভুক্ত ছিল। বিভিন্নশ্রেণীর লোকজন থাকিলেও সভায় এতটুকু কলরব ছিল না। সকলেই নিঃশব্দে ভোজন সারিয়া চলিয়াছিলেন; চোখের কোণে বক্র কটাক্ষে পরস্পরের পানে চাহিতেও

কেহ ভুলেন নাই। সহসা নবাব বলিয়া উঠিলেন, "এই যে ডাক্তার জেঙ্কিন্স! এত দেরী যে!"

মৃদু হাসিয়া ডাক্তার কহিলেন, "আমরা ডাক্তার মানুষ, দশের চাকর। বাঁধা-ধরা সময়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করি, এমন সাধ্য কি আমাদের!"

নবাব কহিলেন, "এঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়ছিলেন, কাজেই আপনার জন্য অপেক্ষা করাটা—"

ডাক্তার কহিলেন, "তাতে কি! বেশ করেছেন। কোন ক্ষতি হয় নি। আমি এখনই সকলকে ধরে ফেলছি—"

ডাক্তার নবাবের সম্মুখের শূন্য আসনে বসিয়া গেলেন। ক্ষিপ্রভাবে কয়টা জিনিষ মুখে পুরিয়া ডাক্তার কহিলেন, "আজকের মেসেঞ্জার কাগজখানা দেখেচেন, নবাব বাহাদুর?"

নবাব কহিলেন, "না।"

"সে কি! দেখেননি মোটে! আপনার সম্বন্ধে যে একটা প্রকাণ্ড প্যারা লিখেছে!"

নবাবের মুখে সরমের রক্ত আভা ফুটিয়া উঠিল, চক্ষু বিস্ফারিত হইল। তিনি কহিলেন, "আমার সম্বন্ধে আবার কি লিখলে?"

"খুব লিখেচে! দু' কলম। মোসার কোথায়? আপনাকে দেখায় নি? এই যে মোসার!"

মোসার অপ্রতিভভাবে কহিল, "অতটা মনে ছিল না।"

মোসার একখানা ছোটখাট সংবাদ-পত্রের মালিক। তরুণ বয়সেই তাহার শীর্ণ মুখে-চোখে দারিদ্র্য ও অভাবের রুক্ষ ছাপ পড়িয়াছে। আর কোন জায়গায় অর্থ-উপার্জ্জনের কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া সে এই সংবাদ-পত্র বাহির করিয়া বসিয়াছে। বুকে দুনিয়ার প্রতি ঈর্ষা-পীড়িত একটা জ্বালা লইয়া সে এই কাজে নামিয়াছে। যেখানে অর্থ পাইবে, সেখানেই সে প্রশংসা ও স্তুতির মধু বর্ষণ করিবে।

যেখানে সে সম্ভাবনা নাই, সেখানকার জন্য তাহার হৃদয়ে সঞ্চিত আছে, শুধু হুলের তীব্র বিষ! ধনীর দলে মিশিয়া তাহাদের কালিমা-লিপ্ত চরিত্রে যশের চূণকাম করা তাহার পেশা। এই কারণেই মঁপাভঁ-জেঙ্কিন্সের দলে সে অবাধ প্রবেশের অধিকার লাভ করিয়াছিল। জয়-দুন্দুভি বাজাইয়া আপনাদের পানে সারা দেশের দৃষ্টি-আকর্ষণের জন্য এমনই একজন সংবাদ-পত্র-পরিচালকের অভাব মঁপাভ-জেঙ্কিন্সের দল বহুদিন ধরিয়াই বিলক্ষণ অনুভব করিতেছিল। তাই মোসারকে পাইয়া তাহারা যেন বর্ত্তাইয়া গিয়াছে; এবং অর্থ-আহরণের উদ্দেশ্যেই জেঙ্কিন্স-কোম্পানি নবাবের সহিত তাহার পরিচয় ঘটাইয়া দিয়াছিল। উদ্দেশ্য যখন এক, তখন এক-কাট্টা হওয়ার বিশেষ প্রয়োজনও আছে!

নবাব কহিলেন, "তাহলে একখানা কাগজ আমায় এখনই আনিয়ে দিতে হবে যে। কি লিখেচে, জানবার জন্য আমি অস্থির হচ্চি।"

মোসার কহিল, "ব্যস্ত হবেন না, নবাব বাহাদুর। কাগজ আমার কাছেই আছে। আপনাকে দেখাবার জন্যে একখানা পকেটে করে আমিও এনেওচি। এই নিন।" বলিয়া মোসার একখণ্ড ভাঁজ-করা কাগজ নবাবের সম্মুখে খুলিয়া ধরিলেন।

নবাব কাগজখানা টানিয়া লইলেন। নীল পেন্সিলে দাগ-দেওয়া একটা জায়গায় সহজেই তাঁহার নজর পড়িল। তিনি নীরবে পড়িতে লাগিলেন। জেঙ্কিন্স কহিলেন, "না, না, চুপি চুপি পড়লে চলবে কেন! এঁরা সকলে জানতে পার্‌বেন না যে। দিন, আমায় দিন আমি চেঁচিয়ে পড়ি।"

কাগজখানা টানিয়া লইয়া জেঙ্কিন্স পড়িতে লাগিলেন। দুই কলম ধরিয়া সম্পাদকীয় মন্তব্য। প্যারার নাম, "বেথলিহাম আতুরাশ্রম ও এম্ বার্ণার্ড জাঁস্লে।" ভাষার ছটায় মাতৃস্তন্যের নানা অপকারিতা ও অনুপযোগিতার উল্লেখ করিয়া ছাগদুগ্ধের অশেষ প্রকার কল্যাণকর গুণের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এ সমস্ত কথাই ডাক্তার জেঙ্কিন্সের কপোল-কল্পিত

এবং ভাষায় যেটুকু আড়ম্বর ফলানো হইয়াছে, তাহাতেও জেঙ্কিন্সের কৃতিত্ব! এই সকল কথার উল্লেখান্তে নান্তেয়ারের জমি ও জল-বায়ুর বিশদ সুখ্যাতি এবং তাহারই ঠিক পরে জেঙ্কিন্সের মস্তিষ্ক ও জাঁস্যুলের দান-মুক্ত হস্তের অজস্র প্রশংসা! জাঁস্যুলেকে অসহায় রোগপীড়িত শীর্ণ শিশুর দেবোপম রক্ষক ও অভিভাবক বলিয়া সম্পাদক আপনার মন্তব্যের উপসংহার করিয়াছেন।

সংবাদটুকু যখন মজলিসে পড়িয়া শুনানো হইতেছিল, শ্রোতৃবর্গের মন তখন বিরক্তি ও ঘৃণায় কতখানি পূর্ণ হইয়াছিল, মুগ্ধ জাঁস্যুলের তাহা লক্ষ্য করিবার অবসর ছিল না। সকলেই ভাবিতেছিল, কি পাজী শয়তান এই মোসার! ব্যাপারটা কিন্তু খুব সে গুছাইয়া লইয়াছে! মিথ্যা চাটুবাণীতে কাগজের এই দীর্ঘ স্তম্ভ ভরাইয়া, কে জানে, সে আপনার তহবিল কতখানি পূর্ণ করিবে! তথাপি তহবিল যে রীতিমত ভারী হইবে, সে বিষয়ে কাহারও মনে এতটুকু সন্দেহ ছিল না। ঘৃণা ও ঈর্ষা-মিশ্রিত বক্রদৃষ্টিতে সকলেই মোসারের পানে চাহিয়া দেখিল।

কাগজ পড়া শেষ হইলে নবাব অধীরভাবে কহিলেন, "আঃ, আজ আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে, তা বলতে পারি না! শুধু আনন্দই বা কেন—গর্ব্বও কি কম হচ্ছে!"

জাঁস্যুলে আজ দেড়মাসমাত্র পারি সহরে আসিয়াছেন। দুই-চারিজন পুরাতন সঙ্গী ছাড়া আজ যে সকল বন্ধুর বন্ধুত্ব-গর্ব্বে আপনাকে তিনি সমধিক গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন, পারির মাটীতে পা দিবার পূর্ব্বে তাহাদের কাহারও সহিত জাঁস্যুলের এতটুকুও জানা-শুনা ছিল না! কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়! সূর্য্যোদয় হইলে জগতের লোককে যেমন সে সংবাদ বলিয়া দিতে হয় না, সূর্য্যকে দেখিয়া আলোক ও উত্তাপ লাভ করিবার জন্য সকলেই আঁধার ছাড়িয়া গৃহ-কোটরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়, তেমনই এই নবাবের ঐশ্বর্য্য-রশ্মির ছটায় পারির সম্ভ্রান্ত সমাজ পুলকিত

চিত্তে সে ঐশ্বর্য্য-রশ্মির সংস্পর্শ-লাভের জন্য এক নিমেষে নবাবের চারিদিকে আসিয়া জড়ো হইয়াছে। টাকার কি মোহিনী শক্তি আছে! টাকা ধার দিয়া নবাব অচিরেই বন্ধু-সংগ্রহে সক্ষম হইলেন।

নবাব বলিলেন, "কাগজে যা ছাপা হয়েছে, তা ত দেখলুম। কিন্তু এর উপর যখন দেখি, পারির বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত লোকেরা আজ আমার বন্ধু, তখন আমার পুরানো দিনের কথা সব মনে পড়ে। আমরা বুড়ো বাপের কথা, তাঁর সেই ছোট্ট দোকানখানির কথা মনে পড়ে। আমার বাবা ঘোড়ার ক্ষুর বিক্রি করিতেন। আপনারা চমকাবেন না। সত্যই তাই। এক অজ পাড়াগাঁয়ে চটির ধারে আমার বাপের ছোট্ট দোকান ছিল। রোজগার-পাঁতিও এত কম ছিল যে পেটে দিতে একখানা আস্ত রুটিও কোন দিন আমার ভাগ্যে জোটেনি। বিশ্বাস না হয়, আপনারা এই কাবাস্থকে বরং জিজ্ঞাসা করুন। কাবাস্থ পুরানো লোক, ও সব জানে। সে যে কি দিন ছিল—" নবাব ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ রহিলেন। পরে অন্ধকার অতীতের পার্শ্বে এই আলোকোজ্জ্বল বর্ত্তমানের কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল! ঈষৎ গর্ব্বে বুকখানাও ফুলিয়া উঠিল। নবাব আবার কহিলেন, "কাল কি খাব, আজ তার সংস্থান থাকত না! খিদের জ্বালায় দিন-রাত জ্বলতুম! না খেয়ে কত দিন অমন বিছানায় শুয়ে পড়েই কেটে গেছে। শীতকালে বেরুতে পারতুম না। গায়ে দেবার গরম জামা একটা ছিল না। তার পর বাপ মারা গেলেন—বুড়ো মাকে নিয়ে তখন বিপদের সাগরে ভাসলুম। এ রকমে দিন কাটানো যায় না—কখনও না! শেষে একদিন শেষ-রাত্রে পালালুম। তখন আমার বয়স ত্রিশ বৎসর। এখনও পঞ্চাশ বছর পেরোয়নি—সেই ত্রিশ বৎসর বয়সে ভিখিরির অধম ছিলুম—একটা কাণা কড়িরও সম্বল ছিল না—সে যে কি কষ্ট!"

শ্রোতার দল অধীর হইয়া উঠিতেছিল। কেন এ অতীতের ধূলি-জঞ্জাল টানিয়া বাহির করা! বিশেষ এই বিলাসের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে

দারিদ্র্যের এ ভয়ঙ্কর কঙ্কালসার মূর্ত্তিখানা দেখিবার জন্য ত তাহারা দিব্য বেশে সাজিয়া আজ এখানে আসে নাই! দৈন্যের এ কদর্য্য কুৎসিত মূর্ত্তিখানা বাহির করিয়া আনিয়া সজ্জিত সভায় দারুণ বীভৎসতা সৃষ্টি করিবার অধিকার কাহারও নাই। নবাবেরও না! তবুও সে কথা সাহস করিয়া বলিবার জো নাই। কাজেই নেটের পর্দ্দা ও ঝালর-মণ্ডিত সভাগৃহে নবাবের কবেকার সেই ছিন্ন দীন চীরখণ্ড অবাধে ঝুলিতে লাগিল। অগাধ টাকার মালিক—তাহার উচ্ছ্বসিত ভাব-স্রোতে বাধা দিতে যাওয়া মূঢ়তা! অসহ্য বোধ হইলেও তাহা শুনিতে হইবে! নাহিলে কায়দা দুরস্ত থাকে না! তাই সকলে আশ্চর্য্য ধৈর্য্যের সহিত এই কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে কোনমতে আপনাদের অচপল রাখিল।

নবাব বলিতে লাগিলেন,"মার্শেলের বন্দরে ঘুরে ঘুরে কত দিন কাটিয়ে দিছি। এক দোকানির মনে দয়া হয়েছিল, সে ডেকে দু'চার দিন পোড়া রুটি খেতে দিয়েছে। কি করব, কি হবে, কিছুই ভেবে স্থির করতে পারছিলুম না। এমন সময়ে এক সঙ্গী জুটলো। সঙ্গী বটে—কিন্তু আজ সে আমার পরম শত্রু। তার নাম করলে এখনই তাকে আপনারা চিন্‌তে পার্‌বেন। আজ তার মস্ত নাম, কিন্তু সে ভণ্ড—নিরেট ভণ্ড। তার নাম হেমারলিং। ঐ যে হেমারলিং এণ্ড সনের প্রকাণ্ড ব্যাঙ্ক; তারই মালিক হেমারলিং। আজ সে-ও অনেক পয়সা করেছে, কিন্তু তার সেদিনকার দশা আমারই মত ছিল। সে-ও সেদিন ভাগ্য-পরীক্ষায় বেরিয়েছে। দুজনে ভারী মিশ খেয়ে গেলুম। শেষে পরামর্শ করলুম, দুজনেই বিদেশে যাব—কিন্তু যাই কোথায়? কাগজে কতকগুলো দেশের নাম লিখে লটারি করলুম! প্রথমেই উঠল, 'টিউনিস।' বাস্, আর কথা নেই, বার্ত্তা নেই, একদম টিউনিসে রওনা হলুম। কোনমতে জাহাজে জায়গা করে নিলুম। যেদিন বেরুলুম, হাতে সে দিন একটিও পয়সা ছিল না, কিন্তু ফিরলুম পঁচিশ লক্ষ টাকার মালিক হয়ে।"

ঘরশুদ্ধ লোক চমকিয়া উঠিল। পঁচিশ লক্ষ টাকা! এ যে আরব্য উপন্যাসের কাহিনা! এ্যাঁ! কার্দ্দেলাক বলিয়া উঠিল, "অদ্ভুত!" মঁপাভঁ একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। নবাব কহিলেন, "হাঁ, সাহেব, পঁচিশ লক্ষ নগদ। তা ছাড়া টিউনিসে আমার দেদার টাকা ছড়ানো আছে! গেলেতার বন্দরে খানকতক জাহাজ আছে, তা-ছাড়া মণি-মুক্তা-হীরে-জহরৎ এ-সবের ত কথাই নেই। এ পঁচিশ লক্ষ যদি আজ হঠাৎ উড়ে যায় ত কালই আবার পঁচিশ লক্ষ আমার হাতে মজুত, দেখবেন!"

শুনিয়া সকলে মনে মনে জ্বলিয়া উঠিল। এই বর্ব্বরের এত অর্থ! কিন্তু মনের ভাব গোপন রহিল। চারিধারে শুধু কলরব উঠিল, "অদ্ভুত!"

"চমৎকার!"

"খাসা!"

"এ যেন আরব্য উপন্যাসের গল্প শুনলুম!"

জেঙ্কিন্স কহিলেন, "এই লোকেরই ডেপুটি কাউন্সিলর হওয়া উচিত।"

পাগানেতি কহিলেন, "আমি বলছি, একদিন উনি তা হবেনও, নিশ্চয়।" সকলে সসম্ভ্রমে নবাবের কর-মর্দ্দন করিলেন।

উত্তেজনার মাত্রা কিছু কমিলে নবাব কহিলেন, "এবার কফি ফরমাস করা যাক্—কি বলেন?"

"নিশ্চয়! নিশ্চয়!"

কফি আসিল। নিমেষেই পাত্রগুলা নিঃশেষ হইল। জেঙ্কিন্স কহিলেন, "তাহলে নবাব বাহাদুর, আজ ওঠা যাক। ইতিমধ্যে আমি একবার আতুরাশ্রমের প্ল্যানখানা আপনাকে দেখিয়ে নিয়ে যাব। আপনি একবার না দেখে দিলে আমি ত কিছু ঠাওরাতে পাচ্ছি না! কোথাও যদি কিছু বদলাতে চান ত বদ্‌লাবেন।"

প্রসন্নভাবে নবাব কহিলেন, "বেশ!"

জেঙ্কিন্স কহিলেন, "এ হপ্তায় ওদের টাকাও কিছু দিতে হবে। ওঃ, কাজ যা হচ্ছে, কি বলব! আপনি একবার চলুন, দেখে আসবেন—কেমন হচ্ছে সব।"

নবাব সে কথা কাণে না তুলিয়াই কহিলেন, "কত টাকা চাই? আজই নিন না।"

"আপাততঃ হাজার পনেরো হলেই চলবে।"

"মোটে পনেরো হাজার!" বলিয়া নবাব জনৈক ভৃত্যকে ইঙ্গিত করিলেন। ভৃত্য চেক্-বহি লইয়া আসিল। নবাব চেক কাটিলেন, "ডাক্তর জেঙ্কিন্স—পনেরো হাজার টাকা—" তার পর নবাব মার্কুইসের পানে চাহিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, ডেপুটি হতে গেলে কত খরচ পড়ে?"

মার্কুইস কহিলেন, "কত আর! এই লাখ খানেক!" বলিয়া মার্কুইস পাগানেত্তির পানে চাহিলেন। পাগানেত্তি সে চাহনির অর্থ বুঝিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "এক লাখ! কর্সিকার ডেপুটি কাউন্সিলর! তা হবে—তা হবে বৈ কি! আমি বলছি নবাব বাহাদুর, এবার সমস্ত কর্সিকা দেশটাকে আপনার পায়ের তলায় ফেলে দেব। দেখে নেবেন, আমার কথার নড়চড় হয় না।"

নবাব কহিলেন, "আপনাদের অনুগ্রহ। তাহলে টাকাটা আপনার নামে আজই কেটে ফেলি। ও আর দেরী কেন?"

আবার চেক-বহিতে কালির আঁচড় পড়িল। এক লাখ টাকা! চেক কাটিয়া নবাব মোসারের পানে চাহিলেন, কহিলেন, "ও কাগজের কলম দুটোর জন্য আমার ধন্যবাদ জানবেন! কাগজটার ফণ্ডে আমি সামান্য কিছু দিতে ইচ্ছা করি—"

মোসার কহিলেন, "আপনার দয়াতেই ত কাগজখানা টিঁকে আছে, নবাব বাহাদুর, আপনিই ত এর পেট্রন। এর জন্য আবার আমায় কিছু দিতে চাইছেন কেন? এ ত আপনারই কাগজ! তা দিতে চান, দিন,

আপনার কথার উপর ত কথা চলে না। আর আপনার পক্ষে এ ছিটে-ফোঁটা হলেও মেসেঞ্জারের পক্ষে পাহাড় !”

আবার চেক কাটা হইল। দশ হাজার ! তার পর আরও দুই-চারিটা সদ্ব্যয়ের ব্যবস্থা হইলে অভ্যাগতের দল বিদায় লইলেন। নির্জ্জন কক্ষে জানালার ধারে বসিয়া নবাব তখন আকাশের পানে চাহিয়া রহিলেন। তিনি স্পষ্ট শুনিলেন, পারি সহরের বুক চিরিয়া যেন একটা আনন্দের ধ্বনি উঠিয়াছে। সে ধ্বনি যেন তাঁহারই বিজয়-সঙ্গীত ! সে কি মধুর ! তিনি দেখিলেন, পারি যেন মূর্ত্তি ধরিয়া স্বয়ং আসিয়া দুই কোমল কর বাড়াইয়া সাদরে তাঁহাকে বুকে টানিতেছে !

সহসা একজন ভৃত্য আসিয়া অভিবাদন করিয়া নবাবের হাতে একখানি কার্ড দিল। কার্ডের সঙ্গে একখানি পত্র। খামের উপর নারী-হস্ত-লিখিত অক্ষর দেখিয়া নবাব কহিলেন, “এ যে আমার মার চিঠি,—কে আনলে ?”

ভৃত্য জানাইল, পত্র-বাহক এক তরুণ যুবা ; বাহিরে নবাবের আদেশ-প্রতীক্ষায় তিনি দাঁড়াইয়া আছেন।

নবাব কহিলেন, “যাও, তাঁকে এখানে নিয়ে এস।”

ভৃত্য চলিয়া গেলে নবাব পত্র খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

মা লিখিয়াছেন, “বাবা জাঁস্লে, তোমার বোধ হয় এম গেরিকে মনে আছে ? আমাদেরই এই বুর্জ স্যাতে দোঁলে এঁদের বাড়ী। এক-কালে এঁদের অবস্থা খুবই ভাল ছিল। এখন নানা বিপদে-আপদে গরিব হয়ে পড়েছেন। গেরি সাহেব মারা গেছেন। তোমার কাছে যিনি চিঠি নিয়ে যাচ্ছেন, ইনি তাঁর বড় ছেলে। এই ছেলেটির ঘাড়েই এখন সংসার। বেচারা ঠিক করেছিল, উকিল হবে, কিন্তু এ অবস্থায় পড়াশুনার জন্য ছেলেটির আর একদিনও বসে থাকা চলে না। এঁরা মানুষ বড় চমৎকার। এই ছেলেটির যদি কোন উপায় করে দিতে পার বাবা, তাহলে এরা

প্রাণ পাই। চেষ্টা করে একটা উপায় তোমার করে দেওয়া চাইই। আমি এদের বড় মুখ করে কথা দিয়েছি। দেখো বাবা—এদের সংসার যাতে চলে, তার একটা কিনারা তুমি করে দিয়ো। তুমি কেমন আছ? অনেক দিন তোমায় দেখিনি—”ইত্যাদি—

মা! মা! জাঁস্তুলের সেই চির-স্নেহময়ী মা! পারির এই বিলাস-বিভবের মধ্যে পড়িয়া দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার পিছনে ছুটিয়া জাঁস্তুলে মাকে আজ হারাইয়া বসিয়াছে—মার কথা, কৈ, এক দিনের জন্যও ত মনে পড়ে নাই। ঐশ্বর্য্য! ছার সম্মান! বিস্তর অনুরোধেও মা তাঁহার সেই পল্লীর নিভৃত বিজন কোণটুকু ছাড়িয়া আসিতে রাজী হন নাই। আজ ছয় বৎসর মার সঙ্গে দেখা নাই! দীর্ঘ ছয় বৎসর! আজ যেন নূতন করিয়াই জাঁস্তুলে সুমধুর মাতৃস্নেহ-স্পর্শ লাভ করিলেন।

মুখ তুলিয়া জাঁস্তুলে দেখিলেন, সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক তরুণ যুবা। সুন্দর সুশ্রী মুখে দারিদ্র্যের মলিন ছাপ পড়িলেও মুখের স্বাভাবিক দীপ্তিটুকু একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। দীপ্ত চক্ষু! জাঁস্তুলে বলিলেন, “তুমিই মার চিঠি নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ?”

যুবা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, “হাঁ।” সেই ক্ষুদ্র কথাটির মধ্যে আর্ত্তের আশ্রয়-প্রার্থনার ব্যাকুল সুর ফুটিয়া উঠিল। জাঁস্তুলে যুবার পানে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, “তোমার বাবার নাম আমার খুবই মনে আছে। তাঁর কাছ থেকে একদিন অনেক পরামর্শ, অনেক সাহায্য আমি পেয়েছি। তা থাকো, তুমি আমার কাছে যখন এসেছ, তখন আমার যতটুকু আমার সাধ্য, তোমার ভালো আমি করব! তুমি আমার সঙ্গে এইখানেই থাকো—অন্য কোনখানে পয়সার সন্ধানে তোমায় যেতে হবে না। তুমি লেখা-পড়া শিখেছ—সুতরাং আমার অনেক উপকার করতে পারবে। আমিও তোমারই মত একজন লোক খুঁজছিলুম,—যার উপর আমি বিশ্বাস রাখতে পারি, সব বিষয়ে

যার পরামর্শ নিতে পারি, এমন একজন লোক! তোমার মুখ দেখেই আমার মনে হচ্ছে, তুমি সেই লোক। আমার সঙ্গে মিশ খাবে! আমার মাথায় অনেক মতলব আছে, অনেক কাজ আমি করতে চাই। সে সব কাজ করতে তুমিই আমার ডান হাত হবে। আমার প্রকৃত বন্ধু হবে তুমি। অর্থাৎ আমার একজন সেক্রেটারির দরকার। যে সব পুরানো লোক আছে, তাদের মাথায় এত কাজ এত মতলব ঢোকে না। তুমিই ঠিক লোক। এই পারি সহরে তুমি আমায় চালিয়ে নিয়ে বেড়াবে। কেমন, বুঝলে? পারবে ত? পারিতে আজ আমি যেমন একটু ঠাঁই করে দাঁড়িয়েছি,—আমার সঙ্গে থাকো, তুমিও ঠিক এমনি করে আমারই মত দাঁড়াতে পারবে। আমি তার সব বন্দোবস্ত করে দেব।"

অধীর আনন্দে গেরির বুক কাঁপিতেছিল। একেবারে এতখানি!

নবাব কহিলেন, "কেমন, রাজী ত? তুমি আমার সেক্রেটারি হবে! একটা বাঁধা বন্দোবস্ত তোমার জন্য করে দেব—কথাবার্ত্তা কয়ে এখনই সেটা ঠিক করে ফেলছি! আমি তোমায় যে সুযোগ দিচ্ছি, তার সদ্ব্যবহার করলে কালে তুমি ক্রোড়পতি হবে, জেনো—"

অনিশ্চয়তার সকল দুর্ভাবনা গেরির মন হইতে দূর হইয়া গেল। নবাবের প্রতি শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে হৃদয় তাহার লুটাইয়া পড়িল, কৃতজ্ঞতায় চোখে জল আসিল। আহা, মানুষের প্রাণে এত দয়া, এমন মমতা! সে নির্ব্বাক্ নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিল!

গেরির হাত ধরিয়া নবাব একটা কোচে তাহাকে বসাইলেন, পরে নিজেও তাহার পার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, "এখন কিছু খাবার আনতে বলে দি—তুমি বসে বসে খাও আর আমার মার কথা বল, শুনি—আমার মার কথা শুনতে আমার বড় ভালো লাগে!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রীতি-ভোজ

দ্বার-রক্ষক কার্ডখানি টেবিলে রাখিয়া কহিল, "মসুঁ বার্ণার্ড জাঁস্‌লে।"

সজ্জিত কক্ষে আলাপ-রত নর-নারীর দল নামটা শুনিয়া চকিত হইয়া উঠিল। ডাক্তার জেঙ্কিন্স শশব্যস্তে উঠিয়া দ্বারের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। পরে জাঁস্‌লের হাত ধরিয়া সস্মিত মুখে যখন তিনি পুনঃপ্রবেশ করিলেন, তখন চারিধারে একটা কৌতূহলের ঢেউ ছুটিয়া গেল। জাঁস্‌লে! এই সেই নবাব—টাকার যাহার অন্ত নাই! পারি সহরটাকে টাকায় মুড়িয়া ফেলিতে পারে, এত যাহার অর্থ! এমন লোকের পানে কে না চাহিয়া দেখে! মাদাম জেঙ্কিন্স কহিলেন, "আজ যে আমাদের কি অনুগৃহীত করলেন, তা বলতে পারি না। আমাদের আপনি চিরকালের জন্য কিনে রাখলেন!" গর্ব্বে জেঙ্কিন্সের বুক ফুলিয়া উঠিল—দীপ্ত নেত্রে চারিধারে তিনি একবার চাহিয়া দেখিলেন। সে দৃষ্টির অর্থ,—সারা পারি বিস্ময়-মুগ্ধ চিত্তে যাহার পানে চাহিয়া আছে, এই দেখ, সেই জাঁস্‌লে — সেই নবাব! সেই নবাব আজ আমার গৃহে অতিথি! আমি তাহার কতখানি প্রীতি-বন্ধুত্বের অধিকারী! নবাবের পিছনে পল দ্যে গেরি আসিয়াছিল—তাহার পানে কেহ ফিরিয়াও চাহিল না। গেরি আশ্বস্ত হইল। বিলাস-দর্পের সভায় আপনাকে লইয়া সে কেমন বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল; সকলের লোলুপ দৃষ্টি হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সারা পথ ধরিয়া একটা আদর-অভ্যর্থনার সমারোহ আশঙ্কা করিয়া সে কেমন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল, এখন নবাবের পানেই সকলেরই বিহ্বল দৃষ্টি পড়িতে দেখিয়া

সে যেন একটা অন্তরালের আশ্রয় পাইল। সেই অন্তরাল হইতে পারির সমাজটাকে একবার দেখিয়া লইবার সুযোগ মিলিয়াছে ভাবিয়া সে তৃপ্ত হইল।

কৌতূহলের মাত্রা কমিতে না কমিতে আবার এক তরঙ্গ উঠিল। আর্টিষ্ট ফেলিসিয়া আসিয়াছে। ফেলিসিয়া! ডাক্তার জেঙ্কিন্স আগাইয়া গিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। নবাবের সহিত ফেলিসিয়ার পরিচয় করাইয়া দিতেও তিনি বিলম্ব করিলেন না। গেরি চাহিয়া দেখে, নবাবের সম্মুখে বসিয়া এক তরুণী—অপূর্ব্ব সুন্দরী! শুধু লাবণ্যই অপরূপ নহে,—সে মুখে কেমন-এক ঔজ্জ্বল্য, সে চোখে চমৎকার একটি দীপ্তি! তরুণীকে দেখিলেই মনে হয়, ইহার মধ্যে অসাধারণ একটা কিছু আছে! গেরি মুগ্ধ নেত্র সরাইতে পারিল না, ফেলিসিয়ার পানেই চাহিয়া রহিল। আশ-পাশের লোকগুলা জনান্তিকে যে আলোচনার স্রোত ছুটাইল, তাহা হইতে গেরি জানিল, তরুণী ফেলিসিয়া এখনও কুমারী। গঠন-শিল্পে অদ্ভুত তাহার প্রতিভা! রূপের খ্যাতিও তাহার খুব! ফেলিসিয়া নবাবের সহিত কথা কহিতেছিল—কি কথা? গেরির কানে গেল না। আশপাশের কথাবার্ত্তাগুলাই শুধু তাহার কানে ঢুকিতেছিল।

"নবাবের সঙ্গে খুব যে ভাব জমে উঠল হে,—ডিউক যদি এসে দেখে?"

"ডিউক আসবে না কি?"

"নিশ্চয়। তার জন্যেই ত এ ভোজের আয়োজন। নবাবের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়াই হল আসল মতলব।"

"হ্যাঁহে, কথাটা কি ঠিক—?"

"কি কথা—?"

"এই ডিউক আর ফেলিসিয়ার সম্বন্ধে যা শুনি—"

"তুমি যে আকাশ থেকে পড়লে! সারা দেশ এ খপর জানে—আর তা ছাড়া গেল-একজিবিসনে ফেলিসিয়ার হাতে-গড়া ডিউকের মূর্ত্তিটাও কি চোখে দেখনি? সেই থেকেই ত আলাপের সূত্রপাত—!"

"ডচেস্ জানে—?"

"যাক্,—এখন থামো। মাদাম জেঙ্কিন্স গান ধরেছে—শুনতে দাও।" আলোচনা থামিল। ওদিকে কক্ষ প্লাবিত করিয়া মাদাম জেঙ্কিন্সের সুর-তরঙ্গ উছলিয়া উঠিল। গেরি আরাম পাইয়া বাঁচিল। এইমাত্র যে সকল অপ্রিয় কথাগুলা তাহার কানে গিয়াছিল, সেগুলা আগুনের মতই তাহার প্রাণটাকে তাতাইয়া তুলিয়াছিল। মনে হইতেছিল, তাহার নির্ম্মল চিত্তে এই সব বর্ব্বর লোকগুলা কুৎসার কাদা ছিটাইয়া দিয়াছে! এই সুন্দরা নারী,—তাহার বিরুদ্ধেও মানুষ এমন কুৎসিত অভিযোগের সৃষ্টি করিতে পারে!

গেরি একটু সরিয়া অন্য চেয়ারে গিয়া বসিল। তাহার আশঙ্কা হইতেছিল, কে জানে, আবার কাহার বিরুদ্ধে এখনই কি নূতন কুৎসা শুনিতে হইবে!

মাদাম জেঙ্কিন্স গাহিতে লাগিলেন। মধুর কোমল রাগিণী বসন্তের হাওয়ার মতই শ্রোতার মনগুলাকে বিহ্বল করিয়া তুলিল। স্রোতের মতই সুরের মূর্চ্ছনা ভাসিয়া চলিল। চারিধারে প্রশংসার মর্ম্মর-ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। যখন গান থামিল, গেরির প্রাণটা তখন বেদনায় ভরিয়া উঠিল,—হায় সুন্দর, তুমি এত ক্ষণিকের! জেঙ্কিন্স-দম্পতীর প্রতি গেরির কেমন শ্রদ্ধার উদয় হইল! কি সুন্দর ইহারা দুইজনে! আহা, সার্থক ইহাদের মিলন! সহসা একটা কথা গেরির কানে গেল—পাশে চাপা গলায় কাহারা কথা কহিতেছিল—

"জানো ত—লোকে কি বলে—মাদাম জেঙ্কিন্স ডাক্তারের স্ত্রী নয়?"

"বল কি হে! পাগল!"

"না হে—পাগল নই। জেঙ্কিন্সের স্ত্রী একজন আছে—সম্পূর্ণ আলাদা জীব, এবং সে বেঁচেও আছে! সঙ্গে ডাক্তারের দেখা-সাক্ষাৎ নেই। সে বেচারী কোথায় কোন্ দেশে পড়ে আছে—তা কেউ জানেও না। তবে ইনি আসল মাদাম নন্—।"

"প্রমাণ—?"

"প্রমাণ আবার কি! বেশ, চাও? তবে শোন সব—"

কণ্ঠ মৃদুতর হইল। বাকী কথাগুলা গেরির কাণে পৌঁছিল না। না পৌঁছাক—যেটুকু গিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট! গেরির মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। মাদাম জেঙ্কিন্স—? এ সে কি কথা শুনিল! এই সুরের উৎস, রূপের রাণী—সে—! মাদাম জেঙ্কিন্স চেয়ার ছাড়িয়া ডাক্তারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ডাক্তার তাহার হাতে সুরা-পাত্র তুলিয়া দিলেন। গেরি চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল, মাদামের প্রতি জেঙ্কিন্সের ব্যবহারে একটু যেন কৃত্রিমতা আছে! এতক্ষণ তাহা চোখে পড়ে নাই, আশ্চর্য্য! আর মাদামের ভাবেও এক দুর্ব্বল অসহায় আশ্রিতার কৃতজ্ঞতা যেন ফুটিয়া উঠিতেছিল। তবে, তবে কি মাদাম—? গেরি আপনার মনকে চাবুক মারিয়া ফিরাইল, শাসাইয়া কহিল, "তোমার এ সব আলোচনায় কাজ কি? ওধারে তুমি চাহিয়ো না—" কিন্তু তখনই আবার পূর্ব্ব প্রসঙ্গের আরও দুই-চারিটা টুক্‌রা কানে গেল।

"আমি ত আর চোখে কিছুই দেখতে যাইনি। অপরের মুখে যা যেমন শুনেছি, তাই বললুম! বাঃ—এই যে ব্যারণেস হেমারলিং—। ওহে, ডাক্তার দেখচি সারা পারি সহরটাকেই আজ টেনে এনে বাড়ীতে পুরেছে।"

জেঙ্কিন্স ব্যারনেসকে আনিয়া নবাবের পাশে চেয়ার টানিয়া বসিতে দিলেন। বন্ধু হেমারলিঙের সহিত নবাবের বিরোধ মিটাইয়া আবার

যদি তাঁহাদের মধ্যে প্রীতির বাঁধন বাঁধিয়া দেওয়া যায়, ইহাই ছিল জেঙ্কিন্সের উদ্দেশ্য—। নবাব ও হেমারলিং উভয়েই তাঁহার ধনশালী রোগী—প্রীতির সূত্রে দুজনকে বাঁধিতে পারিলে তাঁহার পক্ষে লাভের আশা খুবই। এ প্রীতির বাঁধনে ধরা দিতে নবাবের অবশ্য এতটুকু অসাধ ছিল না। হেমারলিঙের প্রতি তাঁহার এতটুকু ক্রোধ বা বিদ্বেষ ছিল না। দুইজনের মধ্যে যে ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা এই ব্যারণেসের সহিত হেমারিলঙের বিবাহ উপলক্ষ করিয়াই। শুধু এই নারীর জন্যই যা-কিছু বিরোধ। ব্যারণেস ছিল, ভূতপূর্ব্ব বে'র এক প্রিয়-বাঁদী! হেমারলিং কিন্তু নবাবের সহিত পুনর্ম্মিলনের জন্য এতটুকু ব্যগ্র ছিল না।

আজ ব্যারণেসের সঙ্গে আসিয়াছিল, হেমারলিঙের ম্যানেজার লি মার্কার! হেমারলিঙের শরীর অসুস্থ, তাই তিনি আসিতে পারেন নাই।

সস্মিত মুখে নবাব উঠিয়া ব্যারণেসকে অভিবাদন করিলেন। কিন্তু প্রত্যভিবাদনের পরিবর্ত্তে ব্যারণেস যে-দৃষ্টিতে নবাবের পানে চাহিলেন, তাহাতে যেন আগুন ঠিকরিয়া পড়িল। সে দৃষ্টি যেমন কঠিন, তেমনি অবজ্ঞার। জাঁসুলে মর্ম্মাহত হইয়া সরিয়া আসিলেন। জেঙ্কিন্সের বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। গেরি দূর হইতে এ-সকল লক্ষ্য করিয়া অবাক্ হইয়া গেল। নবাবকে ব্যারণেস এতখানি অবজ্ঞা দেখাইল কেন?

ডাক্তারের একটা সঙ্কল্প ব্যর্থ হইল। হেমারলিং নিজে আসিল না। ব্যারণেসও নবাবের প্রতি রুক্ষ ব্যবহার করিল। যাক্! এখন ডিউক আসিলেই হয়। আসিবেন কি না, কে জানে!

এমন সময় রক্ষক আসিয়া সসম্ভ্রমে জানাইল—"ডিউক"—সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডিউককে অভিবাদন করিল। তিনি আসন গ্রহণ

করিলে ডাক্তার শশব্যস্তে কহিলেন, "এখন অনুমতি দিন—ডিউক বাহাদুর,—নবাব—"

মঁপার্ভ কথাটা শুনিয়া ডিউকের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কহিল, "ফেলিসিয়া এসেছে—"

ফেলিসিয়া! ডিউক সতৃষ্ণ নেত্রে সম্মুখে চাহিলেন। ডাক্তারের কথা তাঁহার কানেও পৌঁছিল না। ডাক্তার অপ্রতিভ হইলেন। মঁপার্ভ ডাক্তারের পানে একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ডিউকের হাত ধরিয়া ফেলিসিয়ার পার্শ্বস্থ আসনে তাঁহাকে বসাইয়া দিল। গেরি উভয়ের পানে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল! এই মাত্র যে কথা সে কানে শুনিয়াছে,—তাহা তবে—!

ডিউক সস্মিত মুখে কহিলেন, "সেদিন তোমার ওখানে গেছলুম, ফেলিসিয়া—কিন্তু দেখা হল না—"

ফেলিসিয়া কহিল, "আমি শুনেছি। আপনি নাকি আমার ষ্টুডিয়ো ঘরে অবধি গেছলেন?"

"হ্যাঁ, তোমার নতুন পুতুল দেখে এলুম!"

"নতুন পুতুল!"

"হাঁ! চমৎকার হচ্ছে। কুকুরটা পাগলের মত ছুটে চলেছে, শেয়ালটাও তেমনি চলেছে—শুধু একটা কথা বুঝতে পারলুম না। তুমি বলেছিলে, আমাদের দুজনের বিষয় নিয়ে গড়ছ, তা—"

ফেলিসিয়া অপ্রতিভভাবে কহিল, "আপনিই অর্থ করুন না—"

ডিউক হাসিয়া কহিলেন, "আমার ত মাথায় কোন অর্থই আসে না!"

ফেলিসিয়া কহিল, "না, না—ও একটা গল্প থেকে ভাবটা নিয়েছি। সেই যে পুরানো গল্পটা—ব্যাকাসের শেয়াল ভারী ছোটে। এমন ছোটে যে কেউ তাকে ধরতে পারে না। ওদিকে ভলকান্‌ও তার কুকুরকে

এমন শক্তি দিয়েছেন যে সে যার পিছনে ছুটবে, তাকে ধরবেই। সে আর না ধরে যায় না। তারপর একদিন ত দুজনের দেখা হয়ে গেল। দুজনেই ছুটতে লাগল—এ দৌড়ের আর শেষ নেই—অনন্তকাল ধরেই দুজনে ছুটচে, অথচ কুকুর শেয়ালকে ধরতে পারচে না। গল্পটা বুঝলেন, ডিউক বাহাদুর? আজ ভাগ্য আমাদেরও দুজনকে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়ে দিয়েছে—দুজনেই কিন্তু তেজী। ভগবান আপনাকে শক্তি দিয়েছেন, আপনি সমস্ত নারীর হৃদয় জয় করবেন, আর আমারও হৃদয়টাকে এমন করে গড়েছেন যে সে একেবারে দুর্জ্জয় কারো হাতে ধরা দেবে না—কারো কাছে হার মানবে না।"

হাসিতে হাসিতে ফেলিসিয়া কথাটা বলিয়া গেল শুনিয়া ডিউকের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য! তিনিও হাসিয়া উত্তর দিলেন, "কিন্তু দুজনে এমন অন্ধভাবে ছুটতে থাক্‌লে দেবতাদেরও যে তা দেখে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে।"

ফেলিসিয়া কহিল, "তা হলে কি হয়! তাঁরা যেমন গড়েছেন।"

ডিউক কহিলেন, "তাঁরা না হয় ভুল করে ফেলেছেন! এ ভুল কি ভাঙ্গবে না—আচ্ছা, গল্পর সে দৌড় কি কখনো শেষ হয় নি?"

"কেন হবে না!"

"কি করে?"

"দেবতারা কুকুর আর শেয়াল দুটোকেই পাষাণ করে ফেললেন।"

"এইখানে দেবতারা আর এক ভুল করলেন, ফেলিসিয়া। আমার প্রাণটিকে তাঁরা পাষাণ করতে পারচেন না—কখনও না—কিছুতেই না।" ডিউকের চক্ষু হইতে একটা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইল। ডিউক চাহিয়া দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে সকলের দৃষ্টি তাঁহাদেরই উপর ন্যস্ত। তিনি কহিলেন, "না—এ ঠিক হচ্ছে না। লোকে বলতে পারে, তোমায় আমি একচেটে করে ফেলেছি।" ডিউক উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মঁপাভঁ নবাবের হাত ধরিয়া নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। ডিউককে উঠিতে দেখিয়া সে কহিল, "আপনার সঙ্গে এঁর পরিচয় করিয়ে দি। ইনি হলেন বার্ণার্ড জাঁস্থলে—নবাব বাহাদুর—আর ইনিই ডিউক বাহাদুর।"

ডিউক সানন্দে নবাবের করমর্দ্দন করিলেন।

গেরি অন্তরালে বসিয়া সকলই দেখিতেছিল। নবাবের প্রতি সকলের কি লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছে, তাহা সে বুঝিল। তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য সকলের এ কি আগ্রহ! আর সঙ্গে সঙ্গে জনান্তিকে আশপাশের লোকগুলার মৃদুস্বরে টীকা-টিপ্পনী কাটিবার ঘটাই বা কি! মধুকরের গুঞ্জন-ধ্বনির মতই চারিধারে আলোচনা চলিয়াছে—মুহূর্ত্ত বিরাম নাই!

"মঁপাভঁর কাণ্ড দেখলে? নবাবকে চার ধার থেকে একেবারে ছেঁকে ধরেছে। সেদিন পাগানেতির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে,—আজ ডিউকের পালা।"

"বেচারা নবাব! তার টাকার উপর যত লোকের নজর! জোঁকের দল রক্ত শুষতে বসেছে। নবাবকে না খেয়ে এরা ছাড়বে না, দেখচি।"

"দোষ কি! নবাবও ত তুর্কিদের শাঁস খেয়ে এতখানি ফুলে উঠেছে।"

"কি রকম?"

"কি রকম আবার কি! ব্যারণ হেমারলিঙের মুখে শোন নি? নবাবের কথা সে সমস্তই জানে। হেমারলিং যে ওর দোসর ছিল।"

কুৎসার বৃষ্টি সুরু হইল। পনেরো বৎসর ধরিয়া এই নবাব বে'র সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে। লুণ্ঠনের বিবিধ কৌশল-কাহিনীরও ধারা বহিল। দুই হাজার টাকায় এক নর্ত্তকীর ছবি কিনিয়া এক লক্ষ টাকায় বে'র হস্তে নবাব সেটি গছাইয়া দিয়াছে। একখানা সিংহাসন একশ টাকায়

কিনিয়া পাঁচ হাজার টাকায় বে'কে বেচিয়াছে। ছোট-খাটো খেলনাগুলা অবধি বে'র হাতে তুলিয়া দিয়া নবাব সেগুলার জন্য রীতিমত চড়া দাম আদায় করিয়া তবে ছাড়িয়াছে। তা ছাড়া য়ুরোপের বাছা বাছা সুন্দরী নারীতে বের হারেম ভরিয়া দিয়া আপনার তহবিল মোটা করিতে নবাব এতটুকু অবহেলা করে নাই! মৃদুস্বরে উচ্চারিত এই সকল কুৎসার বাণীগুলা গেরির প্রাণে বৃশ্চিকের মত দংশন করিতে লাগিল। নিরাশায় ক্ষোভে তাহার প্রাণ ভরিয়া উঠিল। রোষে সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু নিষ্ফল এ রোষ! এ রোষে কাহারও দেহে এতটুকু আঁচ লাগিবে না! তীব্র দৃষ্টিতে সকলের পানে সে একবার ফিরিয়া চাহিল। মনে হইল, এই লোকগুলার কাণ ধরিয়া চাৎকার করিয়া সে বলে, "তোরা মিথ্যাবাদী—যে রসনায় অলস কুৎসা ছড়াইতেছিস্, সে রসনা তোদের খসিয়া যাক্,—পুড়িয়া যাক্!" কিন্তু সে কথা বলিবার সাহস গেরির নাই। ভোজের আহ্বান পড়িল। সকলে সাগ্রহে উঠিয়া টেবিলের চারিধার ঘেরিয়া বসিয়া গেল।

"আকাশ পরিষ্কার আছে। চল, হেঁটেই বাড়ী যাই।" গাড়ী বিদায় দিয়া গেরির হাত ধরিয়া নবাব হাঁটিয়া চলিলেন।

গেরি ভাবিল, ভালই হইল! রুদ্ধ গৃহে কুৎসার মধ্যে পড়িয়া দেহ তাহার তাতিয়া উঠিয়াছিল। মুক্ত বাতাসে সে ক্লান্তি ঘুচিয়া যাইবে। রাত্রির স্নিগ্ধ মৃদু বায়ু-স্পর্শে তাহার প্রাণের জ্বালা জুড়াইবারও চমৎকার সুযোগ মিলিল। এখানে সে সমাজ-নাটকের যে কয়টা দৃশ্যের অভিনয় দেখিল, তাহা যেমন কুৎসিত, তেমনই বীভৎস! ইহারই নাম পারির সম্ভ্রান্ত সমাজ। আর্টিষ্ট ফেসিলিয়া,—এতখানি যাহার প্রতিভার খ্যাতি, ডিউকের হাতে সে একটা খেলার পুতুলমাত্র! আর মাদাম জেঙ্কিন্স? জেঙ্কিন্সের বিবাহিতা স্ত্রী নহে সে! এত-বড় ডাক্তার,—এতখানি

যাহার মান-সম্ভ্রম, সে একটা গণিকার সংস্পর্শে সদর্পে মাথা তুলিয়া সমাজে দাঁড়াইয়া আছে! এতটুকু লজ্জা নাই! আর এই নবাব জাঁস্‌লে— ঐশ্বর্য্যের যাহার সীমা নাই, সে একজন নিষ্ঠুর নির্লজ্জ দস্যু! গেরির প্রাণে যেন কতকগুলা তপ্ত লোহার শিক্ বিঁধিতেছিল। প্রাণ তাহার জ্বলিয়া খাক্ হইতেছিল। এখান হইতে ছুটিয়া দূরে, বহু দূরে কোথাও পলাইতে পারিলে তবে যেন সে বাঁচিয়া যায়!

ডিউকের সহিত আলাপ হইয়াছে—সেই আনন্দে আকুল-চিত্ত নবাব পথে চলিয়াছিলেন। গেরির প্রাণে যে ক্ষোভের ঝড় বহিয়াছে, তাহার এতটুকু পরিচয়ও তিনি পাইলেন না। এত সুখ নবাবের ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই! এমন সম্মান—এ যে তাঁহার আশার অতীত ছিল! ফেলিসিয়া তাঁহার মূর্ত্তি গড়িতে চাহিয়াছে—ডিউক তাঁহাকে আপনার প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন! নবাবের চিরদিনকার সাধ এতদিনে আজ চরম সার্থকতা লাভ করিতে চলিয়াছে।

নবাবের প্রাণে আনন্দ আর ধরে না! দুইজনে পাশাপাশি পথে চলিয়াছে! একজনের প্রাণ আনন্দে নাচিয়া চলিয়াছে, আর একজন ক্ষোভে জ্বালায় একান্ত সঙ্কুচিত! হঠাৎ নবাব কহিলেন, "এ কি—এরই মধ্যে বাড়ী এসে গেলুম! এস, গেরি, আরও একটু বেড়ানো যাক্!"

গেরি কহিল, "বেশ ত!"

নবাব কহিলেন, "আজকের ভোজটা ভারী জমেছিল। জেঙ্কিন্স খাসা লোক। ফেলিসিয়ার কি রূপ—কি শান্ত স্বভাব! ডিউককে দেখলুম বেশ লোক। এতটুকু দেমাক নেই! পারি—সুন্দর পারি— কি বল, গেরি?"

গেরি রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "আমি ত বড় ঘোরালো দেখচি। আমার কেমন আতঙ্ক হয়।"

"আতঙ্ক!" নবাব হাসিলেন; হাসিয়া কহিলেন, "তা মনে হতে

পারে। তুমি সবে পাড়াগাঁ থেকে আসছ কি না! থাকো—একমাস যাক্—তখন তুমিও দেখবে, পারি কেমন সুন্দর! আমারও প্রথম প্রথম তোমার মত মনে হত!”

“কিন্তু আপনি না পারিতে আগেও একবার ছিলেন?”

“আমি! না,—কখনও না! কে বললে তোমায়?”

“আমার কেমন মন হল”—গেরি সহসা থমকিয়া থামিয়া পড়িল, পরে আবার কহিল, “ব্যারণ হেমারলিঙের সঙ্গে আপনার কোন গোল আছে কি? আপনার উপর লোকটার ভারী আক্রোশ!”

হেমারলিঙের নামে নবাবের প্রাণে একটা বাধা লাগিল। আনন্দের স্রোতে কে যেন বিষাদের পাথর ফেলিয়া দিল। নবাব কহিলেন, “হঁ্যা—আক্রোশ আছে বটে! কিন্তু আমি তার কখনও কোন অনিষ্ট করিনি, বরং ভালই করেছি। যেদিন ভাগ্যলক্ষ্মীর সন্ধানে বেরুই, সেদিন দুজনে আমরা সঙ্গী ছিলুম—পরস্পরের বন্ধু ছিলুম। আমি তাকে অনেক সাহায্য করেছি। আমিই তাকে টিউনিসে কণ্ট্রাক্টের কাজ পাইয়ে দি—সে কাজ দশ বৎসর চলে। সেই থেকেই ওর বরাত ফেরে—ও অগাধ টাকার মালিক হয়। তার পর একদিন হেমারলিং বে’র এক বাঁদীর প্রেমে পড়ে—জানাজানি হতে বের মা সে বাঁদীকে হারেম থেকে তাড়িয়ে দেন। বাঁদীটা সুন্দরী ছিল—তার পর হেমারলিং তাকে বিয়ে করলে। আর এই বিয়ের জন্যই হেমারলিংকে টিউনিস ছাড়তে হয়।

“ওদের কে বলে, আমিই নাকি বে’কে বলে ওদের তাড়াবার মন্ত্রণা দিয়েছি। কথাটা কিন্তু ঠিক নয়! আমিই বরং বেকে বলে-কয়ে হেমারলিঙের ছেলেকে—ওর প্রথম স্ত্রীর গর্ভের ছেলে—টিউনিসে তার বাপের কাজ-কর্ম্ম দেখবার জন্য রাখিয়ে দি। হেমারলিং পারিতে চলে আসে—এসে এখানে ব্যাঙ্ক খোলে! আমার সেই উপকার করার দরুণ হেমারলিং কিন্তু চূড়ান্ত শোধ নিয়েছে।

"তারপর আহম্মদ বে মারা গেলে তার ভাই মগুর বে হল। হেমারলিঙের সঙ্গে তার একটু ভাব ছিল—তিনি লোক মন্দ নন—আমার সঙ্গেও তাঁর ব্যবহার প্রথমটা খারাপ ছিল না। শেষে হেমারলিঙের কানা-কানি-ভাঙাভাঙিতে আমার উপর তাঁর মন চটে গেল—আমি চলে এলুম। হেমারলিং কি এই করেই সন্তুষ্ট রইল? তার স্ত্রীকে দিয়েও যেখানে-সেখানে আমার অপমান করে বেড়াত। আজই ত দেখলে,—তার স্ত্রীর ব্যবহার। আমায় কি রকম তাচ্ছল্যটা করলে! যাক্—করুকগে—আমার আর তাতে কি ক্ষতি হবে? তবে এ সব দেখে আমার শুধু হাসি পায়!

"এখন শোনো, গেরি, আমার কথা—আমি অনেক কাজ করতে চাই। কারবার ঢের করা গেছে—বিশ বৎসর টাকার জন্য হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করেছি। এখন আমি যশ চাই, মান চাই, নাম চাই। দেশের ইতিহাসে নিজের নামটা যাতে চিরকালের জন্য লিখিয়ে রেখে যেতে পারি, এমন কাজ আমি করতে চাই। পিছনে এত টাকা—বাধা বিশেষ দেখচি না—শুধু মাথা খাটানো, গেরি,—বুঝলে বন্ধু?"

নবাবের স্বর জড়িত হইয়া আসিল। গেরির হাত দুইটা সবেগে চাপিয়া ধরিয়া নবাব কহিলেন, "গেরি, তুমি আমার পাশে থাকো—আমার সহায় হও—কখনো আমায় ছেড়ে যেয়ো না। তাহলেই আমার এ অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।"

এই আবেগ-ভরা মধুর স্পর্শে গেরির শিরায় শিরায় পুলকের বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল। আহা, অসহায় বিপন্ন নবাব—সে আজ আশ্রয় চায়। চক্রান্তময় পারিতে নবাবের হৃদয় বোঝে, এমন লোক কেহ নাই। অর্থই সকলের চোখে ঠেকিতেছে—মানুষটা নয়! নবাব বন্ধু চান—গেরি সে বন্ধুত্ব দান করিবে! সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে সে তাঁহার সহচর থাকিবে! নবাবকে এই লুব্ধ ব্যাধদের কঠিন পাশ হইতে রক্ষা

সে করিবেই! করুণায় গেরির চোখে জল আসিল। গাঢ় স্বরে সে কহিল, "নবাব বাহাদুর, আমি চিরদিন আপনার পাশে থাকব—যতখানি সাধ্য, আমি আপনার সাহায্য করব।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জুজ্-পরিবার

তখন সবেমাত্র ভোর হইয়াছে। নিত্যকার মত সেদিন ভোরেও পারির নিভৃত প্রান্তরে অবস্থিত ক্ষুদ্র একখানি গৃহ হাস্য ও আনন্দের উচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিয়াছিল।

"বাবা, আমার বাজনা আন্‌তে ভুলো না।"

"আর আমার পশম!"

"আজ কিন্তু আমার বোনবার কাঁটা আনা চাইই চাই,—"এমনই আব্দার ও সেই সঙ্গে পিতার কণ্ঠ শুনা গেল। পিতা বলিল, "আজ সব জিনিস আনব। ইয়া, আমার ব্যাগটা দিয়ে যাও ত, মা—"

"বাবা, বাবা, রোজ তুমি ব্যাগ ভুলে যাবে! মাগো, তোমায় নিয়ে আর পারিও না আমি!"

ইয়া ব্যাগ লইয়া আসিলে বৃদ্ধ জুজ্ মেয়েদের আবার অনেকখানি ভরসা দিয়া বিদায় লইল। মেয়েরা ছুটিয়া আসিয়া জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল। জানলা দিয়া রাস্তা দেখা যায়। সেই রাস্তায় জুজ যাইবে। তখনও মেয়েদের চোখের পাতে ঘুমের ঘোর জড়াইয়া ছিল, আলু-থালু কেশ—বেশ সহজ সরল শ্রীতে মুখগুলি সুন্দর দেখাইতেছিল। চারটি মেয়ে আসিয়া খড়খড়ির উপর বুক দিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল,

বৃদ্ধ পিতাকে একান্ত স্নেহে বিদায়-সম্ভাষণ করিল! বৃদ্ধ পিতাও পথে দাঁড়াইয়া মৃদু হাসিয়া ফিরিয়া চাহিল।

জুজ খানিকটা অগ্রসর হইলে মেয়েরা জানালা ছাড়িয়া ছুটিয়া চার-তলার ছাদে উঠিয়া আলিশায় ভর দিয়া বাপের পানে চাহিয়া রহিল—যতক্ষণ বাপকে দেখা যায়! দূর হইতে বৃদ্ধ ছাদের পানে চাহিয়া দেখিলেন, দূর হইতেই উভয়-পক্ষের চুম্বন-বিনিময় হইল। তারপর জুজ মোড় বাঁকিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

বাসা হইতে হাঁটিয়া চলিয়া হেমারলিং এণ্ড সনের অফিসে পৌঁছিতে জুজের, ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগিত। পথ দীর্ঘ নয়, তবে জুজের গতি ছিল মৃদু। বেগে চলিলে বাতাস লাগিয়া গলায় বাঁধা সুন্দর বো-টি পাছে ঈষৎ স্থানচ্যুত হয়, এই ভয়ে জুজ কখনও বেগে চলিত না। এ বো মেয়েরা অতি-যত্নে বাঁধিয়া দিয়াছে।

আজ কয় বৎসর, জুজের পত্নী-বিয়োগ হইয়াছে। শোকের উপর পাষাণ চাপা দিয়া এ কয় বৎসর মেয়েদের জন্যই শুধু সে প্রাণ ধরিয়া আছে। মেয়ে ধ্যান, মেয়ে জ্ঞান, মেয়েগুলিকেই নাড়িয়া চাড়িয়া, সাজাইয়া-গুজাইয়া তাহাদের সহিত অজস্র আদর-আব্দার করিয়াই বৃদ্ধ আপনাকে কোনমতে খাড়া রাখিলেও কল্পনা কিন্তু তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে ছাড়ে নাই। অফিসের পথটুকু চলা-ফেরা করিবার সময় কল্পনা তাহার সম্মুখে আপনার মায়াজাল বিস্তার করিয়া ধরিত! বৈদ্যুতিক পাখা যেমন ক্ষিপ্র গতিতে ঘুরিতে থাকে, জুজের মাথার মধ্যে কল্পনাও তেমনি বেগে ঘুরিতে থাকিত। অফিসের একাউণ্টাণ্ট যখন অফিসের হিসাব-নিকাশ করিতে বসিত, কল্পনা তখন সভয়ে দূরে সরিয়া যাইত। তখন জুজকে দেখিলে এ কথা কেহ বলিতে পারিত না, ঘাড় গুঁজিয়া ঐ যে লোকটি অঙ্কের পর অঙ্ক কষিয়া চলিয়াছে, ইহার সহিত ঐ চটুল কল্পনার কোনদিন কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে! কিন্তু একবার

অফিসের বাহিরে পা বাড়াইলে হয়! তুরন্ত শোকের মত কল্পনা বিষম আক্রোশে জুজকে আক্রমণ করিত! মাথায় তাহার ভাবের ফোয়ারা ছুটিত। কত চিন্তা, কত কথা তরঙ্গের মত নাচিয়া খেলিত! সে-সকলের সন্ধান রাখিলে দশজন লেখক মোটা বই লিখিয়া ফেলিত।

সেদিনও সকালে মেয়েদের চোখের আড়ালে আসিতেই জুজের মাথার মধ্যে কল্পনা বিচিত্র চিত্র আঁকিয়া ধরিল। বৎসর শেষ হইতে চলিল—বড়দিন আসন্ন। কন্যাদের জন্য বিবিধ সওগাত কিনিতে হইবে। ডিসেম্বর মাসে হেমারলিং এণ্ড সনের কর্ম্মচারী মাত্রেই অতিরিক্ত এক মাসের মাহিনা ভাতা পাইয়া থাকে। সওগাতের সঙ্গে ভাতার কথাটাও জুজের মনে পড়িল। ছোট-খাট পরিবারে এই ভাতা অনেকখানি আনন্দের সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহারই উপর পুত্রকন্যার হাসি-মুখ নির্ভর করে। দুর্দ্দিনের জন্য সামান্য সঞ্চয়ের আয়োজনও এই ভাতার সাহায্যে সম্পন্ন হয়। কর্ম্মচারীর দল ইহার জন্য মনিবের জয়-গান গাহিতে কখনও শৈথিল্য করে না।

আসল কথা জুজের অবস্থা সচ্ছল নয়। তাহার স্ত্রী ছিল বনিয়াদি ঘরের মেয়ে। পয়সার সাচ্ছল্য না থাকিলেও বনিয়াদি ঘরের মেয়ের পক্ষে চাল কমানো একটা সহজ ব্যাপার নয়। জুজও এ বিষয়ে স্ত্রীকে কোনদিন একটা কথা বলিয়া ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে নাই। সেই স্ত্রী আজ তিন বৎসর সংসার হইতে বিদায় লইয়াছে। স্ত্রীর প্রতি পাছে অসম্মান প্রকাশ পায়, এই আশঙ্কায় জুজ স্ত্রীর জীবিতকালীন ব্যবস্থাদিতে এতটুকু পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেয় নাই। স্ত্রীর জায়গায় জ্যেষ্ঠা কন্যা বন্ মামান্ এখন গৃহিণী—তাহারই হাতে জুজ টাকা-কড়ি তুলিয়া দেয়—গুছাইয়া ব্যয় করিবার ভার বন্ মামানের উপর! এ কাজ বন্ মামান্ এমন সুকৌশলে চালাইয়া আসিতেছে যে সংসারের কোন কোণ হইতে কোন দিন এতটুকু অনুযোগের সুর উঠে নাই।

এ বৎসর ভাতা কিছু মোটা রকমের হইবে বলিয়াই জুজ স্থির করিয়াছিল। স্থির করিবার কারণও ছিল। টিউনিস্ লোনে কোম্পানি এবার বিশেষ লাভ করিয়াছে। জুজ তাহার সহকারীদের এ কয়দিন ধরিয়া আশ্বাস দিয়া ক্রমাগতই এই কথা বলিয়া আসিতেছে, "হেমারলিং এণ্ড সন্ এবার লক্ষ্মীকে তাহার মুঠার মধ্যে পুরিয়া ফেলিয়াছে!"

চলিতে চলিতে জুজ ভাবিল, ভাতা অন্যান্য বৎসরের চেয়ে দ্বিগুণ হইবে, নিশ্চয়! এত লাভ! কল্পনা-নেত্রে সে যেন স্পষ্ট দেখিল, হেমারলিঙের ঘরে তাহার ডাক পড়িয়াছে! হেমারলিং প্রসন্ন মুখে জুজকে ডাকিয়া অনেক টাকার চেক্ কাটিয়া দিতেছে! ধন্যবাদ দিয়া জুজ যেমন চলিয়া যাইবে, অম্নি হেমারলিং তাহাকে ডাকিল, "জুজ, তোমার কটি মেয়ে?"

জুজ জবাব দিল, "তিনটি—না, না, চারটি—আমার ঐ ভারী ভুল হয়ে যায়। বড়টি একেবারে পাকা গিন্নি কি না!"

মনিব কহিল, "তাদের বয়স কত?"

"আলিনের বয়স কত আর,—এই কুড়ি হবে—হ্যাঁ, কুড়িই। সে-ই বড়। তারপর এলিস্, এবার সে পাশ দেবে, তার বয়স হল আঠারো। এনরিতা চোদ্দয় পড়েছে আর জাজা তাকে আমি ইয়া বলে ডাকি, সে এই সবে বারোয় পা দিয়েছে।"

তার পর ব্যারণ হেমারলিং তাহার সংসারের সচ্ছলতার কথা তুলিলেন; একান্ত সঙ্কোচে জুজ বলিল, "এই আমার মাইনেটুকুর উপরই যা ভরসা, ব্যারণ সাহেব। কিছু টাকা জমিয়েছিলুম, তা স্ত্রীর ব্যামোতে আর মেয়েদের লেখাপড়ায়—"

মনিব বলিলেন, "বুঝেচি জুজ, এ মাইনেয় তোমার কুলোয় না। তা মাসে তোমায় হাজার ফ্রাঙ্ক বাড়িয়ে দিলুম—তাতে হবে ত?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়! ওঃ, এ যে ঢের!"

আনন্দের বিহ্বলতায় শেষ কয়টা কথা জুজ এমন সজোরে উচ্চারণ করিল যে দুই-চারিজন পথিকও তাহা শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কিন্তু জুজের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না। সে তখন মাহিনা-বৃদ্ধির সংবাদ লইয়া বাড়া ফিরিয়া কি করিবে তাহাই ভাবিতেছিল! মেয়েদের লইয়া থিয়েটারে যাইবে—একটা বক্স লইবে—হ্যাঁ, নিশ্চয় একটা বক্স! বক্স আলো করিয়া বসিয়া মেয়েরা থিয়েটার দেখিবে,—সম্ভ্রান্ত দর্শকের প্রশংসমান দৃষ্টির বিদ্যুৎ তাহাদের উপর দিয়া ছুটিয়া যাইবে এবং পরদিনই দুই মেয়ের জন্য দুই পাত্র আসিয়া—জুজের কল্পনা এইখানে বাধা পাইল। সে আসিয়া অফিসে পৌঁছিল। মোটা খাতা খুলিয়া নিত্যকার মত কলম লইয়া বসিয়া মৃদু হাসিয়া জুজ ভাবিল, কি যে সব বাজে কথা মনে আসে!

কিয়ৎক্ষণ পরে সংবাদ আসিল, বড় সাহেবের কাছে জুজের ডাক পড়িয়াছে। ব্যারণ হেমারলিং! জুজের বুকের মধ্যে পুলকের বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল! এ কি, এখনও সেই স্বপ্ন-দেখা চলিয়াছে না কি!—না। তবে? তবে কি সে স্বপ্ন সত্য হইয়া ফলিবে? আশায় উৎফুল্ল হইয়া সে মনিবের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। মনিব জুজকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। জুজ নিকটে আসিলে, "জুজ তোমার কটি মেয়ে?" এ কথার পরিবর্তে মনিব কহিলেন, "জুজ, টিউনিস্ লোনের কথা নিয়ে সমস্ত অফিস তুমি একেবারে তোলাপাড়া করে তুলেছ—তুমি যা সব বলেছ, সে সমস্তই আমার কানে গেছে। এ সব আমি মোটে পছন্দ করি না। তা ছাড়া তোমার এই রকম বলে বেড়ানোর ফলে আমাদের ক্ষতিও হয়েছে বিস্তর—এই কারণে আমি তোমায় নোটিস দিচ্ছি—আসছে মাস থেকে তোমার আর আমার অফিসে কাজ করা পোষাবে না!"

ইস্তফা! এ কি কথা! জুজের কাণের কাছে সোঁ সোঁ করিয়া বায়ু বহিতেছিল, মাথার মধ্যে রক্ত-স্রোত ঝড়ের ঢেউয়ের মত তোলপাড়

করিয়া উঠিল। ইস্তফা! আর তাহার মেয়েরা! বেচারী মেয়েরা! তাহাদের দশা কি হইবে? এ সময়ে সস্তায় একটা বাড়ী সংগ্রহ করাও যে বিষম কঠিন ব্যাপার!

জুজের চোখের সম্মুখে দারিদ্র্যের এক বীভৎস কঙ্কালসার মূর্ত্তি খুট্ খুট্ করিয়া নাচিয়া উঠিল। একবার তাহার মনে হইল, মনিবের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া সে আপনার দুর্দ্দশার কাহিনী খুলিয়া বলে! কিন্তু না, তাহাতে কোন ফল হইবে না। সে জানে, হেমারলিঙের প্রাণ পাথরের মত কঠিন! কিছুতে গলিবে না, বেদনার আক্ষেপ তাহাতে এতটুকু ক্ষীণ রেখাও পাত করিতে পারিবে না! নিরুপায় জুজ চোখের জল মুছিয়া ধীরে ধীরে সে কক্ষ ত্যাগ করিল।

সেদিন গৃহে ফিরিয়া মেয়েদের কাছে জুজ কোন কথা বলিল না। বলিবার সাহস ছিল না। আসন্ন উৎসবের আয়োজনে মেয়েরা বিভোর হইয়া রহিয়াছে! এ সময় তাহাদের সে আনন্দে আঘাত দিবার সাহস জুজের ছিল না। এ কথা শুনিলে চোখ তাহাদের জলে ভরিয়া যাইবে! তা ছাড়া এত তাড়াই বা কেন! কাল এ কথা বলিলেও ত চলিতে পারে!

এমনই করিয়া নভেম্বর মাস শেষ হইয়া গেল। রোজই তাহার মনে আশা জাগিত, আজ হয় ত হেমারলিং ডাকিয়া পাঠাইবে। কিন্তু সে আশা নিত্যই নিষ্ফল হইত। তার পর ডিসেম্বর মাসে মাহিনা আনিতে গিয়া জুজ যখন এক মাসের মাহিনা অতিরিক্ত পাইল, তখন সে ভাবিল, এবার বুঝি চাকরিটিতেও পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়—কিন্তু তাহা ঘটিল না। জুজ দেখিল, তাহারই আসনে বসিয়া আর একজন লোক বেশ নিবিষ্ট চিত্তে হিসাব লিখিতেছে।

বাড়ীর সহিত জুজ এতদিন চাতুরী খেলিয়া আসিতেছিল। পূর্ব্বেকার মত অফিসে বাহির হইবার সময় নিত্যই সে বাড়ীর বাহির হইয়া আসে—মেয়েরা পশম পুতুল প্রভৃতির জন্য আব্দার করে। ইচ্ছা করিয়াই মেয়েদের

সে ফরমাস্ মিটাইতে সে ভুলিয়া যায়। মেয়েরা জিজ্ঞাসা করিলে ঢোঁক গিলিয়া মৃদু হাসিয়া জুজ উত্তর দেয়, "আজ বড় খাটুনি ছিল মা, সময় পাইনি।"

সারাদিন জুজের পথে ঘুরিয়াই কাটিয়া যায়; কখনও বা লোকের মুখে আশা পাইয়া কোন অফিসে চাকরির চেষ্টায় সে প্রবেশ করে—কিন্তু সর্ব্বত্রই উত্তর সেই একই,—সকলেই অল্প বয়সের লোক চায়—টাকা দিয়া পুরা দমে যাহাকে খাটাইয়া লওয়া যাইবে, এমন লোক! বৃদ্ধের দেহে আর কত বল! কেহ বা সহানুভূতি জানাইয়া বলে, "এঁ্যা—হেমরালিং এণ্ড সন তোমায় ছাড়িয়ে দিয়েছে! এ ভারী অন্যায়!" কেহ বা আশ্বাস দেয়, "জানুয়ারি মাস পড়লে, বছরের গোড়ার দিকে একবার এস। তখন দেখা যাবে।" জুজ বেচারা একে নিরীহ, তাহার উপর নিজের এই আকস্মিক দুর্ভাগ্যে সে একেবারে মরিয়া আছে। লোকের কাছে এ দুর্ভাগ্যের কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে মাথা তাহার কাটা যায়। তাই সে কোথাও আর দ্বিতীয় কথা উচ্চারণ না করিয়া আশ্বস্তভাবেই ফিরিয়া আসে।

বৃষ্টি ও তুষার-পাতের মধ্য দিয়া এমনই ভাবে নিষ্ফল ভ্রমণে জুজের দিন কাটিয়া যায়। চাকরি নাই! সে চাক্‌রি খুঁজিতেছে! এ যে বড় লজ্জা কথা! তাই শেষে এমন ঘটিল যে, চাকরির কথা লইয়া কাহারও সম্মুখে দাঁড়াইতেও তাহার সঙ্কোচ ঘটিতে লাগিল। বলিয়াও যখন এত দিনে চাকরি পাওয়া গেল না, তখন আর সে কথা তুলিয়া ফল কি! কিন্তু বাড়ীর অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় দাঁড়াইল। মেয়েরা হেমারলিঙের কথা জিজ্ঞাসা করে। কবে সে মাহিনা বাড়াইয়া দিবে! কত টাকা বাড়াইবে! জুজ তাহার কি জবাব দিবে? হেমারলিঙের নিম্মমতায় তাহার পাঁজরার হাড় কয়খানা যে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বুকে জোর নাই! দশ বৎসর সে হেমারলিঙের অফিসে কাজ করিয়াছে। আজ বার্দ্ধক্য যখন তাহার শিরাগুলাকে লোল করিয়া দিয়াছে, ঘুরিয়া বেড়াইবার সামর্থ্যটুকুও কাড়িয়া

লইয়াছে, তখন বিনা-দোষে মনিব তুচ্ছ একটা খেয়ালের বশে শুধু তাহাকে সাফ জবাব দিল! হেমারলিঙের প্রশংসায় মেয়েদের কাছে সে যে বড় গলা বাহির করিত! আজ সেই হেমারলিঙের নিষ্ঠুরতার কথা ভাবিতে গিয়া সব যেন কেমন বিসদৃশ ঠেকিল—নিজের কানেই তাহা কেমন মিথ্যার মত শোনায় যে! অপরকে সে তাহা বলিতে পারিল না। তাই সে মিথ্যার আশ্রয় লইয়া এমনই ভাবে অভিনয় করিয়া চলিল। মেয়েরা একটা বিষয় স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়াছিল। সে বিষয়ে ইঙ্গিত করিতেও তাহারা ভুলে নাই। মেয়েরা নিতাই বলে, "বাবার শরীর একটু ভাল যাচ্ছে বোধ হয়। আগে ত বাবার এমন খিদে হত না। এখন কিন্তু অফিস থেকে ফিরে বাবা খেতে পারে ভাল!" এ ইঙ্গিত ছুরির ফলার মত জুজের মর্ম্মে বিঁধিত।

দিন কাটিতে লাগিল। জুজের চাকরী মিলিল না। হাতের পুঁজিও ক্রমে কমিয়া আসিতেছিল। জুজ চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছিল। আর বুঝি মিথ্যা বলিয়া ব্যাপারটাকে চাপিয়া রাখা যায় না। সওগাতের জন্য জাজা উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে, বন মামান কাল সওগাতের কথা বলিয়াছিল—কাহার কি চাই, কাহাকে কি জিনিস উপহার দিলে ঠিক হয়, বন মামান সে কথাও বলিয়া ছিল—জুজের তখন দারুণ অগ্নিপরীক্ষা চলিয়াছিল। মেয়ের মুখের দিকে চোখ তুলিয়া সে চাহিতে পারে নাই। তাহার অকপট সরল দৃষ্টির সম্মুখে জুজের ভিতরকার সমস্ত গোপন রহস্য যদি আভাষেও বাহির হইয়া পড়ে! যে সকল কয়েদীকে কয়েদ-খালাসের পর হাকিমের আদেশমত পুলিশের নজর-বন্দী থাকিতে হয়, তাহারা যেমন চলিতে-ফিরিতে একটা বিশ্রী রকমের অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে, জুজের অবস্থাও ঠিক তাহাদের মতই দাঁড়াইয়াছিল। কে জানে, এ ভাবে এখনও কতদিন কাটাইতে হয়! বুঝি বা জীবনের বাকী কয়টা দিনই এমনভাবে কাটিবে! এই কিছুদিন পূর্ব্বে পুরাতন বন্ধু পাসাজেঁা

বলিয়াছিল, "নবাবের ওখানে কাজ করবে? বেশী মাহিনা মিলবে।" তখন জুজ হেমারলিঙের চাকরি ছাড়ে নাই। সে বলিয়াছিল, "বিনা-দোষে মনিব ছাড়ব! শুধু পয়সার লোভে? ছিঃ!"

আজ মনিব তাহার এমন নির্লোভ অন্তর না বুঝিয়াই অকারণে তাহাকে বিদায় করিয়া দিল! শুধু বিদায়—? এ যে এক-রকম পথে বসানো। তাই আজ সেই পাসাজোঁর কাছে গিয়া মুখ তুলিয়া নবাবের ওখানে চাকরির কথা তুলিতেও তাহার লজ্জা হইল।

হায়, কেন সে টিউনিস্ লোন্ লইয়া এতখানি মাথা ঘামাইতে গিয়াছিল! এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন তাহার ঘটিয়াছিল! জীবন-গ্রন্থের পৃষ্ঠা হইতে সেই দুর্দ্দিনের কথাটা যদি রবার ঘষিয়া পেন্সিলের দাগের মতই তুলিয়া ফেলা যাইত! কিন্তু না, সে হয় না—! কবিরা মিথ্যা উপমার ভারে মানুষকে মজাইয়া গিয়াছেন। কে বলিল, জীবন গ্রন্থ-স্বরূপ! গ্রন্থের একখানা পাতা ছিঁড়িয়া সে জায়গায় আর একখানা পাতা সহজেই জোড়া-তাড়া দিয়া কোনমতে তাহার পরিপূর্ণতাটাকে খাড়া রাখা যায়, কিন্তু জীবন—এ যে বড় কঠিন ব্যাপার! সেখানে কোথাও এতটুকু গোঁজামিল চলে না—! জোড়া-তাড়া খাটে না! এ এক নির্ম্মম প্রহেলিকার মতই চলিয়াছে, একটি ভুল করিলে—তা সে ভুল যতই ছোট হোক—তাহা আর ফিরাইবার উপায় নাই!

কাল বড়দিনের অধিবাস-সন্ধ্যা। কাল সকালে সওগাত আনা চাই—নহিলে মেয়েদের কাছে মাথা তুলিয়া দাঁড়ানো যাইবে না। এই যে জাজা আজ হইতে বায়না ধরিয়া কাঁদিতে সুরু করিয়াছে। সেজ মেয়েটিও ম্লান নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া ছিল—এলিসও কি বলিতে আসিয়া বাপের মুখের দিকে চাহিয়া কি ভাবিয়া কিছুই আর বলিতে পারিল না। আর বন মামান্? সে বুঝি পিতার হৃদয়ের গূঢ় রহস্যের আভাস পাইয়াছিল! বুঝি সে কিছু সন্দেহ করিয়াছিল—তাই আর তাগাদা করে নাই! জুজের বুক

ফাটিয়া যাইতেছিল। কাল সে কি করিবে—কি করিয়া সওগাত আনিয়া মেয়েদের মুখে হাসির কিরণ ফুটাইয়া তুলিবে! বৎসরের দিনে সারা পারি উৎসবের আমোদে মাতিয়া উঠিয়াছে—ছেলে-মেয়ে নর-নারী সকলেই উল্লাসে বিভোর—আর সে এমন দীন, এমনি লক্ষ্মীছাড়া যে—

জুজের চিন্তা-স্রোতে বাধা পড়িল। বাহিরে কে দ্বারে করাঘাত করিল। কে আসে? হেমারলিঙের ওখান হইতে কেহ আসিল না কি! এলিস যাইয়া দ্বার খুলিয়া দিল। এক অপরিচিত তরুণ যুবা কক্ষে প্রবেশ করিল। মেয়েরা চকিতে ত্রস্তা হরিণীর মত ছুটিয়া পলাইয়া গেল। জুজ জিজ্ঞাসুভাবে মুখ তুলিয়া চাহিল। যুবা অভিবাদন করিয়াই কন্যাদের সহিত বৃদ্ধের এ মধুর অবসর-উপভোগে বাধা দেওয়ার জন্য প্রথমেই ক্ষমা প্রার্থনা করিল, পরে বলিল, জুজের পুরাতন বন্ধু পাশার্জোঁর কাছে তাঁহার কর্ম্মপটুতার পরিচয় পাইয়া সে আজ তাঁহার দ্বারে বিশেষ প্রয়োজনে আসিয়া হাজির হইয়াছে। যদি জুজ কয়টা মাস—সপ্তাহে তিন-চারি ঘণ্টার মত কোনরকমে অবসর করিয়া ব্যাঙ্কের হিসাব-নিকাশ রাখা কাজটা তাহাকে কিছু শিখাইয়া দেন!

যুবার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই জুজ কম্পিত স্বরে কহিল, "বলেন কি! তা আর সুবিধে হবে না? খুব হবে—বিশেষ এখন ত আর আমার অন্য কোন কাজ-কর্ম্ম নেই! তা আপনার কখন্ সুবিধে হবে, বলুন, কোথায় আমায় যেতে হবে—?"

যুবা বলিল, "ভালো কথা। আমি লুকিয়ে এ কাজ শিখতে চাই। আপনার যদি কোন রকম অসুবিধা না হয়, আর যদি অনুমতি করেন ত এইখানে এসেই শিখি। তবে একটা কথা আজ আমি বিপ্লবের মত আসার দরুণ যাঁরা ছুটে পালিয়ে গেলেন, যদি বারে-বারে তেমন ঘটে, তাহলে কিন্তু আমার পক্ষে আসা শক্ত হবে।"

জুজ হাসিয়া কহিলেন, "ও আমার মেয়েরা। ওরা আমার কাছে

রাত্রে বসে একটু-আধটু গল্প-স্বল্প করে কি না! তা ছাড়া ওরা বেশী রাতও জাগে না ত!”

শেষে স্থির হইল, দুপুর বেলায় ও সন্ধ্যায় বসিয়া শিক্ষা দেওয়ায় কাহারও কোন অসুবিধা ঘটিবে না।

যুবা কহিল, “কিছু মনে করবেন না—আপনি যে এতখানি পরিশ্রম করবেন, তার জন্য কিছু পারিশ্রমিক—আপনি অবশ্য এতে দোষ নেবেন না—অর্থাৎ কি না—”

জুজের মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে বাধা দিয়া কহিল, “না, না, আপনি শিখবেন,—আর এতে আমার মেহনতই বা কি! বসে আছি আপনাকে না হয় একটু শেখালুমই—”

যুবা কহিল “না, না। সে কি হয়? তবে আপনার যোগ্য দিতে পারি—এমন সামর্থ্য আমায় নেই, তবু—”

জুজের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। তাহার মুখে কথা ফুটিল না। ইহাকেই বলে, ভগবানের করুণা! কালিকার ভাবনায় সে যখন অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল—ভাবিয়া কূল পাইতেছিল না, তখন কোন্ স্বর্গ হইতে এ কি করুণা ঝরিয়া পড়িল! যুবা কহিল, “এই এক মাসের জন্যে তাহলে আগাম কিছু নিন্!” জুজের হাতের মধ্যে যুবা নোট গুঁজিয়া দিল।

জুজ চমকিয়া উঠিল, “এ কি—এত টাকা!”

“এত আর কি! সামান্যই!”

জুজ কোন কথা বলিল না, করুণ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে যুবার পানে চাহিয়া রহিল! যুবা কহিল, “তাহলে বুধবার থেকে আসব—কি বলেন মস্ জুজ?”

“বুধবারেই—আচ্ছা—। তা বেশ মস্যঁ—আপনার নামটা—?”

“ওহো—আমার নামই বলা হয় নি। আমার নাম দ্যে গেরি—পল্ দ্যে গেরি—”

গেরি বিদায় লইল। দুই জনেই বিস্মিত, পুলকিত! জুজ ভাবিল, এ আমার ভগবান—এ আসিয়া আসন্ন বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা করিল! কৃতজ্ঞতায় অন্তর তাহার লুটাইয়া পড়িতে চাহিল। গেরি বিস্মিত হইল—এই নির্লোভ-চিত্ত নিরীহ বৃদ্ধকে দেখিয়া। এও একজন পারির লোক! এমন লোক পারিতে থাকিতে পারে, ইহা সে কখনও কল্পনা করে নাই। কেতাবে এমন লোকের কথা, কৈ, কেহ ত লেখে না—পারির সম্ভ্রান্ত সমাজে এমন লোকের দেখাও মিলে না যে! জুজকে দেখিয়া গেরির আজ আবার নূতন করিয়া সেই পল্লীর কথা মনে পড়িল—পারির বিপুল হৃদয়হীনতার মধ্যে শান্তিময় একটি হৃদয়ের সন্ধান পাইয়া সে যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ফেলিসিয়া

কক্ষে ফেলিসিয়া, নবাব ও ডাক্তার জেঙ্কিন্স বসিয়াছিলেন।

মৃত্তিকা লইয়া নবাবের মূর্ত্তি গড়িতে গড়িতে ফেলিসিয়া ডাক্তার জেঙ্কিন্সের পানে চাহিয়া কহিল, "আপনার ছেলের খপর কি, ডাক্তার? তাকে আর আপনার বাড়ীতে দেখতে পাই না যে! বেশ লোকটি! কোথায় গেল সে?"

জেঙ্কিন্স কহিলেন, "কোথায় গেল! সে খপর তুমি যেমন জানো, আমিও তেমনি জানি। সে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। ও বাড়ীতে তাঁর পোষাচ্ছিল না। অর্থাৎ স্বাধীনতার হাওয়া পেয়েছেন—আর কি!"

হাতের তুলি টেবিলের উপর ফেলিয়া ফেলিসিয়া ঘুরিয়া বসিল, ডাক্তারের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "ঐ খানটায় মাপ করবেন, ডাক্তার সাহেব। এই স্বাধীনতার হাওয়া কথা নিয়ে আপনারা আজকাল ভারী তাচ্ছল্য সুরু করেছেন—যেন সেটা ভারী বিদ্রূপ, ভারী অপরাধের! দারিদ্র্যের মধ্যে থেকে যে ব্যাচারারা চেপে পিষে সারা হচ্ছে, তারা যদি আপনাদের খেয়াল-মত আপনাদের খানার টেবিলের চারিদিকে খোসামুদের মত বসে থেকে আপনাদের যত-সব ছোট তুচ্ছ বাজে কথায় সায় দিয়ে তার তারিফ করতে না পারে, মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা পায়, অমনি তাদের বিরুদ্ধে আপনাদের এই বিদ্রূপ-বাণ অজস্র ধারে বর্ষণ হবে! আপনারা চান, যে তারা আপনাদের জুতোর তলা চেটে আর পাতে-পড়া দু'টুকরো ছেঁড়া রুটি আর মাংসের হাড় মুখে পুরে নিজেদের কৃতার্থ বোধ করবে! সেইটি যারা না করে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা পাবে, তাদের একেবারে মস্ত অপরাধ হবে—না? স্বাধীন হাওয়া,—সেটা ঠাট্টার কথা নয়। তাদের স্বাধীন হাওয়া যে দেশের উপর দিয়ে বয়ে যায়, সে দেশ ধন্য হয়! যে স্বাধীন হাওয়া দোষের, সে হাওয়ায় আপনারা ঘুরে বেড়ান, সে হাওয়া আপনাদের নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে মিশে আছে! আপনাদের মানে আপনি, ডিউক, মপার্ভ বোয়াল্যান্দ্রঁ, এঁদের!—যাঁরা সমাজে বিনা দ্বিধায় উচ্ছৃঙ্খলতা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, যাঁদের ধর্ম্ম নেই, ইজ্জৎ নেই, দুনিয়াটাকে খালি ভোগের জায়গা বলেই যাঁরা জেনে রেখেছেন—নিজেদের বিলাসের জন্য অপরের সর্ব্বনাশ করতে যাঁদের চোখের পাতা এতটুকু পড়তে জানে না, স্বাধীন হাওয়া দোষের তাঁদের—"

ফেলিসিয়ার মাথায় শিরাগুলা উত্তেজনায় দপ্ দপ্ করিতে লাগিল, মুখ-চোখ রাঙা হইয়া উঠিল। সে আজ ক্রুদ্ধা ফণিনীর মতই ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে! আরও কি সে বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ডাক্তার জেঙ্কিন্স বাধা দিয়া কহিলেন, "স্থির হও ফেলিসিয়া।"

ফেলিসিয়া কহিল, "না, আপনিই বলুন আমার কথা ঠিক কি না! আপনাদের জীবনের লক্ষ্য কি? শুধু পয়সা—তা সে পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গেই হোক, আর তাদের চোখে ধূলো দিয়েই হোক! আপনারা চান্ শুধু পয়সা, বিলাস, আর ভোগ! কোন ভাল জিনিষে আপনাদের রুচি আছে! সাহিত্যের দিক ঝোঁক সে শুধু নামের জন্য—ছবির তারিফ করেন, নামের জন্য—নাম করতে চান্ শুধু আপনারা—কাজ চান না!"

জেঙ্কিন্স উপায়ান্তর না দেখিয়া মৃদু হাসিল, হাসিয়া হাতের দস্তানা খুলিতে খুলিতে বলিল, "হুঁঃ—ছেলেমানুষ! তোমার সঙ্গে তর্ক করব কি!"

নবাব এতক্ষণ স্থিরভাবে সকল কথা শুনিতেছিলেন। তিনি কহিলেন, "কিন্তু উনি ঠিক কথাই বলেছেন, ডাক্তার! আমরা জীবনে করলুম কি —করছিই বা কি! পয়সার জন্য প্রথম বয়সটা পাগলের মত কাটিয়ে দিয়েছি—আর এখন নাম বাজাবার দিকেই আমাদের প্রধান লক্ষ্য! যে করে এ টাকা হয়েছে, তা কে না জানে! কিন্তু আমার পোজ্‌টা ভেঙ্গে গেল, বোধ হয়, মাদামোসেল—"

ফেলিসিয়া কহিল, "থাক্, আজ আর গড়ব না। আর একদিন হবে তখন।"

অদ্ভুত বালিকা, এই ফেলিসিয়া। সে আর্টিষ্টের কন্যা। তাহার পিতা সিবাস্তিয়ন রুই একজন প্রতিভাশালী আর্টিষ্ট ছিল। শৈশবেই ফেলিসিয়ার মাতার মৃত্যু হয়—মাকে সে কখনও চক্ষে দেখে নাই। স্ত্রী ছিল, সিবাস্তিনও তাই কোন মতে খাড়া ছিল। শৈশব হইতে পিতার কলাগৃহটির মধ্যেই ফেলিসিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার জগৎ এই ক্ষুদ্র ঘরটিকে লইয়াই। কাদা লইয়া সে পুতুল গড়িত, কোনটা দুই দিন থাকিত, কোনটাকে সে গড়িয়াই ভাঙ্গিয়া ফেলিত। অল্প বয়স হইতে তাহার এ কাজে কেমন একটু অশিক্ষিত-পটুত্ব জন্মিয়াছিল। পিতা সিবাস্তিয়ন

কন্যার ভুল শুধরাইয়া দিত, শিল্পের সূক্ষ্ম কৌশলগুলাও বুঝাইতে শিখাইতে ছাড়িত না।

এমনই করিয়া গঠন-শিল্পে যখন ফেলিসিয়া ধীরে ধীরে আপনার শক্তি-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পাইতেছিল, তখন সহসা একদিন সিবাস্তিয়ন পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া একেবারে অক্ষম হইয়া পড়িল। তাহার গৃহে শিল্প-নৈপুণ্যের তারিফ করিতে যে সকল লোক আসিত, ডাক্তার জেঙ্কিন্স তাহাদের মধ্যে একজন। জেঙ্কিন্সের সহিত সিবাস্তিয়নের কতকটা সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়া ছিল। তাহার উপর এই পীড়া উপলক্ষ করিয়া সেই সৌহার্দ্দ্য রীতিমত পাকিয়া উঠিল।

ডাক্তার জেঙ্কিন্স নিত্য তাহাকে দেখিতে আসিতেন। বন্ধুকে কত আশ্বাসের কথায় ভুলাইতেন; ফেলিসিয়াকেও কম উৎসাহ দিতেন না। বন্ধুর গৃহে ক্রমে তিনি একরূপ অভিভাবকের মত হইয়া উঠিলেন। সব জিনিসের সন্ধান রাখা, খুঁটিনাটি প্রত্যেক প্রয়োজনীয় জিনিষটির তদ্বির করা, এ সকলের কোনটাতে একদিনের জন্যও তাঁহার এতটুকু শৈথিল্য দেখা যায় নাই।

ফেলিসিয়ার দিনগুলা নিতান্তই নিঃসঙ্গ নির্জ্জনভাবে কাটিতেছিল। এ নির্জ্জনতা-ভঙ্গ-কল্পে ডাক্তার প্রত্যহই প্রায় ফেলিসিয়াকে মাদাম জেঙ্কিন্সের নিকট লইয়া আসিতেন; সারাদিন মাদামের সাহচর্য্যে কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় ডাক্তার আবার ফেলিসিয়াকে নিজেই সঙ্গে করিয়া তাহার গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া যাইতেন। কন্যার প্রতি ডাক্তারের এতখানি স্নেহ-মমতা দেখিয়া রোগ-শয্যা-শায়িত অক্ষম সিবাস্তিয়ন কতকটা আরাম পাইতেন।

ফেলিসিয়া রাত্রে পিতার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া শিল্প সম্বন্ধে নানা কথা পাড়িত, পিতা প্রসন্ন চিত্তে তাহাকে সে সকল বুঝাইয়া দিত। কোনদিন -বা ফেলিসিয়া বসিয়া বই পড়িত, সিবাস্তিয়ন বিছানায় শুইয়া শুনিয়া যাইত।

ফেলিসিয়া মূর্ত্তি গড়িত, সিবাস্তিয়ন মুগ্ধ নেত্রে কন্যার শিল্প-নৈপুণ্য দেখিত —আশার আনন্দে প্রাণ তাহার ভরিয়া উঠিত।

এদিকে কিন্তু শরীর তাহার ক্রমেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। নিজে সে স্পষ্ট বুঝিতেছিল, এ দেহ প্রাণখানাকে বহিবার পক্ষে ক্রমেই যেন অধিকতর দুর্ব্বল নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে—মৃত্যু যেন ক্রমেই তাহার অলক্ষ্য হাত বাড়াইয়া অগ্রসর হইতেছে। মৃত্যুর পর মেয়ের দশা কি হইবে ভাবিতে গিয়া নিশ্বাস তাহার বন্ধ হইয়া আসিত—বুকের মধ্যে অব্যক্ত বেদনা টন্ টন্ করিয়া উঠিত। ফেলিসিয়া পাছে সে বেদনার এতটুকু আভাস পায়, এই আশঙ্কায় প্রায়ই তাহাকে সে চোখের আড় করিবার চেষ্টা পাইত। ডাক্তার আসিলেই স্নেহান্ধ পিতা ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে জানাইত—ফেলিসিয়া অনেকক্ষণ বদ্ধ গৃহে রহিয়াছে, তাহাকে একটু বাহিরের মুক্ত বায়ুতে বেড়াইয়া আনো। বন্ধুর এই অনুরোধ রক্ষা করিতে ডাক্তার কোনদিন এতটুকু অবহেলা করেন নাই, ফেলিসিয়াও অনেকখানি বহির্জগৎকে চকিতে দেখিয়া লইবার অবকাশ পাইয়া বর্ত্তাইয়া যাইত।

এমন সময় সহসা এমন একটা ঘটনা ঘটিল, যাহাতে সরলা কিশোরীর উন্মুখ চিত্ত দারুণ বাধা পাইল; অবিশ্বাসে ভয়ে ঘৃণায় সে একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। অন্যদিনের মত জেঙ্কিন্সের সহিত ফেলিসিয়া সেদিনও তাঁহার গৃহে গিয়াছিল। মাদাম জেঙ্কিন্স গৃহে ছিলেন না—দুই দিনের জন্য কোথায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতির জন্য ফেলিসিয়া একটুও সঙ্কোচ বোধ করে নাই। ডাক্তারের বয়স ও পিতার সহিত তাঁহার বন্ধুত্বের পরিমাণ ভাবিয়া ডাক্তারের স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে পঞ্চদশ-বর্ষীয়া কিশোরী ফেলিসিয়াকে স্বগৃহে লইয়া যাইতে ডাক্তারও কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। বয়স পনেরো বৎসর হইলে কি হয়, সরলতায় ফেলিসিয়া ছিল সপ্তমবর্ষীয়া বালিকারই অনুরূপ।

সন্ধ্যার সময় জেঙ্কিন্স ফেলিসিয়াকে লইয়া বাগানে আসিয়া বসিলেন। মাথার উপর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। স্নিগ্ধ বাতাস বহিতেছিল— কুঞ্জে বসিয়া দুই-চারিটা পাখীও বড় মিঠা সুরে গান গাহিতেছিল। সিবাস্তিয়নের বিষয়েই উভয়ের কথা হইতেছিল—সহসা ফেলিসিয়া একটা কঠিন বাহুপাশে আপনাকে বদ্ধ দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল, তখনই সে বাহুপাশ সবলে ঠেলিয়া অগ্নিময় দৃষ্টিতে সে ডাক্তারের পানে চাহিল। মাথার উপর তখন দুই-চারিটামাত্র নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, আকাশের এক কোণ হইতে ক্ষীণ চাঁদের মৃদু আলোক-কণা দেখা দিয়াছে—ফেলিসিয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, ডাক্তরের অধরের কোণে বক্র একটা হাসির রেখা! তাহার মনে হইল, কঠিন আঘাতে ঐ হাসিটাকে সে চূর্ণ করিয়া দেয়! সে দৃষ্টি, সে বাহু-বন্ধনের অর্থ কি, তাহা বুঝিতে ফেলিসিয়ার বিলম্ব ঘটিল না—সে নভেল পড়িয়াছিল, রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ও দেখিয়াছিল বিস্তর—তাই ঘৃণায় তাহার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তাহার ঘন-কম্পিত দীর্ঘশ্বাসে ডাক্তারের দুরভিসন্ধি মেঘের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ডাক্তার আপনার অবস্থা বুঝিয়া তখনই জানু পাতিয়া ফেলিসিয়ার কাছে ক্ষমা চাহিল। ডাক্তার কম্পিত স্বরে বলিলেন, এ শুধু ক্ষণিক মোহ মাত্র! ভ্রান্তি,—দুর্ব্বল ভ্রান্তি শুধু! এমন স্নিগ্ধ সন্ধ্যা, মধুর বাতাস,—আর সম্মুখে অপূর্ব্ব-রূপিনী তরুণী,—মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার চিত্তে বিকার ঘটিয়াছিল! সংযমের বাঁধ তাই কেমন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল! ক্ষমা, ক্ষমা কর, ফেলিসিয়া! যদি সে জানিত, ডাক্তার তাহাকে কতখানি ভালবাসেন! আপনার প্রাণের অধিক, জগতে তাঁহার যাহা-কিছু অছে, সে-সকলের চেয়ে ভালো বাসেন! দৃষ্টিতে অবজ্ঞা হানিয়া ফেলিসিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল,—নির্লজ্জ কাপুরুষ, এ কথা কোন্ মুখে বলিতেছ, তুমি! তুমি না পিতার বন্ধু—চলিয়া যাও— এখনই আমাকে গৃহে পৌঁছাইয়া দাও।

যন্ত্র-চালিতের মত জেঙ্কিন্স ফেলিসিয়াকে গাড়ীতে তুলিয়া দিল।

গাড়ীতে সে উঠিয়া বসিলে, গাড়ীর মধ্যে মুখ পুরিয়া ক্ষমা চাহিয়া মৃদু স্বরে ডাক্তার কহিলেন, "এ সম্বন্ধে আর কোন কথা নয়। তোমার বাপের কাণে কোন কথা যেন না ওঠে। সে বেচারা এ কথা শুনলে এখনই মারা যাবে।"

এমনই করিয়া ধূমও পুরুষে ফাঁদ পাতে,—আর সরলা নারী না জানিয়া সে ফাঁদে ধরা দেয়! ফেলিসিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিল। তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত তখনও কাঁপিতেছিল। সে কোন কথা কহিল না।

ফেলিসিয়ার প্রকৃতি ডাক্তারের জানা ছিল। তাই সে পাষণ্ড পরদিন —যে-মুখে পূর্ব্বদিন বন্ধু-কন্যাকে দুর্ব্বাক্য বলিয়াছিল, সেই মুখেই হাসি ফুটাইয়া সিবাস্তিয়নের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। সিবাস্তিয়ন সহজভাবে অন্য দিনের মতই কথা পাড়িল; ফেলিসিয়া তবে কথাটা তাহাকে বলে নাই? আঃ! জেঙ্কিন্সের প্রাণটা জুড়াইল।

পিতাকে ফেলিসিয়া সে কথা বলে নাই, সত্য। না বলুক, সেদিন হইতে কিন্তু তাহার চিত্তে একটা পরিবর্ত্তন আসিল। পুরুষকে সে ঘৃণা করিতে শিখিল, অবিশ্বাস করিতে শিখিল! পিতার উপর রাগ হইতে লাগিল, কেন তিনি তাহাকে সম্মান-রক্ষার উপযোগী কোন শিক্ষা দেন নাই! এতদুর দুঃসাহস এক বৃদ্ধ বর্ব্বরের, যে তাহার অঙ্গে সে হাত দেয়!

কন্যার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া পিতা ডাক্তারকে কহিল, "দেখ ত ডাক্তার —ফেলিসিয়ার মেজাজটা ক'দিন আমি ভাল দেখেছি না, ওর কোন অসুখ-বিসুখ হল না ত!" নিলর্জ্জ ডাক্তার অচপল কণ্ঠে জবাব দিলেন, "একটু হজমের গোলমাল হয়েছে—তা ওষুধ দিয়ে যাচ্চি, ব্যস্ত হয়ো না।" না—ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন ছিল না।

সিবাস্তিয়নের জীবনের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিয়াছিল—দুই-এক দিনের মধ্যেই সে ইহলোকের সহিত সব সম্পর্ক চুকাইয়া দিল। মৃত্যুর সময় ডাক্তারকে ডাকাইয়া কন্যাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া সিবাস্তিয়ন বলিল,

"ডাক্তার, ফেলিসিয়াকে আমি তোমারই হাতে দিয়ে গেলুম। ওকে দেখো —ওর আর কেউ নেই!"

ফেলিসিয়া কাঠের মত নিশ্চলভাবে বিছানার পাশে দাঁড়াইয়াছিল—এ কথায় সে এতটুকু বিচলিত হইল না। ডাক্তারের কানে কথাটা কঠিন বিদ্রূপের মতই শুনাইল—তবু তিনি গাঢ় স্বরে কহিলেন, "দেখব বৈ কি, নিশ্চয় দেখব— সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো!"

ফেলিসিয়ার কোন জ্ঞান ছিল না। দুঃখটা এত প্রচণ্ডভাবে তাহাকে আঘাত করিল, যে তাহার কাঁদিবার শক্তিও লোপ পাইল। তাহার মনে হইল, মুহূর্ত্তে যেন এ পৃথিবীখানা মরুভূমির মতই বিশাল ও অবলম্বনহীন হইয়া পড়িয়াছে। বিপদের রাত্রি অজগরের মতই চতুর্দ্দিক হইতে শুধু গ্রাস করিতে আসিতেছে! এই আলোক-হীন বিশাল মরুপ্রান্তরের মধ্য তাহাকে দীর্ঘ জীবন কাটাইয়া যাইতে হইবে! কোথায় আশ্রয়, কোথায় অবলম্বন! হায় রে, তাহার যে আর কেহ নাই, কিছু নাই! তাহার উপর সিবাস্তিয়ন এক পয়সাও রাখিয়া যাইতে পারে নাই! ফেলিসিয়ার স্কন্ধে সংসার প্রচণ্ড ভারের মতই চাপিয়া বসিল। সিবাস্তিয়নের আর্টিষ্ট বন্ধুরা আসিয়া পরামর্শ দিল, বেচিয়া ফেলো। সব বেচিয়া দেনা শোধ কর! এই ঘর, এই আসবাব-পত্র পিতার স্মৃতিতে ভরপূর,—প্রাণ ধরিয়া সে-গুলাকে বিক্রয় করা ফেলিসিয়ার শক্তিতে কুলাইল না। চোখের জল মুছিয়া সে বলিল, "ও পরামর্শ দিয়োনা গো তোমরা। এ দেনা-শোধের উপায় যেমন করে হোক, আমি করবই। তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না। আমি এর কিছু বিক্রী করব না!" বন্ধুর দল ফেলিসিয়ার একগুঁয়েমি দেখিয়া বিরক্ত চিত্তে প্রস্থান করিল।

রাত্রে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া ফেলিসিয়া একটা উপায় স্থির করিল। সে তাহার ধর্ম্ম-মা ক্রেনমিজকে বিপদের কথা জানাইয়া এক দীর্ঘ পত্র লিখিল। ক্রেনমিজ উত্তর দিল, "ওদের কথা তুমি শুনো না, মা। তুমি

কিছু বিক্রী করো না! যতদিন আমি আছি, তোমার ভাবনা কি? আমার আয়, বছরে পনেরো হাজার ফ্রাঙ্ক—সে সব আমি তোমাকেই দিয়ে যাব। তুমি ছাড়া আমার আর কেউই নেই। আমার এ টাকা তোমারই। আমি এখানকার সব ঝঞ্ঝাট চুকিয়ে ওখানে যাচ্ছি। মায়ে-ঝীয়ে আমরা একসঙ্গে থাক্‌ব। বুড়ো বয়সে আমাকেও ত একজনের দেখা চাই। তুমি আমায় দেখবে। তুমি তোমার কাজ নিয়ে থেকো, আমি সংসার দেখব। সিবাস্তিয়ন গেছে, দুঃখের কথা,—কিন্তু আমি যখন এখনও বেঁচে আছি, তখন তুমি একেবারেই নিরাশ্রয় হওনি, জেনো।"

চিঠিখানার ছত্রে ছত্রে প্রচুর স্নেহ, প্রচুর সান্ত্বনা উছলিয়া পড়িতেছিল। ফেলিসিয়া চিঠি পড়িয়া সুস্থ হইল। তাহার চোখে জল আসিল। চিঠিখানাকে বুকে চাপিয়া উচ্ছ্বসিত আগ্রহে সে বলিল, "তুমি এসো মা—তুমি এসো। এ জন-হীন পৃথিবীতে আমি আর একলা থাকতে পারচি না। ভয়ে আমার গা শিউরে উঠছে—চারিধারে পাপ আর ভণ্ডামি দেখে মাথা আমি তুলতে পারচি না।"

এমন সময়ে ক্রেনমিজ আসিল। আপনার গৃহ ছাড়িয়া, বাস ছাড়িয়া ক্রেনমিজ ফেলিসিয়াকে আপনার স্নেহের নীড়ে আশ্রয় দিল; আসন্ন বিপদের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিল। ফেলিসিয়া সান্ত্বনা পাইল। তাহার শিল্প-পাঠ পূর্ব্বের ন্যায় চলিতে লাগিল। এই কলাচর্চ্চাই তাহার জীবনের একমাত্র সুখ, একমাত্র অবলম্বন। একদিন জেঙ্কিন্স আসিয়া ফেলিসিয়াকে সাহায্য-দানে অগ্রসর হইলে রুক্ষ স্বরে ফেলিসিয়া সে সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিল। ডাক্তার ধীর পদে প্রস্থান করিলেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে, ক্রেনমিজ মৃদু স্বরে ফেলিসিয়াকে কহিল, "বেচারা ডাক্তার! ও তোমার বাপের বন্ধু ছিল, ফেলি। ওকে অমন কড়া কথায় বিদেয় দেওয়াটা তোমার ভাল হয়নি—একজন পুরুষ অভিভাবক থাকা মঙ্গলের কথা! হাজার হোক, তোমার বাবার বন্ধু ত।"

"হাঁ, বন্ধুই বটে! ভণ্ড বদমায়েস—"

ফেলিসিয়া সহসা আপনাকে সংযত করিয়া ফেলিল। তাহার মনের মধ্যে রোষের যে আগুন জ্বলিতেছিল, সে তাহাকে পায়ে চাপিয়া জোর করিয়া নিবাইয়া দিল।

ইহার পর হইতে ডাক্তার এ গৃহে আসা একেবারে বন্ধ করিলেন না; মাঝে মাঝে বন্ধু-কন্যার খোঁজ লইতে আসিতেন। শিষ্টাচারের অনুরোধে ফেলিসিয়া তাঁহার প্রতি ক্রোধটাকে আর উচ্ছ্বসিত হইতে দিল না—সহজভাবেই সে কথাবার্ত্তা কহিবে, স্থির করিল। ডাক্তারের মনের উপর যে পাথরটা চাপিয়া বসিয়াছিল, এ ব্যাপারে সেখানাও অল্পে অল্পে সরিয়া গেল।

একদিন সকালে ডাক্তার আসিয়া দেখিলেন, ফেলিসিয়ার ষ্টুডিওর পার্শ্বের ঘরে ক্রেনমিজ বসিয়া আছে। ডাক্তার তাহাকে অভিবাদন করিয়া ফেলিসিয়ার কক্ষে প্রবেশ করিতে যাইবেন, এমন সময় ক্রেনমিজ বাধা দিয়া কহিল, "যেয়ো না ডাক্তার। ও ঘরে কেউ না যায়,—ফেলি মানা করে দিয়েছে। আমি তাই এখানে বসে চৌকি দিচ্ছি!"

"তার মানে?"

"মানে, ফেলি কাজ করছে। সে চায়, কেউ যেন এখন তাকে বিরক্ত না করে!"

ডাক্তার নিষেধ উপেক্ষা করিয়া এক পা অগ্রসর হইলেন। ক্রেনমিজ কহিল, "না, না, যেয়ো না। আমায় তাহলে ফেলি ভারী বকবে।"

"ও ত একলাই আছে ও ঘরে?"

"না। নবাব আছেন। নবাবের মুর্ত্তি গড়া হচ্ছে কি না।"

"আশ্চর্য্য! মুর্ত্তি গড়ছে ত আমার যেতে কি—"ডাক্তার গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তাঁহার বুকে যেন খোঁচা ফুটিল। ফেলিসিয়ার বয়স হইয়াছে, সে ত আর এখন কচিখুকীটি নয় যে ঐ বড়লোক নবাবের সঙ্গে

ঘরে একলা বসিয়া থাকিবে! সবলে তিনি দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন। ক্রেনমিজও শশব্যস্তে তাঁহার অনুসরণ করিল।

দ্বার খোলার শব্দে চকিত হইয়া ফেলিসিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, তীব্র স্বরে কহিল, "এর মানে কি, ডাক্তার? মা—"

ক্রেনমিজ কহিল, "আমি ঢের মানা করলুম মা—তা না শুনে ডাক্তার জোর করে ঘরে ঢুকলেন।"

ফেলিসিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, "ডাক্তার—"সে স্বরে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। শুনিয়া নবাবও শিহরিয়া উঠিলেন।

ডাক্তার কোন কথা বলিতে না পারিয়া ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা টানিবার চেষ্টা করিলেন। ফেলিসিয়া কহিল, "যান, চলে যান আপনি—এ ঘর থেকে এখনই চলে যান। কার হুকুমে আপনি—"

ডাক্তার কহিলেন, "কিন্তু শোনো ফেলিসিয়া, আমি কি বলি—"

ফেলিসিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, "না, না, কোন কথা আমি শুনতে চাইনে। চলে যান আপনি—না হলে এ বেয়াদবির শাস্তি পাবেন। একজন মহিলার ঘরে তার বিনা-অনুমতিতে—" সহসা থামিয়া গিয়া ফেলিসিয়া নবাবের দিকে চাহিল, কহিল, "আপনাকে তাহলে আর আটকে রাখব না, নবাব বাহাদুর। বাকীটুকু এখন আপনাকে না পেলেও আমি শেষ করতে পারব। আপনি তাহলে আজ আসুন—"

নবাব কোন কথা না বলিয়া সবিস্ময়ে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। ক্রেনমিজ সঙ্গে আসিয়া দ্বার পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিল।

নবাব চলিয়া গেলে ডাক্তার কথা কহিবার অবকাশ পাইলেন। তিনি বলিলেন, "ফেলিসিয়া, তুমি পাগল হয়েছ—এ কি তোমার ব্যবহার—!"

"কি ব্যবহার, ডাক্তার?"

"এই লোকটার সঙ্গে একলা তুমি ঘরের মধ্যে বসে আলাপ করছিলে?"

"চুপ কর, ডাক্তার, এ কথা জিজ্ঞাসা করবার তোমার কোন অধিকার নেই !"

"অধিকার আছে, ফেলিসিয়া—আমি তোমার বাপের বন্ধু। তুমি না মানো, তবু তোমার ভাল-মন্দর দায়ী আমি—"

ফেলিসিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল! সে হাসির প্রতি কণা তীরের মতই জেঙ্কিন্সের প্রাণে গিয়া বিঁধিল, বিঁধিয়া তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। ফেলিসিয়া কহিল, "তুমি দায়ী! চুপ কর ডাক্তার—আমি—আমি সে-সব পুরোনো কথা ভুলে গেছি। তা আর নতুন করে মনে পাড়িয়ে দিয়ো না। তুমি যাও, না হলে ভাল হবে না, বলুচি।"

"তবু এর কৈফিয়ৎ আমি চাই, ফেলিসিয়া। এই বুনো জানোয়ারটার সঙ্গে এত কি তোমার কাজের কথা ছিল—?"

"জানোয়ার! কাকে জানোয়ার বলছেন ?"

"এই নবাব—না, ও বাজে কথায় আমায় ভোলাবার চেষ্টা করো না। ফেলিসিয়া, তুমি কে, তা একবার ভেবে দেখো। তোমার জন্যে ডিউক মরে—যত-সব ব্যারণ, কাউন্ট, তারা তোমার কাছে পাত্তা পায় না—ঐ ছোঁড়া ডে গেরিটা অবধি তোমাকে দু চোখ দিয়ে গিলে ফেলতে চায়—অথচ ছোঁড়ার অত রূপ, অমন চেহারা—তাকেও তুমি আমোল দাও না! আর এই নবাব, তার উপর তোমার এত টান কেন,—এ আমি জানতে চাই।"

"কেন তা শুনবে ? বেশ তবে শোন, ডাক্তার—আমি বলচি, নবাবকে আমি ভালবাসি। তাকে আমি বিয়ে করবো।" ফেলিসিয়ার স্বর স্থির!

জেঙ্কিন্স চমকিয়া উঠিলেন। কে যেন পাথর ছুড়িয়া তাঁহাকে আঘাত করিল। মুহূর্ত্তে আপনাকে সম্বরণ করিয়া তিনি কহিলেন, "কিন্তু তুমি জানো, তার এক স্ত্রী আছে—আর সেই স্ত্রী এখনও অনেক দিন বাঁচবার আশা রাখে। শরীর তার চমৎকার রকম মজবুত। এই দুদিন

হল, পঙ্গপালের মত একদল ছেলে-মেয়ে নিয়ে সে নবাবের বাড়ী এসেছে। তারা সব নবাবেরই ছেলে-মেয়ে—”

ফেলিসিয়া যেন আকাশ হইতে পড়িল। সে কি বলিবে, স্থির করিতে পারিল না।

সম্মুখে তাহার হাতেগড়া নবাবের মূর্ত্তি চীৎকার করিয়া যেন কত-কি বলিতেছিল! বিদ্রূপের হাসি জেঙ্কিন্সের চোখের কোণে জড়ো হইতে-ছিল—ফেলিসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য জ্ঞান হারাইল। সবেগে সে নবাবের মূর্ত্তিটার দিকে অগ্রসর হইল এবং রূঢ় আক্রোশে সেটাকে ধরিয়া নাড়া দিয়া চূরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কাদার মূর্ত্তি নিমেষেই কাদা হইয়া মেঝেয় লুটাইয়া পড়িল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মাদাম জাঁস্থলে

বারো বৎসর পূর্ব্বে নবাবের বিবাহ হইয়াছিল। স্ত্রীর কথা নবাব পারির বন্ধু-মহলে একদিনেরও জন্য খুলিয়া বলেন নাই। না বলার কারণও ছিল। সমাজে-মজলিসে কুল-মহিলার প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করা প্রাচ্য-জাতির স্বভাব নয়। নারী ঘরের লক্ষ্মী, ঘরের অধীশ্বরী। বাহিরে তাহার কথা লইয়া হাস্য-কৌতুক করা শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ বলিয়াই তাহাদের ধারণা। বহুকাল প্রাচ্যজাতির সংসর্গে থাকিয়া প্রাচ্যজাতির এই বিশেষত্বটুকু নবাবেরও প্রকৃতি-গত হইয়া গিয়াছিল। সেই জন্যই মাদাম জাঁস্থলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পারির বন্ধুমণ্ডলী সম্পূর্ণ উদাসীন ও অজ্ঞ ছিল

তাই যখন সহসা একদিন তাহারা শুনিল, মাদাম জাঁস্লে আসিতেছেন, তখন বিস্ময়ে-কৌতূহলে সকলে পরস্পরের পানে চাহিয়া দেখিল। গৃহেও নূতন সম্ভাবনার সাড়া উঠিল। ঘর-দ্বার সংস্কৃত ও সুসজ্জিত করা, চাকর-দাসীর সংখ্যা বাড়ানো, নব নব আসবাব-পত্রের আবির্ভাবে গৃহলক্ষ্মীর অভিনন্দনের সূচনা দেখা গেল। একদিন সকলে শুনিল, মার্শেল হইতে স্পেশাল ট্রেণ আসিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত। গাড়ী ও লোকজন ষ্টেশনে ছুটিল; এবং তাহার অনতিকাল পরেই নবাবের গৃহ নব-কলরোলে মুখরিত হইয়া উঠিল।

সঙ্গে নিগ্রো দাসী, অঙ্গে অলঙ্কারের বিপুলতা লইয়া স্থূল-দেহা মাদাম জাঁস্লে নবাবের সজ্জিত প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। ট্রেণের এই সুদীর্ঘ যাত্রায় মাদামের অত্যন্ত ক্লান্তি হইয়াছিল। ক্লান্ত স্থূল দেহ-খানাকে টানিয়া সোপান অতিক্রম করিয়া ত্রিতলে ওঠা মাদামের সামর্থ্যে কুলাইল না। দুইজন নিগ্রো বান্দা চেয়ার ধরিল; মাদাম তাহাতে চড়িয়া বসিলে বান্দাদ্বয় সেই চেয়ারে করিয়া মাদামকে উপরে তুলিল। মাদামের স্থূল দেহ দেখিয়া তাঁহার বয়স নির্ণয় করা কঠিন—পঁচিশ হইতে চল্লিশ অবধি যে কোন বছরই খাটিতে পারে। মুখশ্রী ভালো, চোখ টানা—তা হইলেও তাহাতে ভাবের কোন ইঙ্গিত নাই। পোষাক ও অলঙ্কারের ঘটা এত বেশী যে প্রথম দর্শনেই দর্শকের তাক্ লাগিয়া যায়। এত ঐশ্বর্য্য বহিয়া বেড়ায়—একটা সিন্দুকের মত—যেমন প্রকাণ্ড তেমনই সসার!

মাদাম এক ধনী বেলজিয়ানের কন্যা। টিউনিসে মাদামের পিতার কোরালের প্রকাণ্ড কারবার ছিল। জাঁস্লে ভাগ্যান্বেষণে বাহির হইয়া এখানে কয়মাস চাকরি করিয়াছিলেন, মাদামোসেল আফ্‌সিন্—মাদামের কুমারী নাম—তখন দশ বৎসরের বালিকা মাত্র। বর্ণে অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য, মাথায় কেশের রাশি, সমস্ত অবয়বে স্বাস্থ্যের পরিপূর্ণ ছায়া লইয়া মাদামোসেল আফ্‌সিন্ প্রকাণ্ড ব্রুহামে চড়িয়া প্রতি সন্ধ্যায়

পিতার অফিসের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইত। তখন অফিসের ছুটীর সময়! ভাগ্যান্বেষী জাঁস্লে সারাদিন পরিশ্রমের পর অফিস হইতে বাহির হইবার সময় প্রত্যহই এই দশমবর্ষীয়া সুন্দরী বালিকাটিকে চোখের সম্মুখে দেখিতেন। বিলাস ও ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য, বালিকার কমনীয় গৌর কান্তি তরুণ জাঁস্লের মনের উপর ধীরে ধীরে আপনার প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। ক্রমে এমন হইল, যে অফিসে কাজের মধ্যে ব্যাপৃত থাকিবার সময় জাঁস্লে অধীরভাবে সন্ধ্যার এই মধুর ক্ষণটুকুর প্রতীক্ষা করিতেন! কখন্ সন্ধ্যা আসিবে, অফিসের ছুটী হইবে এবং অফিসের ফটকের সম্মুখে ক্রুহামে উপবিষ্টা এই বালিকাকে নয়ন ভরিয়া জাঁস্লে দেখিতে পাইবে।

এমনই ভাবে দিন কাটিতেছিল। দৃষ্টি প্রত্যহই এই রূপ-সুধা পান করিয়া কৃতার্থ হইয়া যায়; মনের শ্রান্তি কোথায় থাকে, কে জানে! জাঁস্লে শুধু সেইটুকু পাইয়াই আপনার জীবন সার্থক জ্ঞান করে। এদিকে বালিকার বয়স যে বাড়িয়া উঠিতেছিল, যৌবন সযত্নে তুলি বুলাইয়া এক অপরূপ মাধুরীতে বালিকার অঙ্গটিকে নিখুঁত করিয়া সাজাইয়া তুলিতেছিল, মুগ্ধ জাঁস্লের তাহা নজরে পড়ে নাই। কিন্তু একদিন পড়িল।

সেদিন সারা আকাশ অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটায় ভরিয়া গিয়াছিল। নব বসন্তের উতলা হাওয়া বহিতেছিল। অফিসের দেওয়াল-গাত্রে সংলগ্ন লতার ফাঁকে ফাঁকে গোলাপী ফুলের গুচ্ছে রঙীন্ ঢেউ ছুটিয়াছিল। কিশোরী আফ্‌সিনের প্রাণেও প্রকৃতি বুঝি সেদিন একটা দোলা দিয়া গিয়াছিল। আফ্‌সিন ঐ গোলাপী ফুলের একটা গুচ্ছ সংগ্রহের জন্য গাড়ীতে বসিয়া অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। জাঁস্লে আসিয়া তাহার পানে চাহিতেই আফ্‌সিন্ তাহাকে কাছে আসিতে ইঙ্গিত করিল। জাঁস্লের প্রাণ সহসা এক সোনালি নেশায় ভরিয়া উঠিল। তাহার

শিরার রক্ত তালে তালে নাচিয়া ছুটিল। পা কাঁপিতেছিল। সে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলে আফসিন্ কোন কথা কহিতে পারিল না—শুধু ফুলগুলার দিকে আঙুল দেখাইয়া ইঙ্গিত করিল। জাঁস্লে বুঝিল। সে ক্ষিপ্র হস্তে একটা গুচ্ছ ছিঁড়িয়া আনিয়া আফ্‌সিনের হাতে ধরিল। আফ্‌সিন্ ফুল লইয়া মৃদু হাসিল। সেই হাসি! অনঙ্গ এই মধুর ক্ষণটুকুরই প্রতীক্ষা করিতেছিল।—সে অমনি তাহার ধনুর ছিলায় টান দিল। জাঁস্লের মুখ লাল হইয়া উঠিল। কোনমতে চোখ তুলিয়া সে চাহিয়া দেখে, এ যেন কোন্ নন্দনের অপ্সরী সুধার পাত্রখানি হাতে করিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত! জাঁস্লে আপনাকে আর সম্বরণ করিতে পারিল না। চারিদিকে চাহিয়া অতি-সন্তর্পণে আফ্‌সিনের হাতখানি আপনার হাতে তুলিয়া লইয়া তাহাতে মৃদু চুম্বন-রেখা অঙ্কিত করিল। তাহার মনে হইল, স্বর্গ যেন আজ কোন্ সুদূর লোক হইতে নামিয়া আসিয়াছে! আফ্‌সিনেরও দেহ কাঁপিয়া উঠিল। তাহার বুকের মধ্যটা দুলিয়া উঠিল। সে মুখ নত করিল—জাঁস্লের দিকে আর চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না।

তার পর শুধু হাসি, শুধুই আনন্দ! এ আনন্দ চরম সার্থকতা লাভ করিল সেইদিন, যেদিন আফ্‌সিনের সহিত মহাসমারোহে জাঁস্লের জীবন-গ্রন্থি বাঁধা পড়িল। এই বিবাহ আশ্রয় করিয়াই জাঁস্লে ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপা-আহরণে সক্ষম হইল।

তাহার পর ঘটনা-চক্রের আবর্ত্তনে নবাব পারিতে আসিলেন। মাদাম কিন্তু টিউনিসেই রহিলেন। দুই জনের মন কোনদিনই জোড়া লাগিল না। পারিতে না থাকিলে নবাবের চলে না—অতুল ধনের অধিকারী হইয়া নির্ব্বাসিতের মত দিন কাটাইয়া কোন তৃপ্তি নাই! নবাবের যশ চাই, কীর্ত্তি চাই। দশজনকে দেখিয়া দেখাইয়া তবেই না ধনের গৌরব! নবাব পারিতে আসিলেন। মাদামের এ সব ভালো

লাগে না। ব্যস্ত পারিল উত্তাল কল্লোল ধরণীর এই নিভৃত কোণ-অধিবাসিনীর সহ্য হয় না! নিরালা টিউনিসের মাটিই তাহার বড় আরামের, কাজেই মাদামের আর আসা ঘটিল না। পুত্র-কন্যা লইয়া তিনি টিউনিসে রহিয়া গেলেন। নবাব একলা ভৃত্য-পরিজন লইয়া পারিতে আসিলেন।

পারিতে আসিয়া সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া নবাবের প্রাণে অতৃপ্তি জাগিয়া উঠিল। এখানে নিত্য মিলন-মজলিস। স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া আমোদ-উল্লাসের পূর্ণ পাত্র উপভোগ করিতেছে। স্ত্রী-পুরুষে এখানে অবাধ মিলন! আর তিনি নিতান্তই নিঃসঙ্গ, একা। স্বামীর সকল কাজে এখানে স্ত্রীর কোমল হাত দুটি কাঠিন্যের মধ্যেও কি অপরূপ লালিত্যের সৃষ্টি করিতেছে! স্বামীর সকল কাজে স্ত্রীর কি সাগ্রহ সহানুভূতি, সহজ সহায়তা—তাহা যেমন অনায়াস, তেমনই রমণীয়! কঠিনে-কোমলে চমৎকার সামঞ্জস্য! আর তিনি একা—একা—একা—তাঁহার আকাঙ্ক্ষা-উদ্যমে স্ত্রীর সহানুভূতি লাভ দূরের কথা, স্ত্রী তাহার অর্থও গ্রহণ করিতে চাহে না, তাহার সন্ধান রাখিবার জন্য স্ত্রীর চেষ্টা নাই, বুঝি, সে সামর্থ্যও নাই! স্ত্রী সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন! নিতান্তই তিনি দুর্ভাগা!

কিন্তু না,—চেষ্টা চাই। চেষ্টা করিয়া স্ত্রীর এই মনকে নোয়াইতেই হইবে তিনি স্থির করিলেন, মাদামকে পারিতে আনাইবেন।

ঘটনা-চক্রের পরিবর্ত্তন ঘটিল। টিউনিসের টাকশালের ভার জাঁসুলের হাত হইতে স্খলিত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী হেমারলিঙের হাতে পড়িল। ইহার জন্য কতখানি মান, কতখানি প্রতিপত্তি ছিল। নিমেষে ছায়াবাজীর মতই তাহা উবিয়া গেল। এ গৌরব হারাইয়া টিউনিসে আসর রাখিবার আর কোন প্রয়োজন নাই! মাদামকে এ সকল বুঝাইয়া নবাব তাহাকে পারিতে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অজস্র অনুরোধ-উপরোধের

তরঙ্গে মাদামের চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ভাবিলেন, দূর হোক আর পারা যায় না! নিত্য এই অনুরোধ, উপরোধ—তার চেয়ে পারিতে গেলে এ-সকল দায় এড়ানো যাইবে! মাদাম পারিতে আসিতে সম্মত হইলেন না।

তখন নবাবের আরও কতকগুলা কাজ বাড়িয়া গেল। মাদামকে আদব-কায়দা শিখাইবার জন্য একজন গভর্ণেস রাখা হইল। মাদাম মনে মনে চটিলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না। তাঁহার বিরক্তি ধরিয়া ছিল। কেন এ-সব অকারণ জঞ্জালের সৃষ্টি করা? গভর্ণেস-নিয়োগের পূর্ব্বে এই ব্যাপার লইয়া স্বামী বিস্তর তর্ক করিয়াছেন—কিন্তু মাদাম কিছুতেই বুঝিলেন না, তাঁহার চলা-ফেরা-বসা-দাঁড়ানোর ব্যাপারে অপরের হস্তক্ষেপের কেমন করিয়া প্রয়োজন থাকিতে পারে! সে আবার কি করিয়া হইতে পারে! নবাব নিরাশ হইয়াও হাল ছাড়িলেন না! কারণ যেমন করিয়া হোক, বাড়ীতে পার্টি প্রভৃতির আয়োজন করিলে মাদামকেই ত অতিথি-জনের অভ্যর্থনার ভার লইতে হইবে! কোথাও যাইতে হইলেও ত একটা আদব-কায়দার প্রয়োজন। মাদামের বিরক্তি হয়, হোক—গভর্ণেসের সাহায্যেও কতকগুলা চাল অভ্যাস হইয়া যাইতে পারে! ইহা ভাবিয়াই নবাব গভর্ণেস-নিয়োগে মাদামের কাছ হইতে বাধা পাইয়াও দমিলেন না। ছেলের জন্যও বেশ মোটা মাহিনায় শিক্ষক নিযুক্ত হইল—লেখাপড়ার জ্ঞান যত হোক না হোক, বড় লোকের ছেলের চালটাই যে স্বতন্ত্র এবং তাহা শেখার যে প্রয়োজনও যথেষ্ট আছে, নবাব তাহা বুঝিয়াছিলেন। শিক্ষক বাছিয়া দিবার ভার লইলেন, ডাক্তার জেঙ্কিন্স! পারিতে এমন সুহৃদ নবাবের আর কে আছে!

এইবার নিজের পালা। আজ অমুক সভায় মোটা চাঁদা দিয়া, কাল পিক্‌চার-গ্যালারির নামে চেক্ কাটিয়া, পরশু আর্ত্ত আর্টিষ্টকে সাহায্য দান করিয়া নবাব পারির হৃদয়-জয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। ডাক্তার

জেঙ্কিন্স পরামর্শ দিয়াছিলেন, কৌন্সিলে ঢুকিতে হইলে কিম্বা ডেপুটি হইতে হইলে এগুলা চাইই চাই। এইগুলাই হইল উপযুক্ত চার! নবাব এখন অহর্নিশি কাজের মধ্যে ডুবিয়া রহিলেন। নিশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই। যেটুকু অবসর মিলিত, তাহা গেরির সাহায্যে!

গেরি দুই-একবার বুঝাইয়াছিল, এ-সব বাজে কাজে এত টাকা দিবার প্রয়োজন কি! ইহাদের এমন কি সামর্থ্য আছে! যত লক্ষ্মীছাড়া অভাগার দল! নবাব হাসিয়া বলিতেন, "দাঁড়াও না, গেরি, এ-সব দু-একটা বাজে কাজ চাই বই কি! তারপর যেদিন জমকে বসা যাবে—" গেরি নবাবের এ স্বপ্ন ভাঙ্গিতে চাহিত না। নবাব বলিতেন, "পাগানেতি বলেছে, কর্সিকার ডেপুটী রোগে পঙ্গু হয়ে রয়েছে। শীগ্‌গির সে কাজ ছেড়ে দেবে—তখন আমার পালা। আমার জন্যে সব উঠে পড়ে লেগেছে। মেসেঞ্জার কাগজে কি বেরিয়েচে, দেখেচ-- ও কাগজখানার আজ-কাল ভারী পশার। বড় জোর কলম—তারপর ঐ বেথলিহাম আতুর আশ্রমের ব্যাপার! ঐ একটা কাজ ফ্যালাও করে তুলতে পারলেই,—ব্যস! কৌন্সিলে ঢোকবার মস্ত সুবিধা হবে! তুমি ছেলে মানুষ, এ-সব বোঝ না। তুমি শুধু দেখে যাও—আমি চাই, দেশের মধ্যে একজন হতে—বুঝেচ,—তার জন্য কিছু খরচ করা চাই বই কি। তারপর এটা হলে—কতখানি লাভ, একবার ভাবো দেখি!"

গেরি চুপ করিয়া থাকিত! সে ভাবিত, হায় রে পারির সমাজ, রক্তপিপাসু জল্লাদের মতই তোমরা খরধার খাঁড়া উঁচাইয়া দাঁড়াইয়া আছ! এই নিরীহ নবাবকে মারো, তাহাতে দুঃখ নাই—তবে তাহাকে বৃথা আশ্বাসে ভুলাইয়া মারিয়ো না। তাহাকে মারিতেই যদি চাও, মারো, কিন্তু বলিয়া মারো যে, নবাব, আমরা তোর রক্ত চাই! অর্থ চাই! অলস মরীচিকার মায়ায় ভুলাইয়া বন্ধু সাজিয়া তাহাকে হত্যা করিয়ো না! দোহাই তোমাদের!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আতুর-আশ্রম

বেথলিহাম ! নামটি গাল-ভরা হইলেও স্থানটি তেমন রমণীয় নহে। রেলওয়ে লাইনের উভয় পার্শ্বে সুবিস্তীর্ণ জলা,—মধ্যে মধ্যে বড় ডোবা শৈবালে আচ্ছন্ন ; তাহা হইতে পঙ্ক-দুষ্ট একটা গন্ধ রৌদ্র-তপ্ত হাওয়ায় ভাসিয়া ফিরিতেছে। ডোবার পশ্চাতে ঘন বৃক্ষশ্রেণী, বেশীর ভাগই বন্য—সেই বৃক্ষ-শ্রেণীর পিছনে কয়েকটা বড় বড় চিম্‌নি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এগুলা হাড়ের কল।

ষ্টেশনের নাম রুয়েঁ। ষ্টেশনটি ছোট। ষ্টেশন হইতে সরু পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া বরাবর গ্রামের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। এই পথ ধরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে প্রকাণ্ড এক অট্টালিকা চোখে পড়ে। পথের চারিদিকে অস্বাস্থ্যকর ডোবা ও জলা প্রভৃতি দেখিয়া চোখ এমনি ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে যে এই অট্টালিকার শিল্পচাতুর্য্যে সে আর বসিতেই চায় না ! না বসুক, তথাপি এ অট্টালিকাখানি নির্ম্মাণ করিতে যে অজস্র অর্থ ও মস্তিষ্ক-ঘৃত ব্যয় হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কাহারও মনে এতটুকু সংশয় ঠেকে না। এই অট্টালিকাখানিই বেথলিহাম আতুর-আশ্রম ; নবাবের ব্যয়-শীলতার চিহ্ন এবং তাঁহার উপর জেঙ্কিন্সের প্রভাবের অকাট্য পরিচয় ! ফটকের দুই ধারে সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মুক্ত প্রান্তর—সেখানে বড় বড় কয়েকটা ছাগী শষ্পাহারে নিযুক্ত। মানুষ দেখিলে তাহাদের পানে যে দৃষ্টিতে মূর্খ পশুগুলা মুখ তুলিয়া ফিরিয়া চায়, তাহা যেমন করুণ, তেমনই ম্লান !

সত্য কথা বলিতে কি, এই আতুর আশ্রমটি তাহার বিরাট নির্জ্জনতায়

আগন্তুকের প্রাণে যেন আতঙ্ক জাগাইয়া তোলে। দরিদ্র অভিভাবককে নানা স্তোক-বাক্যে ভুলাইয়া যে কয়টি ছেলেকে এখানে আনা হইয়াছিল, তাহারা এ বিরাট পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই রোগে পড়িল; কয়েকজন প্রাণ দিল, এবং যাহাদের অভিভাবকেরা পীড়ার সংবাদ পাইয়া ত্বরায় আসিয়া পড়িয়া আশ্রম হইতে ছেলেদের সরাইয়া লইল, তাহাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন—তাহারাই শুধু এ-যাত্রা বাঁচিয়া গেল!

মৃত্যুর করাল ছায়ায় আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হইল। সে আশ্রমে প্রসন্নতার চিহ্ন কি করিয়া দেখা যাইবে! জেঙ্কিন্সের মস্তিষ্কের তারিফ করিতে হয়! নবাবের অর্থও ইহাতে প্রচুর ব্যয় হইয়াছে, তথাপি গোড়াতেই এমন গলদ ঘটিলে মানুষ দমিয়া যায়। কিন্তু জেঙ্কিন্স সে প্রকৃতির লোকই নন্—কাজেই তিনি দমিলেন না! এত বড় অনুষ্ঠানকে খাড়া করিতে গেলে দুই-চারিটা এমন বিঘ্ন,—এ' ত ঘটিবেই—এ তুচ্ছ ত্যাগ স্বীকার করিতেই হইবে! বিশেষতঃ যে ছেলেগুলা মরিয়াছে, তাহারা যখন দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়াছে, তখন ললাটে মৃত্যুর টীকা আঁকিয়াই ত তাহারা আসিয়াছিল। গৃহে থাকিলেও ত সে অভাগারা না খাইয়া মরিত; তবে দুইদিন পূর্ব্বে না মরিয়া আশ্রমে পা দিয়া মরিয়াছে! এই যা কলঙ্ক।

পারি হাসপাতালের ছাত্র এম, পদিভেঁকে আনাইয়া তাহার উপর আতুর-আশ্রমের তত্ত্বাবধানের ভার রাখা হইল—পদিভেঁই প্রধান চিকিৎসক। মাদাম পুল ধাত্রীদের নেত্রী। এ দুই-জনকে বেশ মোটা মাহিনায় নিযুক্ত করা হইয়াছিল। আরও বিস্তর লোকজন ছিল, ভৃত্য, রজক, ধাত্রী, প্রভৃতি।

আশ্রমের জন্য একখানি ওমনিবাস গাড়ী ছিল, কোচম্যান-সহিসের তক্‌মা-আঁটা ঝক্‌ঝকে পোষাক-পরিচ্ছদ। প্রত্যহ ট্রেনের সময় রুয়েঁ ষ্টেশনে ঘণ্টা বাজাইয়া গাড়ী ছুটিত, আতুর শিশুদের আশ্রমে বহিয়া

আনিবার জন্য। আশ্রমের ছাগগুলা ছিল তিব্বতী—দুগ্ধবতী; গায়ে রেশমের ঝালরের মত লোমের রাশি, দেখিতে যেমন পুষ্ট তেমনি সুন্দর! অর্থাৎ আশ্রমে আয়োজনের কোন ত্রুটি ছিল না। শুধু এক জায়গায় একটু যা ভুল হইয়াছিল, তা এই রুগ্ন শিশুগুলাকে কৃত্রিম উপায়ে দুগ্ধ পান করাইবার ব্যবস্থায়। এ ব্যবস্থাটা কোনমতেই তাহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল হয় নাই।

মৃত্যুর হার দেখিয়া ম্যানেজার প্রথমটা দমিয়া গেল। পদিভেঁ লোক মন্দ ছিল না। সে যখন দেখিল, তিব্বতীয় ছাগের দুগ্ধ কচি ছেলেগুলার আদৌ সহিতেছে না, তখন আপনা হইতেই সে কয়েকজন সুস্থ ও সবল-দেহা সদ্যঃ-প্রসূতি গ্রাম্য নারী আনাইল। ইহাতে কয়েকটা অভাগা শিশু প্রাণ পাইল বটে, কিন্তু পদিভেঁর চাকরিটুকু খোয়া যাইবার জো হইল।

সপ্তাহান্তে জেঙ্কিন্স আসিয়া এই নারীদের দেখিয়া চটিয়া লাল হইয়া উঠিলেন। "বেথলিহামে এই সব ছোট লোক মেয়েদের দিয়ে দুধ খাওয়ানো হচ্ছে! তুমি পাগল হয়েছ, পদিভেঁ! এত টাকা খরচ করে তিব্বত থেকে ছাগল আনালুম, তাদের চরে বেড়াবার জন্য এমন-সব মাঠ করে দিলুম—এ সব কি মিথ্যা হবে? আমার বৈজ্ঞানিক চেষ্টাটাকেই যে শুধু তুমি নিষ্ফল করে দেবার উদ্যোগ করছ, তা নয়, আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা নবাব বাহাদুরের টাকাটারও এতে অপব্যয় হচ্ছে!"

পদিভেঁ মাথা নাচু করিয়া ঈষৎ কম্পিত স্বরে কহিল, "কিন্তু দেখুন, এ ছাগলের দুধ তাদের সহ্য হচ্ছে না—কতকগুলো মরে হেজে গেল যখন—"

"মরুক গে, যাদের মুখে না রুচবে, তারা উপোস করে থাকুক, তবু এখানকার নিয়মের নড়চড় হবে না। এখনি ও মাগীগুলোকে বিদেয় করে দাও। আর সাবধান, ভবিষ্যতে এমন হলে তোমার সঙ্গে একত্রে কাজ করবারও উপায় থাকবে না—"

পদিভেঁ নিরুত্তর রহিল। জেঙ্কিন্স আরও কহিলেন, "বিজ্ঞানের রাজ্যে এ একটা মস্ত পরখ চল্‌ছে—বুঝচ না—কত বড় বিষয়ে আমরা হাত দিয়েছি—আর কত টাকা আমার এ 'আইডিয়া'কে সাহায্য করছে! কতকগুলো ছেলে যদি মরে, মরুক। কোন্ বড় কাজে এমন ত্যাগ-স্বীকার নেই! এ মরণ মাথা পেতে আমাদের নিতেই হবে।"

পদিভেঁ আর কথা কহিল না। এই দুর্ম্মূল্যতার দিনে একটা চাকরি সংগ্রহ করা কি কঠিন—বিশেষ এমন চাকরি—সে তাহা জানিত। সে স্ত্রীলোকগুলাকে তখনই বিদায় দেওয়া হইল; এবং মহসমারোহে নিরীহ শিশুমেধযজ্ঞ চলিতে লাগিল। মৃতের সংখ্যা যেমন বাড়িয়া চলিল, ওমনিবাস গাড়ীও সেই পরিমাণে শূন্য ফিরিতে লাগিল! কে আর ছেলেকে সাধ করিয়া মারিতে পাঠাইবে! মরে যদি, না খাইয়া মা-বাপের কোলেই তাহারা পড়িয়া মরুক, প্রাসাদের উচ্চ কক্ষে সোনার পালঙ্কে শুইয়া মরিলে মা-বাপের শোকের মাত্রা ত এতটুকু কমিবে না! সুতরাং চিত্রগুপ্তের জিম্মায়,—গ্রামের লোক পদিভেঁকে খেতাব দিয়াছিল, চিত্র-গুপ্ত—ছেলে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই!

ছেলেদের শীর্ণ মুখগুলি দেখিলে চোখ ফাটিয়া জল বাহির হয়। তাহাদের মৌন দৃষ্টি গভীর অর্থপূর্ণ--যেন তাহারা মৃত্যুর পদধ্বনি স্পষ্ট কাণে শুনিয়াছে—প্রতিমুহূর্ত্তেই এখন তাহারা প্রতীক্ষা করিয়া আছে—ঐ বুঝি মৃত্যু আসিয়া ডাকিল, এস, এবার তোমার পালা!

সেদিন আহারাদির পর পদিভেঁ বসিয়া মাদাম পুলকে এই কথাটাই বুঝাইতেছিল, এমন সময় ওমনিবাসের চাকার ক্যাচ-ক্যাচ শব্দ শুনা গেল। শব্দটা অন্য দিনের মত নহে। পদিভেঁ কহিল, "গাড়ী আজ খালি আসছে বলে ত মনে হচ্চে না!"

সত্যই গাড়ী আজ ষ্টেশন হইতে একেবারে খালি ফিরে নাই। ভিতরে একজন লোক ছিল—সে জেঙ্কিন্সের কাছ হইতে সংবাদ লইয়া

আসিয়াছে। সংবাদ,—নবাব ও অপর একজন লোককে সঙ্গে লইয়া ডাক্তার জেঙ্কিন্স এখনই দুই ঘণ্টা পরে আশ্রম-পরিদর্শনে আসিবেন! ডাক্তার জেঙ্কিন্স বলিয়া পাঠাইয়াছেন, উঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য সকলেই যেন প্রস্তুত থাকে! এত শীঘ্র এ ব্যবস্থা হইয়াছে যে, পদিভেঁকে যথোচিত অবসর দিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই, তথাপি ডাক্তার জেঙ্কিন্স আশা রাখেন, পদিভেঁ যথাসাধ্য আয়োজন করিবেন।

যথাসাধ্য! পদিভেঁ বিরক্ত হইয়া ভাবিল, যথাসাধ্য! একটু চিন্তারও কারণ ছিল। আশ্রমের অবস্থা এখন খুবই শোচনীয়। জেঙ্কিন্সের নিয়মগুলাকে একেবারেই ব্যর্থ প্রমাণ করিয়া ছেলেরা অনেকেই মরিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে—যে কয়টা অবশিষ্ট আছে, সে কয়টাকে জীবিত বলিয়া লোকের সম্মুখে বাহির করিতেও লজ্জা হয়। তাহাদের অস্থি-চর্ম্মসার দেহের আবরণে প্রাণটুকু কোন রকমে ধুক ধুক করিতেছে!

পদিভেঁ কহিল, "মাদাম পুল, একটি উপায় ত, দেখি, আছে। এই ছেলেগুলোকে আশ্রম থেকে বার করে সেই ওধারকার আস্তাবলের পাশের ঘরে আজকের মত রাখা যাক! কতক্ষণের জন্যেই বা! এতে আর ওদের অবস্থা বিশেষ কি খারাপ হবার ভয় আছে? তারপর বেছে-গুছে এর মধ্যে থেকে দু-চারটে ছেলেকে ভালো পোষাক পরিয়ে মাঠের ধারে ক্রিকেট খেলতে পাঠিয়ে দি। ছুটোছুটি করতে মানা করে দেব। বলে দেব, নেহাৎ নিরীহর মত যেন খেলে! বলাই বা কেন! ছুটোছুটি করবার মত বলই বা ওদের কার আছে! তবু এতে একটু ভালো দেখাতে পারে।"

মাদাম পুলও একটু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিল,—সেটা চাকরির মায়ায়। সে কহিল, "তা ছাড়া আর কি সুব্যবস্থা করা যেতে পারে?"

তখনই ঘণ্টায় ঘা পড়িল। চারিদিকে ব্যস্ততার ধূম পড়িয়া গেল। হাঁক-ডাক-চীৎকারে নিদ্রিত নির্জ্জন পুরীর অসাড় ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে

বলিয়া মনে হইল। ওধারে ঝাঁটার ধূলা উড়িতেছে, পাইপে জল ছুটিয়াছে —ধোয়া-মোছা—বিরাট ধূম বাধিয়া গেল। সহসা-ব্যস্ত লোকজনকে দেখিলে মনে হয়, বেথলিহামে যেন আগুন লাগিয়াছে। সকলের মুখে-চোখে তেমনই চাঞ্চল্য, তেমনই উৎকণ্ঠার চিহ্ন!

দুই ঘণ্টার মধ্যে আয়োজন সম্পূর্ণ হইল। আগাগোড়া মাজা-ঘষা আশ্রম অতিথিদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। ভৃত্য-পরিজন যে যাহার জায়গায় দাঁড়াইয়া পড়িল। গরু-ছাগলগুলাকে ছবির মত সাজাইয়া মাঠে ছাড়িয়া দেওয়া হইল—ম্যানেজার পদিভেঁ শুভ্র খাতা খুলিয়া পরিচ্ছদে দেহ সজ্জিত করিয়া অফিস-কামরায় আসিয়া বসিল—কর্তৃপক্ষ এখনই পরিদর্শনে আসিবেন!

আবার গাড়ীর শব্দ শুনা গেল। ঐ তাঁহারা আসিয়াছেন। পদিভেঁ শশব্যস্তে আগাইয়া যাইয়া সকলকে অভ্যর্থনা করিল। নবাবের প্রকাণ্ড সজ্জিত গাড়ী হইতে ডাক্তার জেঙ্কিন্স, নবাব ও কৌন্সিলের এক সদস্য অবতরণ করিয়া আশ্রমে পদার্পণ করিলেন।

অভিবাদন, কর-কম্পন প্রভৃতিতে অভ্যর্থনার ঘটা পড়িয়া গেল। পদিভেঁর একটু ভয় ছিল। কি জানি, দুই ঘণ্টার মধ্যে আশ্রমের সজ্জা অতিথিদের চক্ষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে কি না! কিন্তু চারিদিকে শৃঙ্খলা দেখিয়া সবিস্ময় পুলকে তাঁহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া পরিদর্শন শেষ করিয়া নবাব ও সদস্যকে লইয়া জেঙ্কিন্স গাড়ী-বারাণ্ডার সম্মুখস্থ ছোট বাগানটিতে আসিয়া বসিলেন। চা আসিল, বিস্কুট আসিল—মদিরার পাত্র ফেনিলোচ্ছল গোলাপী তরল পদার্থে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সদস্যবর পূর্ণপাত্র মুখের কাছে ধরিয়া 'বেথলি-হামের স্বাস্থ্য'—বলিয়া সাগ্রহে তাহা শূন্য করিলেন। জেঙ্কিন্সের সুখ্যা-তিতে সদস্য পঞ্চমুখ হইলেন। নবাবের নাম ভুলিয়াও কেহ উচ্চারণ করিল না। তিনিও একটু অপ্রতিভভাবে ডাক্তারের সুখ্যাতি করিলেন।

ডাক্তার তাহাতে বাধা ত দিলেনই না, যাঁহার অর্থে এ 'আইডিয়া' প্রাণ পাইয়াছে, তাঁহাকে একটা ধন্যবাদ দেওয়াও ভদ্রতার খাতিরে উচিত বলিয়া মনে করিলেন না! তারপর বিদায়-সম্ভাষণান্তে ধীরে ধীরে সকলে প্রস্থান করিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। চারিধারের স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নবাবের প্রকাণ্ড গাড়ী গ্রামের রাস্তা ধরিয়া সহরের দিকে ছুটিয়া চলিল! মোড় বাঁকিবার সময়ে পিছনে একবার চাহিয়া দেখিলেন —প্রকাণ্ড আঁধার পুরীর ত্রিতলের এক কক্ষ হইতে শুধু মৃদু-কম্পিত আলোক-শিখা, অন্ধকার আকাশের গায়ে ক্ষুদ্র নক্ষত্র-বিন্দুর মতই ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে। ব্যস্ত পরিদর্শন-রত নবাব বা সদস্য কেহই বুঝিলেন না, এ আলো কিসের! জেঙ্কিন্স শুধু ঈষৎ শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি নিমেষে বুঝিলেন, আর এক অভাগা শিশু আপনার ক্ষুদ্র জীবনের অভিনয় অসমাপ্ত রাখিয়া চির বিদায় লইয়া চলিয়াছে—এ আলোটুকু তাহার সেই অজানা পথে মৃদু কিরণের সঞ্চার করিতেছে!

* * * *

১৬ই তারিখের জর্ণাল অফিসিয়াল কাগজখানার একটা পৃষ্ঠা হইতে নবাবের দৃষ্টি সেদিন আর কিছুতেই সরিতে চাহিতেছিল না। সে পৃষ্ঠায় এই কয়টি কথা লেখা ছিল,—

"১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ মার্চ্চ তারিখের ডিক্রি কর্ত্তৃক রাজ্য পরিচালক সমিতির উপর যে ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে, সেই ক্ষমতার বলে মন্ত্রীসভা সানন্দ চিত্তে, বেথলিহাম আতুর-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি সর্ব্বজনপ্রিয় বিচক্ষণ ডাক্তার জেঙ্কিন্স মহোদয়কে 'নাইট' উপাধিতে আজ ভূষিত করিলেন। ডাক্তার মহোদয়ের বিরাট বিশ্ব-প্রেমের কথঞ্চিৎ সমাদর করিতে পারিয়া সভা প্রকৃত পক্ষে আপনাকে আজ কৃতার্থ বোধ করেন।"

নবাব এ সংবাদ পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ইহাও সম্ভব! জেঙ্কিন্সের সমাদর—জেঙ্কিন্সের উপাধি-লাভ! তাঁহার নয়। অথচ এই আতুর-আশ্রম—এ কাহার টাকায়—!

তিনি দুই বার, তিন বার এ ছত্রগুলি পাঠ করিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল, পায়ের তলায় সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটা যেন সবেগে দুলিয়া উঠিয়াছে! অক্ষরগুলা তাঁহার চোখের সম্মুখে যেন অট্টহাস্য করিয়া নাচিতেছিল। তিনি যে ঐখানটিতে আজ নিজের নাম দেখিবেন, আশা করিয়া বসিয়াছিলেন! আতুর আশ্রম-পরিদর্শনান্তে জেঙ্কিন্সও সেদিন আসিয়া নবাবকে দৃঢ় স্বরে বলিয়া গিয়াছিল, "সব ঠিক—নবাব বাবাদুর। এবার আপনি 'নাইট' হচ্ছেন, সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে।" তার পর এ কি! কাগজখানা ভুল সংবাদ ছাপিল না ত! না—এ যে গভর্ণমেণ্টরই মুখপত্র। ভুল হইবার জো কি!

ন্তে গেরি কক্ষে প্রবেশ করিলে নবাব তাহার পানে চাহিয়া কহিলেন, "গেরি, আজকের কাগজ দেখেচ? ডাক্তার 'নাইট' হয়েছে,—আমি না!"

নবাব হাসিবার চেষ্টা করিলেন—হাসি বাহির হইল না। মুখ তাঁহার লাল হইয়া উঠিয়াছিল—চোখে জল আসিয়াছিল। কোন মতে অধীর মনটাকে তিনি দাবিয়া রাখিয়া সনিশ্বাসে কহিলেন, "আমার মনে একটু লেগেছে! এটা আমি আশাই করিনি।" তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ডাক্তার জেঙ্কিন্স ব্যস্ত-সমস্তভাবে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একখানা কাগজ, চোখে-মুখে দারুণ উত্তেজনা আগুনের মত ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কাগজখানা সজোরে তিনি টেবিলের উপর আছড়াইয়া ফেলিয়া বিরক্তির সহিত চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "অবিচার! অবিচার! দারুণ অবিচার! এ হতেই পারে না। না, এ আমি হতে দেব না কখনো।"

কথাগুলা যেন বিদ্যুতের মত ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। তাহার

পর ডাক্তার পকেট হইতে একখানা বড় খাম ও ছোট একটা বাক্স বাহির করিয়া নবাবের সম্মুখে ধরিয়া কহিলেন, "এই আমার ক্রশ—আর এই আমার সনদ! এতে আমার কোন অধিকার নেই—নবাব বাহাদুর। এ আপনার—আপনি নিন—আমি এ রাখতে পারি না—"

কথাগুলা আওয়াজে গম্ভীর হইলেও কাজে নেহাৎ ফাঁকা। নবাব যদি এই ক্রশ ধারণ করেন, তাহা হইলে বে-আইনী কাজ করার অপরাধে তাঁহাকে শাস্তি পাইতে হইবে। এ কথা ডাক্তারও বিলক্ষণ জানেন। কিন্তু অভিনয়,—হোক বন্ধুত্বের অভিনয়,—কখনও আইন-কানুন মানিয়া চলে না। ডাক্তারের অভিনয়টিও চমৎকার হইয়াছিল। তাঁহার বাক্-ভঙ্গীটুকুও আশ্চর্য্য নিপুণতার পরিচয় দিতেছিল। সরল-চিত্ত নবাব এ অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি শান্তভাবে বলিলেন, "না, না, অমন কথা বলবেন না, ডাক্তার। এ উপাধি আমার হল না, তাতে কেন দুঃখ করছেন! হয়ত আর-বছর গভর্ণমেণ্ট আমার কথা ভেবে দেখবেন—"

ডাক্তার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "হয় ত কি—নিশ্চয়—মনে করাব আমি! এ আমি শপথ করছি—"

ব্যাপারটা সেদিন এইখানেই শেষ হইল। চা পান করিয়া ডাক্তার গাত্রোত্থান করিলেন।

নবাবের চিত্তে আর-কোন চঞ্চলতা দেখা গেল না। ভোজনে বসিয়া নিত্যকার মতই তিনি হাস্য-পরিহাস করিলেন। সারাদিনের মধ্যেও তাহার এতটুকু পরিবর্ত্তন দেখা গেল না।

সন্ধ্যার সময় নবাব আপনার বসিবার ঘরে বসিয়া একখানা পুরানো খাতা খুলিলেন। এ পাতা ও পাতা উল্টাইয়া অজস্র অস্পষ্ট অক্ষর বাছিয়া একখানা সাদা কাগজে তিনি আঁক পাড়িতে লাগিলেন। হিসাবের যখন তিনি একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছেন, গেরি তখন কক্ষে

প্রবেশ করিল। সে নবাবকে অন্ধকারে কাগজ-পত্রের মধ্যে নিমগ্ন দেখিয়া অবাক হইয়া গেল; অতিশয় বিস্ময়ে সে নবাবের পানে চাহিয়া রহিল।

নবাব মুখ তুলিয়া কহিলেন, "আমি কি করছি জানো, পল ?"

"না।"

"হিসেব করছি—" তার পর হাসিয়া খাতা মুড়িয়া কাগজখানার দিকে চাহিয়া নবাব কহিলেন, "হিসেব করে কি দেখলুম, জানো ? ঐ হতভাগা জেঙ্কিন্সটাকে 'নাইট' করবার জন্যে আমি সবশুদ্ধ চার লাখ ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক খরচ করেচি !"

চার লাখ ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্ক! কিন্তু হায়, এইখানেই কি ইহার শেষ!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বন্ মামান্

সপ্তাহে তিন দিন করিয়া সন্ধ্যাবেলায় গোর জুজের গৃহে হিসাব শিখিবার জন্য আসিত। বাহিরের ছোট ঘরখানিতে বসিয়া জুজ্ কাগজের উপর জমা-খরচের আঁক পাড়িয়া তরুণ শিষ্যটিকে হিসাবের কাজে সুদক্ষ করিয়া তুলিবার চেষ্টা পাইত। গেরি যথেষ্ট অভিনিবেশের সহিত পাঠ শিখিতে বসিলেও মন তাহার মাঝে মাঝে পাশের ঘর হইতে ললিত কণ্ঠের যে হর্ষ-কাকলী উত্থিত হইত, তাহারই মধ্যে ছুটিয়া যাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিত। মেয়েদের কথা জুজ গেরির সম্মুখে একদিনের জন্যও তোলে নাই। পরী-কাহিনীর সেই শক্তিশালী দৈত্য যেমন দুর্গবাসিনী রাজকন্যাকে সতর্কভাবে লোকচক্ষু হইতে রক্ষা করিত, বৃদ্ধ

জুজও তেমনই পারির তরুণ সমাজের দৃষ্টি হইতে কন্যাগুলিকে সযত্নে লুকাইয়া রাখিতে চাহিত। কিন্তু সেই প্রথম দিন বিদ্যুৎ-চমকের মত ললিত কণ্ঠের যে কলোচ্ছ্বাস গেরির বুকের মধ্যে এক বিচিত্র তালে দোল্ দিয়া গিয়াছিল, তাহার কথা গেরি এক দিনের জন্যও ভুলিয়া যায় নাই। সপ্তাহের এই তিনটি সন্ধ্যায় প্রতি মুহূর্ত্তেই সে উদগ্রীব থাকিত, ঐ বুঝি পর্দ্দাখানা সরাইয়া দ্বারের পাশে সুন্দর একখানা সস্মিত মুখ পাতার আড়ালে ফুলের মতই ফুটিয়া ওঠে! কিন্তু আশা কোন দিনই পূর্ণ হইত না। এই মধুর সঙ্গ-লাভে নিরাশ হইয়া ক্ষুণ্ণ চিত্তেই সে গৃহে ফিরিত।

যাহা হৌক, এ-সকল সত্ত্বেও হিসাবের কাজ ক্রমশই তাহার অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল। জুজের শিখাইবার পদ্ধতি যেমন সুশৃঙ্খল, শিখাইতে যত্নও তাহার তেমনই।

একদিন—রাত্রি তখন নয়টা বাজিয়াছে—পাঠ শেষ হইলে গৃহে ফিরিবার জন্য গেরি উঠিবে, এমন সময় জুজ তাহাকে সে রাত্রির ভোজে নিমন্ত্রণ করিল। গেরি অবাক হইয়া গেল। সে জুজের মুখের পানে অপ্রতিভ দৃষ্টিতে চাহিতেই জুজ উত্তর দিল, "এই তারিখে আমার স্ত্রী মারা যান্! তাই তাঁরই সম্মানের জন্য 'বন্ মামান্' বলছিল, দু-এক একজনকে নিমন্ত্রণ করতে!"

"বন্ মামান্!"

"হাঁ। সে আমার বড় মেয়ে। ঐ নামেই ছেলেবেলা থেকে তাকে আমরা ডাকি। ছেলেবেলা থেকেই ও ভারী গোছানে—সংসারের সব দিকে নজর। মার কাছে আমার কিছুই এড়ায় না। লোককে যত্ন করা—আত্তি করা—এই ত আমার স্ত্রী আজ ক'বছর মারা গেছেন—তা সংসারটি ঐ-ই মাথায় করে রেখেছে!"

গেরিকে লইয়া জুজ ভোজের টেবিলে গিয়া বসিল। মেজ মেয়ে বলিল, বাবা তোমরা খেতে বসো। এঁকে ত আবার অনেক দূর যেতে হবে।

বেশী রাত হলে এঁর অসুবিধা হতে পারে।" গেরির মনে হল, সে বলে, না, না, কিসের অসুবিধা! কিন্তু লজ্জায় তাহার কথা ফুটিল না। কুণ্ঠিত চিত্তে সে ভাবিল, কি সে দুর্ভাগা! এতদিন ধরিয়া সে এই ক্ষণটুকুরই প্রতীক্ষা করিতেছিল—এই ক্ষণ, এই কিশোরীদের সহিত পরিচয়ের এই সুমধুর অবসর! আজ যদি সহসা সে শুভক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইল, ত, তাহাকে এত খাটো করিয়া দেওয়া কেন? কিন্তু কি করিয়া সে মুখ ফুটিয়া বলে, না, না, কোন অসুবিধা হইবে না! এই মধুর সঙ্গ—

জুজ কহিল, "তুমি তা হলে—"

গেরি কোনমতে সঙ্কোচ কাটাইয়া কহিল, "এত ব্যস্ত হচ্ছেন, কেন? এঁদের তাড়া দেবার কোন দরকার নেই।"

মেয়েরা কুতূহলী দৃষ্টিতে তরুণ অতিথির পানে চাহিয়া দেখিল। লজ্জায় গেরির মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। সহসা দ্বারের সম্মুখে এক আগন্তুককে দেখিয়া জুজ কহিল, "এই যে আঁদ্রে। এসো। তোমারই জন্যে শুধু দেরী! এলিস, এবার তোমরা খাবারের উদ্যোগ কর। তারপর— আঁদ্রে, এত দেরী হল কেন, বল?" আগন্তুক টেবিলের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া কহিল, "আমার নাটকখানা এইমাত্র শেষ করলুম। পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্যটা এই লিখে আসছি।" আনন্দের উত্তেজনায় আঁদ্রের মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সহসা গেরিকে দেখিয়া সে একটু কুণ্ঠিত হইল; জুজ সে ভাব লক্ষ্য করিয়া উভয়ের আলাপ করাইয়া দিল। "ইনি পল্ দ্য গেরি—আর ইনি হচ্ছেন আঁদ্রে মারান্।" তার পর আঁদ্রের দিকে চাহিয়া জুজ কহিল, "নাটকখানা তাহলে শেষ করেছ!"

"হাঁ, একদিন এইবার সকলের সুবিধা হলে এসে সেটা পড়িয়ে শোনাব।"

মেয়েরা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আমরাও শুনবো।"

সকলেই জানিত, আঁদ্রে নাটক লিখিতেছে। একই গৃহে বাস, আলাপ-পরিচয়ও বেশ আছে। আঁদ্রের এ নাটক লেখা শেষ হইলে যে মন্দ দাঁড়াইবে না, এ বিশ্বাস সকলেরই ছিল। ফটোগ্রাফির ব্যবসায়ে আঁদ্রের তেমন লাভ হইতেছিল না। খরিদদারের সংখ্যা অল্পই; পথের লোক ষ্টুডিওর পাশ দিয়া চলিয়া যাইবার সময় তাহার পানে মুহূর্ত্তের জন্যও চাহিয়া দেখে না। তথাপি কাজটায় অভ্যাস রাখিবার জন্য বন্ধু-বান্ধবের গৃহে ঘুরিয়া সকলের ছবি সে তুলিয়া বেড়াইতেছে। খরিদদার জোটে না বলিয়া মনে তাহার কোন দিন অসন্তোষের চিহ্ন ফোটে নাই। কেহ ব্যবসারের কথা তুলিলে আঁদ্রে হাসিয়া কহিত, "দিনকাল যে-রকম পড়েছে, লোকে খেতেই পায় না, তা সখ করে ছবি তোলাবে কি!" ইহার অধিক একটি কথাও তাহার মুখে শুনা যাইত না। তবে তাহার মনে এইটুকু আশ্বাস ছিল যে, কোনমতে এই 'বিদ্রোহ' খানা যদি লিখিয়া শেষ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহার আর কোন দুঃখ থাকিবে না। নূতন নাটকের নাম, 'বিদ্রোহ'।

তার পর সে রাত্রের মত সকলে টেবিলে বসিয়া পান-ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। গেরি এক নূতন আনন্দের স্বাদ পাইয়া আপনাকে ভাগ্যবান মনে করিল। নবাবের গৃহে বিলাস-ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য! তাহার প্রাণটা তাহাতে কেমন হাঁপাইয়া ওঠে! এই বিলাস-বর্জ্জিত সারল্যের মধ্যে প্রাণ তাহার এক অপূর্ব্ব শান্তি-সুধার স্বাদ পাইয়া বর্ত্তাইয়া গেল।

* * * *

গেরির প্রাণে পারির একটি নারী সুগভীর রেখাপাত করিয়াছিল। সে নারী ফেলিসিয়া। ফেলিসিয়াকে সে ভাল বাসিত। ফেলিসিয়াও এ ভালবাসা বুঝিত। সে গেরির নাম দিয়াছিল, "মিনার্ভা"। তাহাকে দেখিতে পাইলেই ফেলিসিয়া বলিত, "এই যে মিনার্ভা! এস মিনার্ভা,

তোমার সঙ্গে দুটো কথা কওয়া যাক্।" এই পরিচিত মিষ্ট সুর একটা স্নেহের আভাস দিত। গেরি বুঝিল, ফেলিসিয়া তাহাকে যেভাবে ভালবাসে, সে ছোট ভাইয়ের প্রতি বড় বোনের ভালবাসার মত। সে মনকে দৃঢ় করিল,—না, অন্য ভাবের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না—আর অগ্রসর হওয়া নয়!

ফেলিসিয়া! বেচারী ফেলিসিয়া! জীবনের উপর তাহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছিল। চারিদিকে ভাণ আর কাপট্য! চারিদিকে স্বার্থের ফাঁদ পাতা! মানুষের চিত্ত দুর্ব্বল! পদে পদে সেই ফাঁদে আপনাকে ধরা দিয়া মৃত্যুর ফাঁদে সে জড়াইয়া পড়িতেছে। প্রাণটা তাহার অশ্রুতে ভিজিয়া থাকিত। মরুভূমির মত সে চিত্ত সর্ব্বদা শুকাইয়া খাঁ খাঁ করিত—এই অশ্রুতে ভিজাইয়াই কোনমতে তাহাকে সে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল।

তাই আজ জুজের কন্যাদের সহিত মিশিতে পাইয়া গেরি এতখানি শান্তি অনুভব করিল। কি সুখে, কি পুলকে এই ক্ষুদ্র পরিবারটি উচ্ছ্বসিত রহিয়াছে।

এই ভোজের দিন হইতেই পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানটাও কাটিয়া গেল। গেরি আসিয়া মেয়েদের গৃহস্থালীর কথা লইয়া আলাপ সুরু করিয়া দিত, মেয়েরাও এই তরুণ শান্ত অতিথিটিকে ক্রমে একান্তই বিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা পল যেমন জুজের গৃহ ত্যাগ করিবে, সম্মুখেই সে দেখে, আঁদ্রে।

আঁদ্রে কহিল, "গেরি, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। আমার ঘরে একবার আসবে?"

গেরি আঁদ্রের সহিত তাহার ঘরে গেল। দ্বারটা ভেজাইয়া দিয়া আঁদ্রে কহিল, "শোন, আমাদের মধ্যে একটুও গোপনতা রাখবার দরকার নেই। পষ্টাপষ্টি সব কথা বলাই ভাল। তুমি লোক ভাল,

তোমার টাকাকড়িও আছে। আমি গরিব—লিখে, পাগলামি করে দিন-গুজরান করি। দুজনের মধ্যে তোমাকেই লোকে আগে পছন্দ করবে, এ তুমি জানো, আমিও জানি। কিন্তু তবুও আমি বলি, আমার গরিবের একটি মাত্র যে সুখ আছে, সে সুখ দস্যুর মত তুমি কেড়ে নিয়ো না! না, তা যদি কর ত আমি পাগল হয়ে যাব, পাগলের মত তোমার সঙ্গে তাহলে লড়াই করব। সে সুখ তোমার কেড়ে আমি নিতে দেব না। কদিন ধরে এই কথাটা যত আমি ভাবচি, ততই যেন মাথা আমার গুলিয়ে উঠছে। আমার পথে এমন করে তুমি পাঁচিল তুলে দাঁড়িয়ো না। ভালো হবে না।”

গেরি স্তম্ভিত হইয়া গেল। হতাশ-উদ্‌ভ্রান্তের মত আঁদ্রের এ কি চেহারা! সেই সহাস সস্মিত মুখে এ কি কালির রেখা! সে কহিল, “হেঁয়ালি ছেড়ে পষ্ট করে সব খুলে বল দেখি। কোন দ্বিধা তুমি করো না। আমাকে বন্ধু বলেই জেনো।”

“বন্ধু! তবে শোনো, তুমি জুজের বাড়ী হামেসা এখন আসা-যাওয়া করছ কেন? বল—না, বলতেই হবে।”

গেরি কহিল, “বলচি—জুজের মেয়েকে আমি ভালবাসি।”

“ভালবাস! কাকে? এলিস্ জুজ্‌কে? না, না, তা হবে না। তা আমি হতে দেব না। তুমি জানো, আমার জীবনের একমাত্র সুখ, একমাত্র সাধ, ঐ এলিস্‌কে পাওয়া! তাকে আমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসি তাকে ভালবেসেই আমি এ দুঃখ-দৈন্যের সঙ্গে সমানে যুদ্ধ করে চলেছি—”

মেজো বোন্‌টি! এলিস্! তাহাকে ভালো বসিবার কল্পনাও গেরির মনে মুহূর্ত্তের জন্যও উদয় হয় নাই। সম্মুখে যখন অপূর্ব্ব-সুন্দরী কিশোরী আলিন্ তাহার দীপ্ত লাবণ্য লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তখন তাহার দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া অপর কাহারও পানে চাহিয়া দেখিবার অবসর

গেরির ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। সে ত এলিস্‌কে ভালবাসে না, সে ভালবাসে আলিন্‌কে ; জুজের বড় মেয়েকে।

গেরি বলিল, "আমি এলিসকে ভালবাসি না। বন্ মামানকে বাসি।"

আঁদ্রে কহিল, "তুমি তবে এলিসের জন্যে আস না? বন্ মামানের জন্য আস্‌চ?"

"হ্যাঁ।"

"গেরি, বন্ধু, আমায় মাপ করো। আমি তোমায় ভুল বুঝেছিলুম। শোনো, এলিসের সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা সব ঠিক হয়ে গেছে। আমার এ নাটকখানা কোন থিয়েটারে নিলেই আমাদের বিয়ের কথা জুজের কাছে তুলবো। তখন তার আর কোন দ্বিধা থাকবে না। একজন উদীয়মান নাট্যকারের হাতে মেয়ে দিতে কোন বাধা থাকতে পারবে না।"

গেরি চলিয়া যাইবার জন্য উঠিতেই সম্মুখে প্রকাণ্ড একখানা ছবির পানে তাহার নজর পড়িল। এ মুখ কোথায় যেন সে দেখিয়াছে—হাঁ। এ যে বড় পরিচিত মুখ। সে স্থিরভাবে ছবির পানে চাহিয়া রহিল।

আঁদ্রে কহিল, "এঁকে তুমি চেনো?"

"চিনি বই কি! মাদাম জেঙ্কিন্স, না? ডাক্তারের স্ত্রী!"

"আমার মার ছবি—আমার মা।"

"মা!"

"হাঁ, আমার মা।" পরে আঁদ্রে ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি অবাক হচ্ছ, গেরি। ইনিই আমার মা, মাদাম মারান্—ডাক্তার জেঙ্কিন্সকে এখন বিয়ে করেছেন। তুমি আশ্চর্য্য হচ্ছ! তিনি ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আছেন, আর আমার এই দুর্দ্দশা! তার কারণ, ডাক্তারের সঙ্গে আমার মোটেই বনিবনা নেই। সে বলে, আমাকে ডাক্তারি শিখতে, কিন্তু আমি চাই লিখিয়ে হতে। সাহিত্য-চর্চ্চা করতে। নিত্যই তর্ক হত। শেষে সে তর্ক সহ্য করতে না পেরে আমি চলে এসেছি। জানি, মার মনে চোট্

লেগেছে—কিন্তু কি করব? নিরুপায় আমি। এমন দুর্দ্দিন আমার গেছে, গেরি, যে হাতে একটি পয়সা নেই—দু'দিন ঠায় উপোস করে কেটেছে! কি করব, টাকা ত আর আমার নয়, টাকা জেঙ্কিন্সের। কোন-মতে কায়-ক্লেশে এখন দিন কাটাচ্ছি—লেখা-পড়া কিছু শেখা গেছে, কাজেই মনের বিরুদ্ধে যা, তা ত করতে পারি না। তাই এই নাটক লিখতে স্থরু করেছি; যদি বরাত তেমন হয় ত এতেই অবস্থা ফিরতে পারে। হাতে যা-কিছু জমেছিল, তাই দিয়ে ক্যামেরা-ট্যামেরাগুলো কিনেছিলুম, কিন্তু সে ব্যবসা চল্‌ল না। কি করব? বরাত!"

আঁদ্রের কথা শুনিবার সময় গেরির মনে একটা দৃশ্য বড় উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছিল! সেই পুরাতন দৃশ্য—ফেলিসিয়া জেঙ্কিন্সকে তিরস্কার করিতেছে,—তোমার ছেলে মন্দ, না, মন্দ তোমরা—যারা এই সমাজটাকে নিজেদের খেলবার জায়গা মনে ভেবে যা-তা করে বেড়াও! আঁদ্রের প্রতি সমবেদনায় প্রাণ তাহার ভরিয়া উঠিল। আহা, বেচারা, বেচারা আঁদ্রে! কি কষ্টেই সে দিনপাত করিতেছে! তাহার সুখ এখন নির্ভর করিতেছে, ঐ নাটকখানির উপর! ঐ নাটকের অভিনয় হইলে তবেই সে সুখী হইবে। বন্‌ মামান্‌কে পাইবে! ইহাই তাহার সাধ, ইহাই তাহার আশা! ভগবান, বেচারার এ আশা পূর্ণ কর, এ সাধ মিটাইয়া দাও!

নবম পরিচ্ছেদ

রাজ-অতিথি

ফ্রান্সের দক্ষিণে সাঁতে রুমা ; এক সময়ে বিলাস-কানন ও প্রাসাদমালা-সজ্জিত এই নগরের সমৃদ্ধির কথা দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িলেও এখন তাহার সে চিহ্নও নাই। প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার সুবিধা করিয়া দিবার জন্যও সেই সমস্ত প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্ন একখানা ইষ্টকখণ্ডও আজ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। কালের বন্যায় সকলই ভাসিয়া গিয়াছে, শুধু নগরের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া দীর্ঘ সরীসৃপের ন্যায় পাহাড়ের শ্রেণী, শষ্পাচ্ছন্ন শ্যামল উপত্যকা ক্লান্ত পথিকের চক্ষু জুড়াইয়া দেয়।

বাগানে ফুল ফুটিলেই মধুকরের ভিড় জমিয়া থাকে। যে বাগানে ফুল ফোটে না, মধুকর ভুলিয়াও সে দিকে পদার্পণ করে না। কাজেই নগরের শোভা-সমৃদ্ধির সহিত যে সৌখীন নর-নারীর দল অন্তর্হিত হইবে, সে কথা বিশেষ করিয়া না বলিলেও চলে।

শৈশবে জাঁস্লে একবার মার সহিত এখানে বেড়াইতে আসিয়াছিল—তখন সে এই সবুজ প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ স্নিগ্ধ শ্যাম উপত্যকা ও পাহাড়ের কোলে প্রকৃতির অবাধ হাস্য-লহরের মতই মুক্ত নির্ঝর দেখিয়া আনন্দমুগ্ধ স্বরে বলিয়াছিল, "মা, আমি যখন বড়লোক হব, তখন সাজিয়ে গুছিয়ে এই নগরখানাই তোমাকে আমি দিয়ে দেব। আর ঐ পাহাড়ের কোলে তোমার জন্য মস্ত একখানা বাড়ী করব। সে বাড়ী মার্ব্বেল পাথরে তৈরি হবে, সে যা বাহার খুলবে, মা, তখন তুমি দেখে নিয়ো।"

তার পর আরব্য উপন্যাসের অলৌকিক গল্পের মতই জাঁস্লে যখন অগাধ ঐশ্বর্য্যের মালিক হইলেন, সকল কামনাই যখন তাঁহার প্রায় পূর্ণ হইয়া উঠিল, তখন জাঁস্লে সর্ব্বপ্রথম শৈশবের এই অভিনব কল্পনা সত্যে পরিণত করিলেন। পাহাড়ের কোণে আলাদিনের প্রাসাদের মতই

জাঁমুলের মর্ম্মর-প্রাসাদ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া যেদিন এক বিচিত্র রম্য কাননের সৃষ্টি হইল, সেদিন সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে সে সংবাদ পাইয়া সৌখীন নর-নারীর দল সাঁতে রুমায় আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। তার পর জাঁমুলের অর্থে জীর্ণ ষ্টেশনের সংস্কার ও পথ-ঘাট রচিত হইয়া উঠিল, এবং সহরের দুই-চারি জন ধন-কুবেরও তখন সেখানে বিলাস-কুঞ্জের প্রতিষ্ঠা করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। প্রাসাদ তৈয়ার করাইয়া জাঁমুলে মাকে আনিয়া সেখানে রাখিলেন। তাঁহার শৈশবের সাধ পূর্ণ হইল।

তার পর দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সাঁতে রুমা আজ জন-হীন নয়। জাঁমুলের নিজেরই লোকজন অংসখ্য—তাছাড়া মধুকরেরা ত তখন আসিয়া জুটিবেই!

জাঁমুলের মা এই প্রাসাদে একা বাস করিতেন; দাস-দাসী প্রভৃতি সংখ্যায় বিস্তর থাকিলেও নিজে তিনি প্রত্যেক বিষয়টির উপর নিখুঁত দৃষ্টি রাখিতেন। শার্সি-খড়খড়িতে, জিনিষ-পত্রে, যত্নের গুণে এতটুকু ধূলা নাই,—সমস্ত ঘষা-মাজা!—মেজের কার্পেট হইতে কড়িকাঠ অবধি ঝক্ ঝক্ করিতেছে;—যেন কে সদ্য সেগুলির সংস্কার করিয়া গিয়াছে। ভোর ছয়টা বাজিলেই উঠিয়া শয্যা ছাড়িয়া ঘর-দ্বার দেখা—দুপুরে বাগান-ক্ষেত প্রভৃতি পরিদর্শন এবং সন্ধ্যায় দীন-দরিদ্র প্রতিবেশীর গৃহে গৃহে ঘুরিয়া সকলের খবরাখবর লওয়া – ইহাই ছিল এই প্রাচীনা নারীর নৈমিত্তিক কার্য্য। কোনদিন এ নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটিত না। ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, দেশের ক্ষুদ্র তৃণকণাটুকু অবধি এই স্নেহশীলা নারীর স্নেহ-হস্তের মধুর স্পর্শ-লাভে বঞ্চিত হইত না। ছেলে আসিলে মা শুধু হাসিয়া বলিতেন, "এ কি সাদা হাতি আমায় পুষতে দিচ্ছিস, বাবা? এ বয়সে কি আমার এত বড় বাড়ী রাখা পোষায়! তোরা কেউ আয়, এখানে থাক্, এ-সব দেখ্ শোন।"

জাঁমুলে হাসিয়া বলিতেন, "আমার যে নানান্ কাজ মা—সহর ছেড়ে এখানে থাকবার জো নেই যে! নাহলে তোমায় ছেড়ে থাকি!" মা বলিতেন, "চ তবে, বাবা, আমাকেও সেখানে নিয়ে চ। তোদের না দেখে একলাটি আমি এখানে হাঁপিয়ে উঠি যে।"

জাঁমুলে জবাব দিতেন, "কিন্তু তোমার যে যাবার জো নেই, মা। দাদার শরীর সহরে একেবারে ভালো থাকবে না! এ খোলা ফাঁকা জায়গায় দাদা ভালো থাকে। দাদা ত একলাটি থাকতে পারবে না, এই শরীর নিয়ে। তুমি না হলে তাকে দেখবে কে!"

"সে কথা ঠিক"—বলিয়া মা অন্যমনস্কভাবে কি ভাবিতে বসিতেন!

এই দাদা জাঁমুলের বড় ভাই, বংশের বড় ছেলে, মা-বাপের আশার দীপ, তাঁহাদের গর্ব্ব, তাঁহাদের গৌরব। কি না ছিল সে! কত আশা বুকে লইয়া এই কিশোর যুবাকে তাঁহারা পারির বুকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন —প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায় তাহারই কুশল মাগিয়া পিতামাতা স্বস্তি বোধ করিতেন—প্রাণের সমস্ত আদর, সব ভালবাসা দিয়া এই আশার দীপটিকে সাজাইয়া তুলিতেছিলেন, মনে আশা ছিল, এই দীপ যখন পূর্ণ তেজে জ্বলিয়া উঠিবে, তখন—! কিন্তু হায়, দশ বৎসর পরে পারি যখন সেই দীপটিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মলিন জীর্ণ দশায় মায়ের হাতে ফিরাইয়া পাঠাইল, তখন তাহার সে দীন মূর্ত্তি দেখিয়া মার প্রাণ,—বাপ তখন নাই, মরিয়া বাঁচিয়াছে—শিহরিয়া উঠিল। এ কি সেই ছেলে,—সাজাইয়া গুছাইয়া প্রাণের অজস্র আশার ধারায় স্নান করাইয়া মানুষ করিবার জন্য যাহাকে তাঁহারা সহরে পাঠাইয়াছিলেন! হা রে অদৃষ্ট!

কিন্তু জাঁমুলে তখন টিউনিসে যথেষ্ট টাকা পাইতে বসিয়াছে, সুতরাং সেবা-শুশ্রূষার ঘটায় দীপকে আবার খাড়া করা গেল; কিন্তু দীপ একেবারে এমন অকেজো হইয়া গেল যে তাহাকে শুধু আদরের জিনিষ বলিয়া তুলিয়া রাখা চলে, তাহার দ্বারা কোন কাজ চলে না।

অগত্যা মার কোলেই মন-ভাঙ্গা প্রাণ-ভাঙ্গা ছেলে কোনমতে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল। কিছুদিন পরে জাঁস্তুলে পারিতে ফিরিল। মার বড় সাধ, দুটি ছেলেকেই কোলের কাছে রাখিয়া জীবনের বাকী কয়টা দিন আরামে কাটাইয়া দেন! কিন্তু দৈব বিরোধী,—তাঁহার সে সাধ পূরিবে কি করিয়া! প্রথম জীবনটা শুধু হা-অর্থ যো-অর্থ করিয়া কাটিয়া গিয়াছে—অর্থ-পিপাসা কোনদিনই তৃপ্ত হইতে পারে নাই—আজ যদি দৈববশে জাঁস্তুলের চেষ্টায় সে পিপাসা মিটিল ত স্নেহের ক্ষুধা সর্ব্বনাশীরূপে জাগিয়া উঠিয়াছে যে! সে ক্ষুধার নিবৃত্তি করে কে? জাঁস্তুলে? কিন্তু পারিতে তার অনেক কাজ। সে টাকা লইয়া খুসী নয়—সে মান চায়, যশ চায়, দশজনের একজন হইতে চায়—মানুষের মত মানুষ হইতে চায়! আহা, তাই হোক। অন্ধ স্নেহে ছেলের এ সাধে মা হইয়া বাধা দেওয়া ঠিক নয়!

একদিন জাঁস্তুলে হঠাৎ সাঁতে রুমায় আসিয়া উপস্থিত হইল—সঙ্গে অসংখ্য বন্ধু; কেহ কাউণ্ট, কেহ মার্কুইস, কেহ আর-কিছু; সকলেই মানী, সকলেই সম্ভ্রান্ত। দুইখানা ব্রেকে করিয়া মাল-পত্র আসিয়া ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্ম ভরিয়া তুলিল। জাঁস্তুলের মা এই বন্ধু-সমারোহ দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন।

ব্যাপার এই—টিউনিসের বে'কে সম্প্রতি নবাব নগদ দেড়কোটি মুদ্রা ধার দিয়াছিলেন। হেমারলিঙের উচিত শিক্ষা হইয়াছিল—তাহারাই পিতা-পুত্রে মিলিয়া নবাবের নামে বে'র কানে লাগাইয়া ভাঙ্গাইয়া ইদানীং তাঁহার বিরুদ্ধে বেকে এমনই উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল যে, নবাবের প্রতিপত্তি একেবারে ডুবিতে বসিয়াছিল। নবাব তাই বে'কে এই অজস্র টাকা ধার দিয়া কৃতার্থ হইলেন। কর্ণেল ব্রেহিমই এই ঋণদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বে কৃতজ্ঞ চিত্তে নবাবকে ধন্যবাদ ত দিলেনই, তার উপর স্বহস্তে নবাবকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে,

শীঘ্রই তিনি ফ্রান্সে বেড়াইতে আসিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন; সেই সময় সাঁতে রুমায় নবাবের প্রসিদ্ধ প্রাসাদে দুই-চারিদিন বাস করিয়া নবাবকে তিনি সম্মানিত করিবেন। এবার এ সংবাদে নবাব এমন আনন্দোৎফুল্ল হইলেন যে, যে-পিয়ন এ সংবাদ আনিয়াছিল, তাহাকে মুঠি ভরিয়া অর্থদান করিলেন। ওদিকে হেমারলিঙের দল এ সংবাদে একেবারে মুষড়াইয়া পড়িল। তাহাদের এত চক্রান্ত এমন করিয়া নিষ্ফল হইল!

ইহার পর নবাব সংবাদ পাইলেন, বে ফ্রান্সে আসিতেছেন। তিনি উদ্যোগ-আয়োজনের জন্য দ্রুত সাঁতে রুমায় আসিলেন। সম্ভ্রান্ত বন্ধুবর্গকে মার কাছে পরিচিত করিয়া দিয়া নবাব কহিলেন, "মা, বে ত চারদিন এখানে থাকবেন। তা বাড়ী-ঘরের অবস্থা কেমন?"

মা বলিলেন, "সে আর তোকে কিছু দেখতে হবে না রে—তোর বুড়ো মার দেহে যে ক'দিন হাড় ক'খানা আছে, নিজের চোখে সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারটুকু অবধি সে হাঁটকে দেখে বেড়ায়।"

নবাব কহিলেন, "বেশ! তার পর আমরা কি আয়োজন করছি, জানো মা? নাচ, গান, থিয়েটার, সার্কাস, ষাঁড়ের লড়াই, বাজী—এ-দেশী মেয়েদের নাচ, এই সব! এ ক'দিন আর দেশে আমোদ-আহ্লাদ জুড়োতে দেব না। তার জন্য ব্যবস্থাও চূড়ান্ত করেছি। পারি থেকে বাছা-বাছা সব অভিনেতা-অভিনেত্রী, বাছা-বাছা গাইয়ে নাচিয়ে কুস্তিবাজ সব আনাচ্ছি। তার পর ফুলের মালায় লতায়-পাতায় সারা গাঁ একেবারে মুড়ে দেব। এমন করব, যা কেউ কখনও চক্ষে দেখেনি, একটা কীর্ত্তি রাখব। এতে যত টাকা লাগে—"

বন্ধুগণ সকলেই সোৎসাহে নবাবের কথায় সায় দিয়া গেলেন। মা এই এত মার্কুইস কাউণ্টের পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়াই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন. এখন পুত্রের মুখে ভাবী উৎসবের আয়োজনের বিবরণ শুনিয়া আনন্দে তাঁহার দুই চোখে অশ্রু ফুটিয়া উঠিল।

রাত্রে ভোজনাদির পর স্থে গেরি আসিয়া জাঁস্থলের মার কাছে গল্প করিতে বসিল। গ্রামের কথা, অতীতের কথা, জাঁস্থলের ছেলেগুলির কথা: বিচিত্র কাহিনীগুলি মায়া-স্বপ্নের মতই উভয়ের চোখের সম্মুখে তরুণ সজীবতায় জাগিয়া উঠিতেছিল। এমন সময়ে বাহিরে ভারী জুতার শব্দ শুনা গেল। জাঁস্থলে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। গেরি চলিয়া যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। জাঁস্থলে কহিলেন, "না না, পল, তুমি বসো। তুমি ঘরের ছেলে, তোমায় উঠে যেতে হবে না।" পরে "মা—" বলিয়া মার কোল ঘেঁসিয়া কার্পেট-পাতা মেঝের উপর তিনি আপনার দীর্ঘ দেহ ছড়াইয়া বসিয়া পড়িলেন। মা বলিলেন, "ও কি! আহা, ভূঁয়ে কেন? উঠে এই চেয়ারটায় বোস্।" জাঁস্থলে কহিলেন, "না, মা, তোমার কোল তোমার পা, ও যে ও চেয়ারের চেয়েও আমার আরামের জায়গা।"

মা তথাপি সঙ্কোচের সহিত কহিলেন, "না, না, ছি! এখন কি তুই আর তেমনি আছিস্! কত মান—"

মায়ের কথায় বাধা দিয়া হাসিয়া জাঁস্থলে কহিলেন, "বাইরে যাই হোক্ মা, তোমার কাছে আমি তোমার সেই জাঁস্থলে। তোমার কাছে আমার জাঁক নেই, জমক নেই, মান নেই—সেই ছেলেবেলাকার ছোট্ট জাঁস্থলে আমি। তুমি যদি জানতে মা—বাইরের এই জাঁক-জমকে আমি এতটুকু সুখ পাই না, আমার সমস্ত আরাম, সমস্ত সুখ তোমার এই কোলে—" বলিয়া কুকুর যেমন প্রভুর পায়ে আপনার মুখ লুটাইয়া দেয়, তেমনিভাবে জাঁস্থলে মার দুই পায়ে আপনার মাথা রাখিয়া মুখ ঘষিয়া এক অপূর্ব্ব আরাম অনুভব করিলেন।

জাঁস্থলের দীর্ঘ কেশের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে মা বলিলেন, "হ্যাঁরে, ছেলেদের সঙ্গে করে আনলি না, কেন? তারাও দেখত-শুনত।"

জাঁস্লে কহিলেন, "তারা যে পড়ছে-শুনছে। পড়া কামাই দেওয়া কি ঠিক হত ? তার চেয়ে এই সামনেই তাদের ছুটি আসছে, লম্বা ছ' মাস ছুটী। সেই সময় তাদের এখানে পাঠিয়ে দেব'খন। সে ছ'মাস তোমার কাছে থেকে যাবে। তোমার কাছে গল্প শুনতে, তোমার কোলের কাছে মাথা রেখে ঘুমে ঢুলে পড়বে—ভারী আয়েসে থাকবে তারা।"

* * * * *

পরদিন ভোর হইতেই এক বিরাট সমারোহের আভাস পাওয়া গেল। ট্রেনে চড়িয়া সহর হইতে থিয়েটারের দল, বাইয়ের দল, খেলোয়াড়-কুস্তি-বাজের দল ভিড় করিয়া সাঁতে রুমায় আসিয়া জমিতে লাগিল। গ্রামের লোক এই সকল বিচিত্র বেশধারী অপরূপ নর-নারীর ঘটা দেখিয়া কাজ-কর্ম্ম ভুলিয়া গেল। এখানে মঞ্চ তৈয়ার হইতেছে, ওখানে কাঠের খুঁটি পুঁতিয়া তাহাতে লাল নীল নানা রঙের শালু জড়াইয়া অপূর্ব্ব বাহার করা হইতেছে, সেখানে মাটি কোপাইয়া জঙ্গল কাটিয়া ক্রীড়া-ভূমি রচিত হইতেছে, কোথাও নাচের মহলা চলিতেছে, আবার কোথাও বা কুস্তিগীর মুঠি করিয়া প্রকাণ্ড বৃষের শিং ধরিয়া তাল ঠুকিবার উদ্যোগ করিতেছে। চারিদিকে কলরব, চারিদিকে হাঁক-ডাক, চারিদিকে ব্যস্ত অধীর লোকজন চলা-ফেরা করিতেছে। এমন কাণ্ড, চোখে দেখা দূরের কথা, কস্মিন্ কালে কোন দেশে যে ঘটিতে পারে, গ্রামের লোক স্বপ্নেও তাহা কোনদিন কল্পনা করে নাই।

অবশেষে সম্ভাবিত দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত গ্রাম এক থানি প্রকাণ্ড উৎসব-ভবনের মতই সজ্জিত সুন্দর রূপে ভরিয়া উঠিল। যেন কোন সুন্দরী নায়িকা অপরূপ বেশে সাজিয়া নায়কের প্রতীক্ষা করিতেছে! পথের মোড়ে মোড়ে বিচিত্র তোরণ। তোরণের সম্মুখে অভিনব পট-মণ্ডপে নানা সুরে বাদ্য বাজিতেছে। পথের দুইধারে রঙীন্ থামে পাতার ঝালর, ফুলের ঝাড়, নিশানের ঘটা। সালু-মোড়া রাস্তা—

দেশের দারিদ্র্য যেন নবাবের ঐশ্বর্য্যে ঢাকা পড়িয়াছে ! এ যেন স্বর্গের এক কোণ ছিঁড়িয়া আনিয়া মলিন মর্ত্ত্যে নিপুণভাবে কে আঁটিয়া দিয়াছে ! সে কোণটুকু মর্ত্ত্যের গায়ে বেমালুম বসিয়াছে—কোথাও এতটুকু জোড়া-তালি দেখা যায় না।

অপরাহ্ন তিনটার সময় নবাবের মর্ম্মর প্রাসাদ হইতে আট ঘোড়ার প্রকাণ্ড গাড়ী ষ্টেশনাভিমুখে চলিল, পশ্চাতে অসংখ্য গাড়ীর শ্রেণী—সবগুলিই সুন্দর, ঘোড়াগুলা ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তিমান দম্ভের মতই ছুটিয়া চলিয়াছে ! চারিদিকে বাদ্য বাজিল, চারিদিকে জয়োল্লাস উঠিল, "জয় নবাবে'র জয় !"

গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনের ফটকে ঢুকিল। ষ্টেশনটি ছোট—তবু নবাবের অর্থ তাহাকে রমণীয় অপূর্ব্ব ছাঁদে আজ সাজাইয়া তুলিয়াছিল। প্ল্যাটফর্ম্মের কঠিন দেহ কার্পেটে মণ্ডিত ; দেওয়ালে ফুলের মালা চক্রাকারে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে—বিচিত্র বর্ণের পতাকায় চারিধার ভূষিত। নবাব প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। উত্তেজনায় তাঁহার সারা অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিতেছিল। মাথাটা দপ্ দপ্ করিতেছিল। ষ্টেশনের ঘরে ইলেক্‌ট্রিক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। উৎকৃষ্ট বেশে সজ্জিত ষ্টেশন-মাষ্টার আসিয়া বলিলেন, "সিগন্যাল দেওয়া হয়েছে। আর আট মিনিট পরে ট্রেন এসে পৌঁছুবে।" জোয়ারের প্রথম টানে নদীর জলে যেমন একটা স্ফীতির সঞ্চার হয়, উপস্থিত সম্ভ্রান্ত জন-সঙ্ঘে তেমনই একটা চাঞ্চল্য ফুটিল। সকলেই ঝুঁকিয়া লাইনের দক্ষিণে চাহিয়া দেখিল। দীর্ঘ রেলওয়ে লাইন গিয়া দূরে ঐ একটা পাহাড়ের গায়ে মিশিয়াছে, সেখানে বাঁক। দেখিলে মনে হয়, পাহাড়টা যেন রেলওয়ে লাইনকে হাঁ করিয়া গিলিয়া ফেলিয়াছে। দলের একজন বলিয়া উঠিল, "আর ছ মিনিট—" আবার সকলে সেই পাহাড়ের দিকে চাহিয়া দেখিল—ও কি ! পাহাড়ের গা ঘেঁষিয়া গাঢ় কালো কালির মত কি ওটা আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে !

কালিটা ক্রমে আকাশের সমস্ত তরল নীল রঙটুকুকেও ঢাকিয়া দিতেছে! ও যে মেঘ! দৈত্যের মত বেগে সে ছুটিয়া চলিয়াছে—এখনই যেন সারা বিশ্বে কি একটা প্রলয় হানিবে! নবাবের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। অধীর আগ্রহে বারবার তিনি ঐ পাহাড়ের কোলে লাইন গিয়া যেখানে মিশিয়াছে, সেই দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন—

এমন সময় দূরে একটা বংশীধ্বনি শুনা গেল। সকলে সাগ্রহে সেই দিকে ফিরিয়া চাহিল—ঐ যে দূরে কৃষ্ণ বিন্দুর মত ঐ যে,—কি ওটা? বিন্দু ক্রমে বড় হইয়া দীর্ঘ দেহ বিস্তার করিয়া জীবন্ত সরীসৃপের মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিল।

চুপ! ঐ যে ট্রেণ আসিতেছে। সকলে চকিতে তৈয়ার হইয়া লইল। প্লাটফর্ম্মে আগ্রহে-অধীর সিপাহী-শান্ত্রীর দল সঙীন খাড়া করিয়া পুতুলের মত দাঁড়াইয়া পড়িল। ও দিকে ষ্টেশনের কাছাকাছি ট্রেনের বেগও মৃদু হইল। ছোট্ট ষ্টেশনের ছোট্ট ষ্টেশন-মাষ্টার দামী পোষাক পরিয়া স্বহস্তে লাল-সবুজ নিশান লইয়া প্লাটফর্ম্মের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। গর্ব্বে জাঁস্লের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল। তিনি সেলাম করিবার ভঙ্গীতে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন। ঐ যে আসিয়া পড়িয়াছে! ট্রেণের গতি ক্রমে মৃদু, আরো মৃদু হইল। এঞ্জিন প্লাটফর্ম্মে ঢুকিল। নবাব হাত উঠাইয়া সজোরে হাঁকিলেন, "থামাও—" ট্রেণ থামিল না। ক্রমে বে'র কামরা দেখা গেল। ঐ যে বে বসিয়া! নবাব সেই কামরার দ্বারের হাতল ধরিয়া ঘুরাইয়া বলিলেন, —"এই ত সাতে রুমা বে-বাহাদুর।" হঠাৎ নবাব দেখিলেন, বের সম্মুখে বসিয়া, কে ও? তাঁহারই চিরশত্রু হেমারলিং! মুহূর্ত্তে নবাবের মাথা ঘুরিয়া গেল। বের কণ্ঠস্বর কাণে গেল—বে বলিল—"নামা হবে না। জাঁস্লে। যে লোক আমার দেশ লুঠ করে এসেছে, তার বাড়ীতে আমি পা দেব? কখনো না।" হেমারলিং কামরার মধ্যে একটা বোতাম টিপিল; আওয়াজ হইল, ট্রিরিং। ওদিকে এঞ্জিনও মোটা গাঢ় ধূম

বাহির করিয়া ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্ শব্দ করিয়া আপনার গতির বেগ বাড়াইয়া দিল। নবাব বজ্রাহতের মত গাড়ীর পা-দান হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। এত লোকের সম্মুখে আপনাকে খাড়া রাখিতে মাথা যেন কাটা গেল। এত বড় অপমান! তাঁহার মুখ মরার মত শাদা হইয়া উঠিল। তিনি রুমালে মুখ ঢাকিয়া প্লাটফর্ম্মের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ট্রেণ সশব্দে চলিয়া গেল।

বাহিরে দেশের লোক অধীর আগ্রহে দাঁড়াইয়াছিল। ব্যাপার তাহারা বুঝিল না—চাৎকার করিয়া সকলে হাঁকিল, "জয় বের জয়!" সে ধ্বনি নবাবের সমস্ত বুকটায় মুগুরের ঘায়ের মত আঘাত করিল। নবাব গাড়ীতে উঠিলেন।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ঝম্ ঝম্ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। পথে ওদিকে অত ঘটার অত সাধের সাজসজ্জা রঙবেরঙের নিশান, চীনা লণ্ঠন ফুলের মালা বৃষ্টির জলে ভিজিয়া ছিঁড়িয়া একশা' হইয়া গেল।

সেই বৃষ্টির মধ্যে বাড়ী ফিরিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া নবাব আদেশ দিলেন, "এখনই এ সমস্ত সাজসজ্জা ছিঁড়ে ভেঙ্গে নষ্ট করে ফেলো—এখনই— এখনই!"

সকলে অবাক হইয়া নবাবের মুখের পানে চাহিল। নবাব তাহা লক্ষ্য না করিয়া আপনার কক্ষে চলিয়া গেলেন।

•

রাত্রি গভীর। দিনের বিরাট উত্তেজনা ও নৈরাশ্যের অবসরে সাতে রুমার প্রাসাদে সমস্ত জনপ্রাণী অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে। বাহিরে অবিশ্রাম ধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। শুধু আলোকোজ্জ্বল শয়ন-কক্ষে নবাব বসিয়া আছেন—মাথায় দুশ্চিন্তার রাশি। এই যে ত্রিশ হাজার লোকের সম্মুখে আজ দারুণ অপমানটা ঘটিয়া গেল—শত্রু হেমারলিঙের ষড়যন্ত্রে বে কথা দিয়াও তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিল না—ভাবনা ত ইহা লইয়া

নয়। এ-সবের পিছনে এক অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়াই তিনি আকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি টিউনিসে—বাড়ী, কারবার, জাহাজ সমস্তই এখন বে'র করুণার উপর নির্ভর করিতেছে—আইন-কানুনহীন কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত এক দর্পিত বর্ব্বরের কবলে! নবাব তাই ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিতেছিলেন, কোনদিকেই কূল পাইতেছিলেন না।

সহসা দ্বারে কে করাঘাত করিল। নবাব কহিলেন, "কে?"

ভৃত্য নিল্ কহিল, "আমি। একটা টেলিগ্রাম এসেছে।"

"ভিতরে এসো।"

ভৃত্য কক্ষে প্রবেশ করিয়া নবাবের হাতে একখানা নীল খাম দিল। নবাব কম্পিত হস্তে মোড়ক ছিঁড়িয়া টেলিগ্রাম বাহির করিলেন, আলোর সম্মুখে ধরিলেন, এ কি! মোরা! মোরা টেলিগ্রাম করিয়াছে! ডিউক মোরা! কি—কি—কি খবর?

নবাব স্পষ্ট পড়িলেন, "পোপোলাস্কা মারা গিয়াছে। কর্সিকায় শীঘ্র সদস্য-নির্ব্বাচন। অফিস হইতে আপনার নাম গিয়াছে।"

সদস্য! কর্সিকার ডেপুটি! তাহার মানে—মুক্তি—মুক্তি—মুক্তি! ভয় হইতে মুক্তি, নৈরাশ্য হইতে মুক্তি, সমস্ত ষড়যন্ত্র হইতে মুক্তি। ডেপুটি হইলে আর ভয় নাই,—বিষয় রক্ষা পাইবে—সব রক্ষা পাইবে! বে'র সাধ্য নাই, তখন নবাবের সম্পত্তি গ্রাস করে—উড়াইয়া দেয়! লক্ষ হেমারলিং বিপক্ষে দাঁড়াইলেও কর্সিকার ডেপুটির সম্পত্তিতে হাত দিবার শক্তি কাহারও থাকিবে না। "ডিউক—ডিউক—" বলিয়া আনন্দের আতিশয্যে নবাব টেলিগ্রামখানা বুকে চাপিয়া ধরিলেন, পরে কহিলেন, "এ টেলিগ্রাম কে নিয়ে এল? কোথায় সে পিয়ন?"

ভৃত্য কহিল, "ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে—একটা সই দিতে হবে।"

নবাব কহিলেন, "তাকে এখানে ডেকে আনো—"

পিয়ন আসিলে নবাব কহিলেন, "তুমি এই টেলিগ্রাম এনেছ ?"

পিয়ন অভিবাদন করিয়া কহিল, "হাঁ, হুজুর।"

রসিদ সহি করিয়া পিয়নের হাতে তাহা দিলে সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল ; নবাব কহিলেন, "দাঁড়াও।" পিয়ন দাঁড়াইল। তারপর নবাব আপনার বড় জামার পকেটে হাত ঢুকাইয়া মুঠি ভরিয়া স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিলেন,—হাতে যত ধরে! পরে পিয়নের হাতে তাহা ঢালিয়া দিয়া নবাব কহিলেন, "তোমার বখশিস্—বখশিস্—যাও, নিয়ে যাও—"

পিয়ন নবাবের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে অবাক হইয়া গিয়াছিল! রূপকথার নায়কের মতই সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে এই অর্থের রাশি পাইয়া আনন্দের আবেগে সে কেমন মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িতেছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

সদস্য-নির্ব্বাচন

"পজোনিগ্রো। কর্সিকা

"মস্যুঁ জুজ,

আজ ক'দিন পরে আপনাকে এই চিঠিখানি লেখবার অবসর পেয়েছি। আজ পাঁচ দিন হল, আমরা কর্সিকায় এসেছি, কিন্তু এসে অবধি এত কাগজ-পত্র দেখা, মিটিং করা, দলিল-দস্তাবেজে সই, পথ-ঘাট দেখা, মজলিস করার হাঙ্গামে মেতে আছি যে এক ছত্র চিঠি অবধি আপনাকে লেখবার সময় পাইনি। আপনার সঙ্গে প্রায় দু'হপ্তা দেখা

হয়নি,—যাই হোক, আর বেশীদিন অদর্শনে থাকচি না ; শীঘ্রই ফিরবো। পরশু কসিকা ছেড়ে একেবারে সটান্ পারিতেই যাব—পথে আর কোথাও নামতে হবে না।

তারপর এই নির্ব্বাচনের ব্যাপার !—সেদিকটায়, বলতে গেলে, আমাদের কাজ বেশ গুছিয়ে তুলেচি। তবে ঐ যে এখানকার কাজ-কারবারের বিজ্ঞাপনে ওখানকার ক'খানা কাগজ লোককে একেবারে দম্ দিয়ে বেড়াচ্ছে—কথার ছটায় দেশের লোকের তাক্ লাগাচ্ছে যে এখানকার কারবারে কিছু টাকা ঢাললেই একেবারে রাতারাতি সব লাখোপতি হবে, সে সব একেবারে ঝুটো কথা ! কাজ-কারবারের যে লোভ দেখাচ্ছে, সে একেবারে ভুয়ো ! খালি ফাঁকা আওয়াজ। কাজ-কারবার ? বলতে গেলে এখানে তার পাট মোটেই নেই। তা বলে খনি কি নেই ? আছে। কিন্তু তার ভিতর আর-কিছু নেই,—শুধু জঙ্গল—সাপ-খোপ তাতে বিস্তর মেলে। জমি যা, তাতে চাষ চলে না—চাষের যুগ্যি করতে হলে সে জমির উপর আগে লাখো-লাখো টাকা ঢালতে হয় তবে জমি তোয়ের হতে পারে—তার পর চাষ-আবাদ ! বন আছে—কিন্তু সেখান থেকে কাঠ আনতে হলে এরোপ্লেনে চড়ে গাছ কাটতে হবে, না হলে সে অজগর বনে ঢোকবারই কারো সাধ্য নেই। ঝর্ণা কতকগুলো আছে বটে—কিন্তু সে জল মুখে দিলে সদ্য বিকার হয় ! নদীতে ষ্টীমার একখানি নেই ! আর রেল ? রেলের কথা তুললে এ-দেশের লোক হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তারা ভাবে, বুঝি কোনরকম ঠাট্টা করছি ! "রেল" মানে এদেশের লোকে কি বোঝে, জানেন ?—"টিক্‌টিকি পুলিশ !" এই হল দেশ, আর এই হল এ দেশে কারবারের হাল !

আসল কথা, দেশে খানকতক পুরোনো তক্তা আর পাঁচ-ছ' খানা ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর আছে ! আপনি ভাবছেন, তবে কিসের জন্য নবাব ঐ সব বাজে কাগজ দেখে এত টাকা কোথায়ই বা ঢালছেন ! এই পাঁচ মাস

ধরে লোকে শেয়ারও কিনছে—কেন লোকে কিনছে, জানেন? শুধু নবাবের নাম দেখে! এ কোম্পানির ডিরেক্টার নবাব নিজে—তাই তাঁর নামে লোকে আজ বিশ্বাস করে টাকা ঢালছে। বেচারা জানে না, এ টাকা তারা জলে কি কোথায় ঢালছে! যাই হোক, নবাবের নাম নিয়ে শয়তানেরা এই যে টাকা-রোজগারের জন্য এক জুচ্চুরির কল পেতেছে—খালি বাজে ধাপ্পায় সকলকে ঠকিয়ে বেড়াচ্ছে, এ আর আমি ঘটতে দিচ্ছি না। ওখানে ফিরেই সব কথা নবাবকে আমি সাফ্ খুলে বলবো, এদের ভুয়ো চাল ধরিয়ে দেব। নবাবকে এই সব ফন্দীবাজ চোরের হাত থেকে রক্ষা করব। আজ বেশী কথা থাক্। শীগ্রই ত ফির্‌ছি। আপনার মেয়েদের কাছে আমার কথা বলবেন, তাঁরা যেন আমার এ দীর্ঘ অনুপস্থিতিটুকু ক্ষমার চক্ষে দেখেন! আপনার টেবিলের এককোণে যে ঠাঁইটুকু পেয়েছি, ফিরে গিয়ে শীগ্রই তাতে আবার দাবী বসাবো—এ কথাটুকুও তাঁদের মনে রাখতে বলবেন। আজ তবে আসি। ইতি

পল গেরি।"

নবাবের প্রাসাদে এ-দিকে অতিথি-সমাগমের বিপুল ধূম বাধিয়া গিয়াছিল। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অতিথির আর বিরাম নাই। নানা আকারের, নানা বেশের লোক সাগ্রহ চিত্তে নবাবের প্রাসাদে প্রবেশ করিতেছে, আর পূর্ণ পকেটে হৃষ্ট মনে ফিরিয়া যাইতেছে। নৈরাশ্যে-কাতর একখানি মুখেরও দেখা মিলে না। সকলেই যেন এক কল্পতরুর সন্ধান পাইয়া সাগ্রহে ছুটিয়া আসিতেছে—আবার আগ্রহ মিটাইয়া বাসনা পূর্ণ করিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে! নবাবের প্রাসাদ যেন সরাই হইয়া উঠিয়াছে—এক বিরাট কামনা-সত্র! যে যে-কামনা লইয়া আসিতেছে, তাহার সেই কামনাই নবাবের প্রসন্ন দৃষ্টি-কিরণে করুণার মিষ্ট ধারায় পূরিয়া উঠিতেছে!

এই নির্ব্বাচনের উপলক্ষে সকলেই আপনার আপনার তহবিলটিকে ভালো করিয়া ভরিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছে!

ওদিকে বাজারের একপ্রান্ত হইতে আর একটা দুঃসংবাদ জাগিয়া উঠিয়াছে—নবাবের জয়ের আশা নাকি ততটা নাই! ইহা সেই হেমারলিঙের চাল—নিশ্চয় ইহার মূলে হেমারলিঙের ষড়যন্ত্র! হেমারলিঙের বিরুদ্ধে নবাব তাই এই নিষ্ঠুর কঠোর অর্থ-যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে—স্কুল, লাইব্রেরী, ক্লাব, চিত্রশালা সর্ব্বত্র বিরাট চাঁদা দিয়া, লোকের পকেটে টাকা ঢালিয়া—টাকায় তিনি সেই আশঙ্কামূলক জনরবটাকে ঢাকিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। যে নবাবের চিত্ত সংক্ষুব্ধ সাগরের মত গম্ভীর থাকিত, শত সহস্র বিদ্বেষ ও হিংসার বাণে এতটুকু বিচলিত হইত না, সেই নবাব মুহুর্মুহু উত্তেজিত, বিচলিত, সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতেছেন। গেরি তাহা লক্ষ্য করিল। তাহার প্রাণে প্রচণ্ড আঘাত লাগিল। আহা, নবাব, বেচারা নবাব! রাক্ষসের মত এই প্যারির লোকেরা নির্দ্দয়ভাবে নবাবের অর্থ শোষণ করিতেছে! উপায় নাই—উপায় নাই! এ মারণের হাত হইতে নবাবকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য গেরির এতটুকুও নাই! দাঁড়াইয়া তাহাকে এ মারণ-যজ্ঞ দেখিতে হইবে! সে কি শুধু নবাবের নিমকই খাইয়াছে? না—নবাবের স্নেহে, নবাবের করুণায় আজ যে সে ভদ্রলোকের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছে! তাহার প্রাণ ত শুকাইয়াই গিয়াছিল,—নবাবই তাহাতে সহানুভূতির স্নিগ্ধ শীতল ধারা ঢালিয়া তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন! নবাব যে তাহার সব—বন্ধু, পিতা, তাহার বিধাতা! সেই নবাবের এই নির্য্যাতন কেমন করিয়া স্থিরভাবে সে দাঁড়াইয়া দেখিবে! অথচ নবাবকে বুঝানো দুষ্কর—বুঝাইলেও তিনি বুঝিবেন না! কতবার সে বলিবার চেষ্টা করিয়াছে—কথা ফাঁদিতে গেলেই নবাব ব্যস্তভাবে বলিয়া ওঠেন, "আচ্ছা, গেরি, পরে তোমার সব কথা শুনবো। এখন আমার একটুও দাঁড়াবার সময় নেই!" বলিয়াই তিনি এই রাক্ষসদের দলে অধীর

আবেগে ছুটিয়া গিয়াছেন। গেরির মনে পড়িল, সেই প্রাচীন রূপকথার গল্প। কোন্ অজগরের নিশ্বাসের নাকি এমনি জোর ছিল যে সে শ্বাস গ্রহণ করিলেই চারিধার হইতে নর-নারী অধীর আগ্রহে তাহার গ্রাসে ছুটিত। সে নিশ্বাসের যাদু নবাবকেও মজাইয়াছে! নবাব না জানিয়া ধ্বংসের পথে, আপনার মৃত্যু-গহ্বরে অন্ধভাবে ছুটিয়া চলিয়াছেন! নিরুপায় গেরি কাজেই শেষে আর-এক পথ অবলম্বন করিল।

একদিন রাত্রে শয়ন করিতে যাইবার সময় নবাব বালিশের উপর এক-খানি পত্র পাইলেন। তাঁহারই নামে লেখা পত্র—তাহাতে গেরির নাম সহি রহিয়াছে। নবাবের কৌতূহল হইল—তখনই তিনি পত্রখানি পাঠ করিলেন। পত্রের প্রতি ছত্রে গেরির তরুণ হৃদয়ের নির্ম্মল সারল্য, তাহার সাধুতার অনাবিল উচ্ছ্বাস স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মতই লুটাইয়া পড়িয়াছে। গেরি কোন কথা ঢাকিয়া রাখে নাই, সব—সব কথা খুলিয়া লিখিয়াছে। নবাবের বিরুদ্ধে সারা নগরের এই বিপুল ষড়যন্ত্র, নবাবের ঐশ্বর্য্যের বিরুদ্ধে এই নিষ্ঠুর অভিযান, তাঁহার পুণ্য-নামের বিরুদ্ধে অপবাদ ও লাঞ্ছনার শর-ক্ষেপ—সব কথা গেরি খুলিয়া লিখিয়াছে—প্রমাণ অবধি বাকি রাখে নাই। রাক্ষসগুলার নাম পর্য্যন্ত সে ধরিয়া দিয়াছে। কোথা দিয়া কেমন করিয়া কোন্ পাষণ্ড আপনার কোন্ অভীষ্ট সাধনের সুযোগ খুঁজিতেছে, তাহাও গেরি নবাবের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতে ছাড়ে নাই। কর্সিকার কারবার এক প্রকাণ্ড ধাপ্পা—খনি সার-হীন, দেশ জঙ্গলময়, লোকজন বর্ব্বর! নবাবকে কি করিয়া সকলে ফাঁদে ফেলিতেছে— সমস্ত বিষয়েরই গেরি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়াছে। চিঠির শেষে গেরি লিখিয়াছে, "প্রমাণের সমস্ত কাগজ-পত্র আমার ঘরে টেবিলের বাঁ দিককার ড্রয়ারে পাইবেন। সেগুলি এই চিঠির সঙ্গেই রাখিতে পারি-তাম—কিন্তু রাখিলাম না, কারণ আপনার বাড়ীর একটি লোককেও

আমি আর বিশ্বাস করি না। আমার মনে হয়, আপনার বিরুদ্ধে সকলেই ষড়যন্ত্র করিতেছে!

কাল ভোরেই আমি চলিয়া যাইব, স্থির করিয়াছি। দুয়ারের চাবি আপনাকে দিয়া যাইব—তখন খুলিয়া সে সকল কাগজ-পত্র দেখিবেন।

কেন চলিয়া যাইতেছি, সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আমার এখানে কোন অভাব ছিল না, কোন অনুযোগ নাই। তবু যে যাইতেছি, জানিবেন, সে বড় মনের দুঃখে। আপনি আমার কে, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নয়। তবু আমায় যাইতে হইতেছে। তার কারণ, আপনার কোন উপকারে লাগিতেছি না—আপনার খাইয়া, আপনার পরিয়া, দাঁড়াইয়া আপনারই সর্ব্বনাশ দেখিব, সে শক্তি আমার নাই। আপনাকে যে এই সব রাক্ষসের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিতেছি না, এই দুঃখই কাঁটার মত আমার সর্ব্বাঙ্গে বিঁধিতেছে। কিছু করিতে পারিতেছি না—এজন্য আমার সমস্ত প্রাণ জ্বলিয়া খাক্ হইয়া যাইতেছে। হে আমার গুরু, হে আমার বিধাতা, হে আমার সব, আপনাকে এ প্রাণের কৃতজ্ঞতা না জানাইয়াই তাই চলিয়া যাইতেছি, আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

কিন্তু চারিদিকে ভীষণ চক্রান্ত, এই ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতা দেখিয়া আমার ভয় হইতেছে—নিজের উপরও ক্রমে বিশ্বাস হারাইতেছি। ভয় হয়, কোন্ দিন আমিও বা এই সব নিমকহারাম শয়তানের দলে মিশিয়া যাই! সেই ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনের আশঙ্কায় আজ আমি বিদায় লইলাম। এ-সঙ্গে আর বেশী দিন থাকিলে, আমিও যে আপনার শত্রু হইয়া দাঁড়াইব না, তাহাই বা কে বলিতে পারে!”

* * * *

পত্রখানি নবাব ধীরে ধীরে পড়িয়া শেষ করিলেন। তাঁহার দুই

চোখের পাতা জলে ভিজিয়া গেল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গেরির কক্ষাভিমুখে চলিলেন।

গেরি তখন কতকগুলা কাগজ-পত্র তাড়া করিয়া গুছাইয়া বাঁধিতেছিল—হঠাৎ নবাবকে দেখিয়া তাহার হাত কাঁপিয়া উঠিল! নবাব ডাকিলেন, "পল—"

গেরি সসম্ভ্রমে নবাবের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল—তাহার দৃষ্টি নত।

নবাব ঘরের দ্বার ভেজাইয়া দিলেন. পরে কহিলেন, "তুমি চলে যাচ্ছ, পল?"

গেরি কোন উত্তর দিল না; তাহার বুকের মধ্যে কি একটা বেদনা ঠেলিয়া উঠিতেছিল। নবাব আবার কহিলেন, "কিন্তু একটা কথা, সত্য করে বল, পল. এই যে পারির এক কোণে আমার নামে আজ একটা কুৎসা জেগে উঠেছে, সেজন্য আমার উপর ঘৃণা করে তুমি চলে যাচ্ছ, না, আর কোন কারণে যাচ্ছ? বল,—এ কথাটুকু শোনবার বোধ হয় আমার অধিকার আছে, পল—কেন না, তুমি নিজেই বলেছ, আমায় তুমি নিজের বাপের মতই ভাল বাস।"

পল বলিল, তাহার চিঠিতেই সে চলিয়া যাইবার কারণ কি তাহা খুলিয়া বলিয়াছে ত—তা ছাড়া যাইবার আর অন্য কারণ নাই।

নবাব কহিলেন, "তবে শোন পল, তোমায় এক নতুন কথা বলি। তোমার চিঠি আমি পড়েছি—এ চিঠি তোমারই যোগ্য হয়েছে। তুমি ঠিক বলেছ, পল, এই পারি সহরটাকে আমি যে রকম ভাবতুম, সে রকম সে মোটেই নয়! এ যেন রাক্ষসীর মত দিবারাত্র হাঁ করে আছে! চারিধারে ষড়যন্ত্র—চারিধারে ফন্দীবাজী চলেছে। আমি এখানে এমন একজন বন্ধু খুঁজছিলুম, যে আমায় এই সব দারুণ ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করে—এই সব ফন্দীবাজ লুঠের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখে! ভগবান তাই তোমায় জুটিয়ে দিয়েছেন। পল, সহরের যত হতভাগা

তাদের জুতোর কাদা আমার ঘরের কার্পেটে এসে মুছে গেছে, সে কাদা আমার সাফ করতেই হবে। রাজ্যের জঞ্জালে আমার ঘর ভরে আছে—সে জঞ্জাল শক্ত হাতে সরাতে হবে। কিন্তু এ জঞ্জাল সাফ করা আমার একার কাজ নয়। তাতে তোমারও সাহায্য চাই। কিছুদিন সবুর কর—একবার এই ডেপুটিটা হয়ে নি,—কসিকার ডেপুটি—আর সেই ডেপুটিগিরি পেতে হলে এই সব চোরগুলোকে হাতে রাখা চাই—শুধু সেই কটা দিন তুমি ধৈর্য্য ধরে থাকো, পল, তার পর সব বোঝা-পড়া হবে!

"তা-ছাড়া ডেপুটি না হলেও আমার চল্‌বে না। তার কারণ আছে, শোনো। তুমি জানো, বে-কে সেদিন অগাধ টাকা ধার দিয়েছি। সে টাকা শোধ করবার তার মতলব ত নেইই; সে টাকা চাওয়ায় উল্টে সে আশি লক্ষ টাকার দাবা করেছে—বলে, এ টাকা তার ভাইকে ঠকিয়ে ভুলিয়ে আমি আত্মসাৎ করেছি—বুঝলে? কিন্তু ভগবান জানেন, কাকেও আমি ঠকাইনি। সে আমার ন্যায্য পাওনা কড়ি, হকের; গতর খাটিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করা! আমি কমিশন এজেণ্ট ছিলুম—বে-র ভাই আহম্মদ আমায় ভালবাসত, আমায় এ টাকা রোজগার করবার সুযোগ দিয়েছিল মাত্র, এই যা; এ বে-ও লোক মন্দ ছিল না, কিন্তু ঐ হেলারলিঙের দল আমার নামে লাগিয়ে ভাঙ্গিয়ে তার মন বিষিয়ে দিয়েছে। তাদেরই পরামর্শে আমার টাকা সে আজ উড়িয়ে দিতে চায়—উড়িয়ে উল্টো দাবী করে! তার উপর টিউনিসে আমার যথাসর্ব্বস্ব—আমার কারবার, আমার জাহাজ, আমার বাড়ী, জমি, টাকাকড়ি সমস্ত সে ফাঁকি দিয়ে নিতে চায়। নেওয়া সাজে—নিলেই হল। কে তার বিচার করবে? আমার হকের টাকা, বিচারে কে আমায় তা পাইয়ে দেবে! যে বিচার করবে, সে বে'র মাইনে খায়—সে বে'র মুখের দিকেই চেয়ে আছে,—কাজেই বিচারের

কোন আশা নেই। কিন্তু যদি এই ডেপুটি-গিরিটা বরাতে মিলে যায়—তাহলে আমার কোন ভয় নেই—কোন ভাবনা নেই। কর্সিকার ডেপুটি, ফ্রান্সের শাসন-সভার সদস্য জাঁস্লের জিনিষে হাত দিতে তখন বে'র সামর্থ্যও থাকবে না। বুঝলে,—না হলে সর্ব্বনাশ—আমায় পথের ভিখিরী হয়ে পথে দাঁড়াতে হবে! তার মানে কি, জানো? আমি একদণ্ড বাঁচবো না, আমায় মরতে হবে।

"এখন ত সব কথা শুনলে পল—এখন বল—এ শুনেও তুমি আমায় ছেড়ে যেতে চাও? দুনিয়ায় আমার কেউ নেই—বন্ধু, সহায়, আমার কেউ নেই। আমার স্ত্রী? সে মানুষ নয়। সে মানুষ হলে ভাবনা কি ছিল! ছেলেরা—? না। মা—কিন্তু সেই মা আমার দূরে আছেন, তা-ছাড়া নানান্ দুঃখে-শোকে তিনি জর্জ্জরিত হয়ে পড়েছেন, বুড়ো হয়েছেন—এই মা আছেন, আর তুমি আছ, পল! তুমি আর মা—ছাড়া আমার পানে চায়, দুটো সৎ পরামর্শ দেয়, এমন কাকেও দেখচি না। এ দুঃসময়ে তুমি আমায় ছেড়ে যেয়ো না! ক্লাবে, থিয়েটারে যেখানেই আমি যাই, সেখানেই দেখি, শুধু চক্রান্তের ঢেউ চলেছে—হিংসার ছুরি ঝক্‌মক্ করছে—হেমারলিঙের দল সাপের মত ফণা তুলে গর্জ্জে বেড়াচ্ছে! আমার চারিধারে বিপদ। আমার এ বিপদে ফেলে তুমি চলে যেয়ো না।"

নবাবের স্বর গাঢ় হইয়া আসিল। কাশিয়া নবাব আবার কহিলেন, "এই দেখ—ফেলিসিয়া। সে আমার মূর্ত্তি গড়ছিল, একজিবিশনে দেবার জন্য—যেই তার সময় এগিয়ে এল, অমনি সে বললে, কোন বিশেষ কারণে মূর্ত্তি শেষ হয়ে উঠল না, কাজেই একজিবিশনে তা আর দেওয়া গেল না। আমি কোন কথা বলিনি—ভাবে দেখালুম, তার কথা আমি বিশ্বাস করেছি। কিন্তু এ কি বিশ্বাস করবার মত কথা! আমি জানি, এর কারণ আর কিছু নয়—এ'ও এই পারির সহুরে চাল, পারির ফন্দী। চারিধারেই আমি দেখচি, নিরাশা! আজ যদি সালোঁয়

আমার মূর্ত্তি ঠাঁই পেত—সে মূর্ত্তি আবার ফেলিসিয়ার হাতে গড়া, তাহলে আমার কম লাভ হত! কিন্তু তা হবে কেন—? আমার বরাত! যেটাকে আমি সহায় বলে অবলম্বন করছি, সেইটেই ঘুণ-ধরা খুঁটির মত ভেঙ্গে ঝরে পড়ছে! পল, তুমিই এখন আমার একমাত্র ভরসা। আমায় এ বিপদে ফেলে তুমি এখন চলে যেয়ো না।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

দুর্দ্দিনে

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। ঘড়িতে পাচটা বাজিয়াছে। সকাল হইতেই থাকিয়া থাকিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। এখনও আকাশ পরিষ্কার হয় নাই। ভারা কয়টুকুরা কালো মেঘ প্রকাণ্ড কালো পাখীর মতই ডানা মেলিয়া বেড়াইতেছে। পথে বেশ কাদা হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে জলও দাঁড়াইয়াছে। অত্যন্ত শোচনায় মলিন দৃশ্য! চারিধারেই একটা অপরিচ্ছন্ন নিরানন্দ ভাব যেন জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

এই নিরানন্দ দৃশ্য একটি প্রাণীর হৃদয়ে কিন্তু অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার করিয়া তুলিয়াছিল। বন্ধ ঘরে সাশির পাশে সোফাটাকে টানিয়া আনিয়া তাহাতেই আপন দেহ-ভার লুটাইয়া দিয়া সে এই পথের কদর্য্যতা লক্ষ্য করিতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া দুই-চারি পশলা বৃষ্টি নামিতেছে—পথে ত্রস্ত পথিক সহসা অমনি আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কেহ ছুটিয়া অদূরে কোন গাড়ী-বারান্দার তলে আশ্রয় লইতেছে, কেহ বা ভিজিতে ভিজিতেই অপ্রসন্ন মুখে দেহটাকে যথাসাধ্য সঙ্কুচিত করিয়া দ্রুত চলিতেছে। ঘরের ভিতরকার এই প্রাণীটি এ দৃশ্যে ঈষৎ কৌতুক অনুভব করিতেছিল। সহসা এক পশলা বৃষ্টি নামিলে সে নিকটোপবিষ্টা সঙ্গিনীকে

কহিল, "দেখ পরী, আজকে এই বাদলা হয়ে ভারী চমৎকার হয়েছে। রাস্তায় লোকগুলো চলেছে, দেখ! অন্য দিন কি জাঁক কি জমক করেই সব পথ চলেন, আর আজ তেমনি জব্দ! কাদা মেখে জলে ভিজে সব চেহারা হয়েছে, দেখ না! এই জল-কাদার দিনগুলো আমার সুন্দর লাগে, মনটা যখন ভারী থাকে অবশ্য!"

পরী কহিল, "তুমি কি বল ফেলিসিয়া—আজ আবার মনে হল কি?"

"সে কথা থাক্। সে তুমি বুঝবে না, পরী!"

বাস্তবিক ফেলিসিয়াকে বুঝা সহজ ব্যাপার নয়। তাহাকে সামলাইয়া বেড়ানো—এক জেঙ্কিন্স ছাড়া আর কাহারও সাধ্যে কুলাইয়া উঠে না। অথচ ভগবান জানেন, জেঙ্কিন্সের উপর ফেলিসিয়ার মনের ভাব কেমন! বেশী দিনের কথা নয়—এই কালই জেঙ্কিন্স আসিয়া দুই ঘণ্টা ধরিয়া ফেলিসিয়ার দরবারে হাজিরা দিয়াছে, অথচ ফেলিসিয়া তাহার সহিত একটা কথাও কহে নাই, আজ যে সম্ভ্রান্ত অতিথি মহাশয়ের অভ্যর্থনার আয়োজন হইয়াছে, তাঁহার প্রতি ফেলিসিয়া কিরূপ ব্যবহার করিবে!

ফেলিসিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল। বৃষ্টির বেগ ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। ফেলিসিয়া সঙ্গিনীকে কহিল, "তুমি ওঠো পরী—দেখগে, কতদূর কি হল। মোদ্দা আর একটা কথা মনে রেখো, কেউ যদি আজ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে ত বলো, দেখা হবে না। আমার শরীর ভালো নেই।"

সহসা বাহিরে দ্বারের পার্শ্বে কে হাসিয়া কথা কহিল, "কিন্তু আমি আজ তোমার সঙ্গে দেখা না করে নড়ছি না, ফেলিসিয়া!"

স্বর শুনিয়া ফেলিসিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এ কি! মিনার্ভা যে—গেরি এ সময় হঠাৎ কি মনে করিয়া! ফেলিসিয়া ঈষৎ লজ্জিত হইল। মুখ তাহার রাঙা হইয়া উঠিল, গালে গোলাপ ফুটিল।

আপনাকে সামলাইয়া লইয়া হাসিয়াই সে কহিল, "কিন্তু তুমি মিনার্ভা যে এ-সময় আসতে পার, তা কে ভেবেছিল, বল! তা কি করে এলে?"

গেরি কহিল, "কেন, দরজা খোলা আছে, চলে এলুম!"

"দরজা খোলা! তা কর্ত্তার কাজই ঐ-রকম—বিশেষ কাজে আবার একজনকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে কি না!"

"নিমন্ত্রণ! ওঃ, ঠিক! তাই ও ঘরে দেখলুম বটে, ফুলের রাশ জড়ো করা রয়েছে—যেন একখানা গোটা বাগানই কে তুলে এনে ও ঘরটায় বসিয়ে দিয়েছে। তা এ সৌভাগ্যটা কার হল, শুনতে পাই না?"

ফেলিসিয়া একটা ঢোক গিলিয়া কহিল, "ও কিছু নয়। এর সঙ্গে প্রাণের কোন সম্পর্ক নেই—নেহাৎ ব্যবসাদারী ধরণের ভোজ এটা। তা যাহোক, বসো, বসো, এই পাশের ইজি-চেয়ারটায় বসো—তোমায় দেখে ভারী খুসী হলুম। পরী তুমি যাও।"

সঙ্গিনী চলিয়া গেল। পল গেরি বসিল। তার প্রাণের ভিতরে কেমন এক উত্তেজনার স্রোত বহিতেছিল। ফেলিসিয়াকে গেরি আজ বড় সুন্দর দেখিল। এত রূপ! ইহার পূর্ব্বে এমনটি সে আর তাহাকে কোন দিন দেখে নাই। এই মেঘলা সায়াহ্নের স্তিমিত আলোয় ষ্টুডিও-কামরায় সজ্জিত দৃশ্যাবলীর মাঝে সত্যই আজ ফেলিসিয়াকে স্বর্গের পরীর মত দেখাইতেছিল। তাহার উপর কণ্ঠস্বরে এ কি লালিত্য! যেন বীণার সুর!

গেরিকে দেখিয়া ফেলিসিয়ারও বড় আনন্দ হইল। এতদিন কেন সে আসে নাই? কোথায় ছিল সে? বোধ হয়, একমাস, না, প্রায় দেড়মাস, দুইজনের দেখা হয় নাই! কেন? গেরি কি এ বন্ধুত্ব রাখিতে চাহে না! এমনি কত কথা হইল। গেরি মার্জ্জনা চাহিল—বিশেষ কাজে সে বাহিরে গিয়াছিল, তাই আসিতে

রবে নাই। না আসিলেও তার কথা সে কতদিন কহিয়াছে—কত দিন!

ফেলিসিয়া কহিল, "বটে! কার সঙ্গে সে কথা হচ্ছিল, শুনি?"

গেরি বলিতে যাইতেছিল,—আলিনের সঙ্গে—কিন্তু কথাটা কেমন বাধিয়া গেল। কোথা হইতে লজ্জা আসিয়া মুখ চাপিয়া ধরিল। কেন এ লজ্জা,—তাই বা কে বলিবে? তবু কেমন লজ্জা হইল। হঠাৎ এমন সময় বিদ্যুতের মত একটা কথা তাহার মনের মধ্যে চমকিয়া উঠিল। সে ভাবিল, একটা মিথ্যা বলিবে সে। হোক্ মিথ্যা—তারই সাহায্যে সে আপনার অভীষ্ট সাধনের উপায় করিয়া লইবে।

গেরি কহিল, "এমন একজন ভালো লোকের সঙ্গে—যাঁর মনে অকারণ তুমি বড়-বেদনা দিয়েছ! আচ্ছা, বল ত, নবাবের মূর্ত্তি কেন তুমি গড়ে শেষ কর নি? এটা করলে তাঁকে কতখানি আনন্দ দিতে তুমি, কতখানি গৌরব তিনি বোধ করতেন, যদি এই মূর্ত্তি আজ এক্‌জিবিসনে ঠাঁই পেত! তিনি মনে বড় আশা করেছিলেন—"

নবাবের নামোল্লেখে ফেলিসিয়ার কেমন গোল বাধিয়া গেল! সে অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "সত্য, আমি নবাবের কাছে কথা রাখতে পারিনি। কি যে খেয়াল থেকে থেকে আমার মাথায় চাপে। তবে দু-তিন দিনের মধ্যেই কাজটা আমি সেরে ফেলবো। ঐ দেখ, কাপড়ে ঢাকা আছে—নবাবেরই মূর্ত্তি, মাটীটা এখনও শুকোয়নি!"

"তাহলে যে দুর্ঘটনার কথা শুনেছিলুম—আমি কিন্তু তা বিশ্বাস করিনি, জেনো।"

"তোমার ভুল, গেরি। ফেলিসিয়া কখনো মিথ্যা কথা বলে না। সত্যই পড়ে গিয়ে মাটিটা তাল পাকিয়ে গেছল—তবে কাঁচা ছিল, তাই আমি সেরে নিয়েছি—চাও ত উঠে এসে দেখ।"

ফেলিসিয়া উঠিয়া গিয়া কাপড়ের আবরণ সরাইয়া লইল—কাদায় গড়া নবাবের মূর্ত্তি, সেই সহাস মুখচ্ছবি নিমেষেই গেরি প্রত্যক্ষ করিল। চমৎকার সাদৃশ্য! গেরি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। ফেলিসিয়া কহিল, "ঠিক হয়নি? আর দু-চারটে তুলির আঁচড় টেনে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—" বলিতে বলিতে সে কোণের টেবিলের উপর হইতে ছোট তুলিটা টানিয়া লইয়া অসম্পূর্ণ মূর্ত্তির উপর ধীরে ধীরে বুলাইতে লাগিল। পরে মূর্ত্তিটা আলোর দিকে ঘুরাইয়া, নিজের ঘাড় বাঁকাইয়া তাহার পানে সযত্ন দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, "ক'ঘণ্টারই বা কাজ আর! তবে এক্‌জিবিসনে দেওয়া—? আজ হল ২২শে, সবাই নিজের নিজের যা-কিছু জিনিষ পাঠিয়ে ফেলেছে, বোধ হয়! এখন কি আর পাঠানো যাবে?"

"তোমার জিনিষ আবার পাঠানো যাবে না? এত যার লোক-বল—" ফেলিসিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, এ কথায় ঈষৎ অপ্রসন্নও হইল। তবু কথায় একটু তীব্র জ্বালা মিশাইয়া সে কহিল, "ঠিক বলেছ! ডিউক মোরার আশ্রিত যে—না, না, কোন কথার দরকার নেই, গেরি। আমি জানি, লোকে কি বলে! আর তাদের কথাগুলোকে আমি এমনি ঘৃণা করতেও জানি—" বলিয়া সে একটা কাদার ডেলা লইয়া ভূমে নিক্ষেপ করিয়া তাহার উপর পদাঘাত করিল—"আমার নিজের মনে যদি আমি—কিন্তু থাক্, ও সব কথার আলোচনাও আমি দরকার মনে করি না। তবে তোমায় একটা সুখবর দি, শোনো, মিনার্ভা, তোমার বন্ধুর মূর্ত্তি এবার সালোঁয় যাচ্ছে। এ তুমি নিশ্চয় জেনো—যাবেই।"

এমন সময় হঠাৎ একরাশ ফুলের গন্ধে ঘর ভরিয়া গেল। একটা ট্রেতে করিয়া বড় একটা ফুলের তোড়া লইয়া পরী আবার সেই কক্ষে আসিল, আসিয়া ফেলিসিয়াকে কহিল, "এই বড় তোড়াটা টেবিলের জন্য এল! কেমন?"

ফেলিসিয়া কহিল, "বেশ !"

তার পর গেরির দিকে চাহিয়া পরী কহিল, "পল, আজ ভারী সুন্দর কেক তৈরি করেছি, আমি। দুখানা আনব,—খাবে ?"

ফেলিসিয়া স্থির কণ্ঠে কহিল, "এখন নয়, পরী—খাবার সময় দিয়ো।"

খাবার সময় ? পরী অবাক হইয়া গেল। বিস্মিত নেত্রে ফেলিসিয়ার পানে সে চাহিয়া রহিল।

ফেলিসিয়া কহিল, "হাঁ, আমি মনে কচ্ছি, পলকে আটকে রাখবো—এখানে খেয়ে তবে ও যাবে। কেমন গেরি, তোমার কোন অসুবিধা হবে না ত ? ছোট-খাট অসুবিধা হলে আমি তা শুনছি না। আজ এখানে খেয়ে যাও। আমার ভারী উপকারও হবে তাতে—"

গেরি কহিল, "কিন্তু এ পোষাকে—কত ভদ্দর লোক আসবে—"

ফেলিসিয়া কহিল, "কে ভদ্দর লোক ! কেউ না—আমরা তিনজনে—শুধু তুমি, আমি আর পরী। ব্যস্—তাতে পোষাক বদলাবার কোন দরকার হবে না, পল।"

পরী বাধা দিয়া কহিল, "কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ, ফেলিসিয়া—আজ কাকে তুমি নিমন্ত্রণ করেছ। আর একটু পরেই তিনি এসে পড়বেন--"

ফেলিসিয়া কহিল, "তার জন্য তুমি ভেবো না, পরী। আমি এখনি চিঠি লিখে তাঁকে আসতে বারণ করে দিচ্ছি—"

"ফেলি—"

"কোন ভাবনা নেই, পরী। আমি লিখে দিচ্ছি, আমার শরীর হঠাৎ খারাপ বোধ হওয়ায় নিমন্ত্রণ স্থগিত হইল। এখন মোটে এই ছটা বেজেছে। সাড়ে সাতটায় খাওয়া—ওঃ, দেড় ঘণ্টা সময় আছে।" ফেলিসিয়া উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া তাড়াতাড়ি টেবিলের ধারে গিয়া

চিঠি লিখিতে বসিল। পরী বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল। এ কাণ্ড কি! এমন খামখেয়ালি—!

চিঠিখানা খামে মুড়িয়া পরীর হাতে দিয়া ফেলিসিয়া কহিল, "যাও, এ চিঠিখানা এখনই পাঠিয়ে দাও! হঠাৎ যদি কারও শরীর খারাপ হয়—সে ত আর মানুষের হাত-ধরা নয়। যাও, বুঝলে, চিঠিখানা পাঠিয়ে দাও।"

ফুলের ট্রে ঘরে রাখিয়া চিঠি লইয়া পরী চলিয়া গেল। ফেলিসিয়া সোফায় আসিয়া বসিল, কহিল, "কি পল, কি ভাবছ?"

পলও অবাক হইয়া গিয়াছিল। ব্যাপারটা তাহার কাছে হেঁয়ালির মতই দুর্ব্বোধ মনে হইতেছিল; এ যে রাজার যোগ্য আয়োজন, রাজার অভ্যর্থনার মতই সাজ-সজ্জার ঘটা! কোন্ ভাগ্যবান অতিথিকে আজ এমনভাবে বিমুখ করা হইল, শুধু তাহারই জন্য! কে সে—কে?—যাহাকে রাখিয়া ফেলিসিয়া তাহাকে এতখানি যত্ন, এতখানি সম্মান করিতেছে—?

ফেলিসিয়া পলের ভাব দেখিয়া হাসিয়া কহিল, "আমার খামখেয়ালি দেখে তুমি অবাক্ হয়ো না। যাক্, তোমাকে আর খুলে বল্‌তে কি—তুমি ত আর আমায় বিয়ে করতে যাচ্ছ না! কি বল—? আমার মত বুনো স্ত্রী নিয়ে সংসার করা চলে না, পল। স্বামী যখন চাচ্ছেন, তাঁর আনুগত্য করি, আমার ভিতরটা তখন রাশ-ছেঁড়া ঘোড়ার মতই অন্য-কোথাও ছুটতে চলেছে। এই মাত্র কি একটা মনে করলুম, ঠিক তার এক মিনিট পরেই মতলব উল্টে গেল—এ রকম স্ত্রী দারুণ অস্বস্তি! আমার কি প্রাণ আছে, না, মন আছে, যে তাকে বশ করবে!"

পল এবার কথা কহিল—অনেক দিন ধরিয়া একটা কথা তাহার বুকের মধ্যে বলি-বলি করিয়া ফুটিতে চাহিতেছিল। আজ তাহাকে জোর করিয়া সে ফুটাইয়া তুলিল। পল কহিল, "কিন্তু এইটুকু আমার প্রাণে বাজে,

ফেলিসিয়া। তুমি মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষ চিরদিনই তার মমতা তার স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে পুরুষকে ঘিরে রাখে, নৈলে বেচারা উদ্‌ভ্রান্ত পুরুষের দল সান্ত্বনা শান্তি কোথায় খুঁজে পাবে? আপনাকে বলি দেওয়াতেই মেয়েমানুষের জীবনের সার্থকতা। নয় কি?"

ফেলিসিয়া আঁধার-ম্লান বাহিরের পানে চাহিয়াছিল, চোখ না তুলিয়াই কহিল, "হয়ত তোমার কথাই ঠিক, পল। আমারও থেকে থেকে মনে হয়, এ বুকটা একেবারে খালি—সে খালি জায়গাটা পূরণ করতে না পারলে বুঝি বাঁচবো না। থেকে থেকে কেমন হাঁফিয়ে উঠি। তখন মনে হয়, যদি আমার একটা সংসার থাকত—একজন স্বামী, যাকে দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে আঁকড়ে ধরতে পারি,—একটি ছেলে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে যার মঙ্গল কামনা করব—যে আমার পানে চেয়ে থাকবে—আমার এ কাজের মধ্যেও যাদের পানে চেয়ে একটু বল পাব, আশ্রয় পাব!" একটু থামিয়া সে আবার বলিল, "কিন্তু তা হবার নয়! আমার জীবনটা এমনি এলোমেলো হয়ে গেছে, যে আর তাকে নতুন করে বাঁধা যায় না—বাঁধা অসম্ভব! ছেলেবেলায় আমার মা মারা গেছে—বাপের কাছে আমি মানুষ হয়েছি। বাড়ীতে মেয়েমানুষ না থাকায় শুধু পুরুষের কাছে থেকে-থেকেই আমার মনটা শক্ত হয়ে গড়ে উঠেছে, তাই পুরুষের মতই সে জেদী হয়ে দাঁড়িয়েছে! কিন্তু হাজার হোক্, আমি মেয়েমানুষ। তাই ওদিকেও পুরুষের মত মনটাকে একেবারে খাপ খাওয়াতে পারিনি। ভিতরে পুরুষ আর মেয়েলি ভাবে অনবরত একটা যুদ্ধ চলেছে। তাই মনটা পুরুষের মত হলেও আমি পুরুষ নই, অথচ এদিকে নিজে মেয়েমানুষ হয়েও ঠিক তাদের মতও নই!"

গেরি কোন কথা বলিল না। তাহার বুকের মধ্যে একটা তরঙ্গ উঠিয়াছিল। প্রাণ আজ একটা কথা বলিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, একবার সে বলে, "ওগো সুন্দরী বীরাঙ্গনা, এসো, আমার

কণ্ঠে তোমার ঐ বাহুর মালা পরাইয়া দাও, আমার স্কন্ধে ও শ্রান্ত শির রক্ষা কর—আমি তোমায় ভালবাসি, ভালবাসি, বড় ভালবাসি—তোমায় পূজা করি। তোমায় বিবাহ করিয়া, এস,আমি নিজে সুখী হই—তোমাকেও সুখী করি।" কিন্তু না, বড় লজ্জা করে। গেরি কোন কথা বলিতে পারিল না। পাছে মনের মধ্যকার এ কথা আভাসেও একটু জাগিয়া ওঠে, সেই ভয়ে সে কেমন শিহরিয়া উঠিল।

ফেলিসিয়া আবার কহিল, "তবে একটা জিনিষ আমি স্থির করে রেখেছি—আমার যদি কখনও মেয়ে হয় ত তাকে কখনও এমন দুর্দ্দশা পেতে দেব না। মেয়েকে মেয়ের মতই মানুষ করব—সে যেন মেয়েই হয়, পুরুষ না হয়!"

গেরি এবারও কিছু বলিতে পারিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ফেলিসিয়া আবার কহিল, "আঃ, পল, পল, তুমি আজ এসেচ—এতে আমি বড় সুখী হয়েছি, বড় সুখী! তোমার মত একজন বন্ধু আমার পাশে থাকে,—এ আমার বড় সাধ, বড় সুখ। মানুষের উপর আমার ঘৃণা জন্মে গেছে—দারুণ ঘৃণা! যাদের এই দিবা-রাত্র দেখছি, এরা কি মানুষ! যাই হোক পল, আমার সুদিনে-দুর্দ্দিনে তুমি আমার পাশে থাকো—তাহলে আমার বুকে আমি বল পাব, কিছুতে আমি হঠবো না —কেউ আমায় হঠাতে পারবে না। কেন তোমায় এত কথা বলছি, জানো পল? তোমাকে দেখলে আর একজনকে আমার মনে পড়ে। সে আমায় বড় ভালবাসে—তার মত বন্ধুও আমার আর কেউ নেই। তার মুখ তোমারই মুখের মত—প্রাণটাও এমনি! তাই কি তোমায় এত ভাল-বাসি, বন্ধু? ভাবি, দুজনে এত মিল, এত—"

কথা শেষ হইল না। পরী আসিয়া কহিল, "একবার এদিকে এস—দেখ, কি হল না হল!"

"চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়েছ?"

"দিয়েছি!"

*　　　*　　　*　　　*

রাত্রি সাড়ে আটটা। ভোজের পর দুই জনে আসিয়া ঘরে বসিয়াছে। গেরি ভাবিল, এই নারীর প্রতি কি অন্যায় অশ্রদ্ধাই সে এত দিন মনের মধ্যে পুষিয়া আসিতেছিল!

এমন প্রেমময়ী পবিত্রতাময়ী দেবী-প্রতিমাকে সে পিশাচিনী পাষাণী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল! কি অন্যায়! এখনই সে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবে, সব অপরাধ স্বীকার করিয়া নতজানু হইয়া ক্ষমা চাহিবে! কি বলিবে,—কথাটা সে গুছাইয়া লইল। যেমন বলিবে, অমনি দ্বার খুলিয়া এক দাসী প্রবেশ করিল। দাসী সংবাদ দিল, ডিউকের ওখান হইতে লোক আসিয়াছে, মাদামোসেলের শরীরের তত্ত্ব লইতে।

ফেলিসিয়া কহিল, "বলগে, শরীর তেমনি আছে—তবে বিশেষ খারাপ নয়—ভাবনার কোন কারণ নেই।"

গেরির বুকে সহসা কে যেন ছুরি বিঁধিয়া দিল। সে বুঝিল, এই অতিথির জন্যই আজ এতখানি আয়োজন হইতেছিল,—বটে! সে কহিল, "ডিউক মোরারই তাহলে এখানে খাবার কথা ছিল, আজ?"

"হাঁ,—জ্বালাতন করে তুলেছে আমাকে।"

"ডচেসও আসছিলেন?"

"ডচেস! না, সে কেন আসবে? তার সঙ্গে আমার আলাপও নেই।"

গেরি এবার কঠিন হইল—কঠিন স্বরেই কহিল, "আমি যদি তুমি হতুম, তাহলে কি করতুম, জানো? ডচেসকে ছেড়ে শুধু ডিউককে কখনও এই রাত্রির ভোজে নিমন্ত্রণ করতুম না, ফেলিসিয়া। তুমি বলেছিলে, না, তোমার বুকটা সময়-সময় খালি বলে মনে হয়? নিজেই তুমি কি নিজেকে খালি করে দিচ্ছ না! তুমি মেয়েমানুষ, তুমি নিষ্পাপ, কিন্তু এ

লোকের কুৎসাকে প্রশ্রয় দেওয়া মেয়েমানুষের পক্ষে কখনই উচিত নয়। আমি তোমায় এ-সব কুৎসারও অনেকখানি উর্দ্ধে দেখতে চাই !···কথাটা শুনে তোমার কষ্ট হল, ফেলিসিয়া ?"

"না, না,—তুমি ঠিক বলেছ, মিনার্ভা। তোমার এ কথা মাথায় তুলে নিচ্ছি। এমন স্পষ্ট, এমন সরল কথাই আমি শুনতে চাই ! জেঙ্কিন্সের দলের ভদ্রতার পাত-মোড়া কথায় আমার অরুচি ধরে গেছে, ঘৃণা জন্মেছে। আমি ত তোমায় বলেইছি, আমার এমন একজন বন্ধু চাই যে আমার দোষ দেখলে বকবে, ঠিক বিচার করবে ! যাকে আমি আশ্রয়ের মত আঁকড়ে ধরতে পারব !"

তার পর ফেলিসিয়া উঠিয়া কাগজে মোড়া একটা ছবি আনিয়া পলের সম্মুখে রাখিল, কহিল, "এই আমার সেই বন্ধুর ছবি, যার কথা বলছিলুম আমি। এমন সরল উঁচু মন আমি আর কোথাও দেখিনি। যখনই কোন নীচ বাসনা আমার মনে আসে, তখনই আমি এর কথা ভাবি ! শুধু মনে হয়, এ কি বলবে ! এই চিন্তাই শুধু আমায় দারুণ দুর্ব্বল মুহূর্ত্তেও রক্ষা করে এসেছে—এরই জন্য আজও আমি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছি, পল !"

পল কোন কথা বলিল না। সে ছবি দেখিতেছিল। এ যে আলিনের ছবি—আলিন জুজ ! সেই সুন্দর শুভ্র অমলিন মুখ, সেই নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক পবিত্র মূর্ত্তি ! আসুক এখন ডিউক মোরা—ইহার পাশে লক্ষ ফেলিসিয়াকেও গেরি তুচ্ছ করিতে পারে !

গেরি কহিল, "এ ছবিখানি আমায় দেবে তুমি ?"

"স্বচ্ছন্দে। কেমন—চমৎকার মুখ নয়—সুন্দরী নয় ? যেমন রূপ, গুণও তেমনি। পৃথিবীর সমস্ত নারী একদিকে, আর এই আলিন অন্যদিকে। শোন পল,—এর সঙ্গে যদি কখনও তোমার দেখা হয়, কখনও যদি এর দেখা পাও—কখনও যদি একে জানবার—"

ফেলিসিয়া কথা শেষ করিতে পারিল না। কে যেন কণ্ঠটাকে সবলে চাপিয়া ধরিল। পল ফেলিসিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল,—ফেলিসিয়ার দুই চোখে—সেই সস্মিত সহাস দুই চোখে বড় বড় দুই বিন্দু অশ্রু মুক্তার মত ফুটিয়া উঠিয়াছে!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মেলা

"চমৎকার!"

"এর আর তুলনা নেই! সুন্দর!"

"এ যে নবাবের মূর্ত্তি! আর্টিষ্ট ফেলিসিয়ার হাতে গড়া! বাঃ, খাসা হয়েছে!"

মুগ্ধ দর্শকমণ্ডলী একবাক্যে শিল্পীর প্রতিভার সুখ্যাতি করিল। বিরাট মেলা, বিপুল জনতা। পথে গাড়ীর ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হয়, এমন সাধ্য কাহারও নাই। ভিতরেও লোক একেবারে গিস্-গিস্ করিতেছে। বড় বড় ডিউক, কাউণ্ট, রাজ-কর্ম্মচারী, সম্ভ্রান্ত উপাধি-ধারী হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অবধি সকলেই মেলায় উপস্থিত। বিবিধ শিল্পীর হাতের তৈয়ারী ছবি ও ধাতুমূর্ত্তি স্তরে স্তরে সাজানো—কিন্তু সকলের চেয়ে সেরা হইয়াছে, ফেলিসিয়ার হাতের মূর্ত্তিগুলি। বিশেষ এই নবাবের মূর্ত্তি! দেখিলে মনে হয়, নবাব নিজেই যেন বসিয়া রহিয়াছে। চোখের উপরকার ভ্রূর রেখাটুকু পর্য্যন্ত এমন সূক্ষ্ম, এত সুন্দর! নবাবের মূর্ত্তির কাছেই তাই বিশেষ করিয়া এতখানি ভিড় জমিয়াছিল।

একদল রক্ষীর অগ্রে টিউনিসের বে আসিয়া মেলায় প্রবেশ করিল। মূর্ত্তি-মণ্ডপে ঢুকিয়াই সম্মুখে সে দেখে, ফেলিসিয়ার হাতে গড়া সেই কুকুর ও শৃগালের মূর্ত্তি। চমৎকার! দেখিয়া বে'র তাক লাগিয়া গেল। মানুষ এমন নিখুঁত গড়িতে পারে! আশ্চর্য্য! কুকুরের পায়ের নখটি হইতে মুখ-চোখের ভাবটুকু অবধি কি পরিপাটী! মনে হয়, কুকুরটা যেন ডাকিতেছে—এমন নিপুণ হাতের টান! বে'র মুখে প্রসন্নতার রেখা ফুটিয়া উঠিল। শৃগালের পিছনে কুকুর ছুটিয়াছে। দেহটাকে দীর্ঘভাবে ছড়াইয়া দিয়া কি অধীর আগ্রহেই না সে ছুটিয়াছে! তাহার মুখে-চোখে একাগ্রতার রেখাটুকু নিপুণ শিল্পী ভারী সুন্দর টানিয়া দিয়াছে। শৃগালও ছুটিয়াছে—শৃগালের মুখে-চোখে ভয়ের চিহ্নটুকু কি স্পষ্ট, কি দীপ্ত! মূর্ত্তির তলে, টিকিট আঁটা—টিকিটে লেখা আছে, "ডিউক দ্য মোরার সম্পত্তি।" এটি ব্রোন্‌জের মূর্ত্তি।

নিকটেই মেলার এক তরুণ কর্ম্মচারী দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন, মূর্ত্তির বিষয়টি এক প্রাচীন উপকথা হইতে গৃহীত। হেমারলিংও বে'র পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। সে কহিল, "এটা ফেলিসিয়ার হাতে গড়া।"

"ফেলিসিয়া! সে কে?"

হেমারলিং কহিল, "একটি স্ত্রীলোক, বয়সও বেশী নয়—"

স্ত্রীলোক! স্ত্রীলোকের হাতে গড়া এই মূর্ত্তি! বেশ ত! বে'র মুখে আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল,—চোখে প্রশংসার বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। স্ত্রীলোকের হাতের তৈয়ারী! বাঃ, মৃণালের মত কোমল হাত কঠিন ব্রোন্‌জকে এমন বাগ মানাইয়াছে? চমৎকার! বে কহিল, "এঁর তৈরি আর কোন মূর্ত্তি আছে?"

তরুণ কর্ম্মচারী কহিলেন, "হাঁ—এই লাইনের শেষেই আর একটি আছে। ঐ যে—যেখানটায় ঐ খুব ভিড় জমেছে। দেখতে পাচ্ছেন?"

হেমারলিঙের সহিত বে অগ্রসর হইয়া চলিল। কিন্তু আগাইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে উভয়েই চমকিয়া উঠিল। নবাব! নবাবের মূর্ত্তি—এ যে একেবারে হুবহু সেই মুখ! কোন তফাৎ নাই! নবাব, যেন স্বয়ং জীবন্ত নবাব বসিয়া আছে—তাহার ঠোঁটের কোণে সেই হাসিটুকুও লাগিয়া আছে। বে জ্ঞান হারাইল; সে চীৎকার স্বরে কহিল, "জাঁস্লে?"

একজন কহিল, "হাঁ—বার্ণার্ড জাঁস্লে—কসিকার নতুন ডেপুটি।"

বে হেমারলিঙের পানে চাহিল, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "ডেপুটি?" হেমারলিং প্রথমটা কেমন ভড়কাইয়া গেল,—তারপর সে ভাব কাটিলে মৃদু হাসিয়া কহিল, "হাঁ, আজ সকাল থেকে ডেপুটি বটে! কিন্তু এখনও পাকা রকম মঞ্জুর হয়নি।" তারপর এক নিশ্বাসেই সে বলিয়া গেল, "কিন্তু ফ্রান্স কখনোই এ বোম্বেটেকে কৌন্সিলে বসতে দেবে না।"

নাই দিক্—তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। হেমারলিঙের উপর বে'র যে অগাধ বিশ্বাস ছিল, সেই বিশ্বাসের উপর কে যেন প্রচণ্ড ঘা মারিল! এই হেমারলিং কি জোর গলাতেই না বলিয়া ছিল, নবাব কখনই ডেপুটি হইবে না। সে সম্ভাবনা মোটেই নাই—আর তাহার সেই কথার উপর বে কি অখণ্ড বিশ্বাসই না স্থাপন করিয়া রাখিয়াছে! কিন্তু আজ এ কি! সেই বোম্বেটেকে শুধু আজ ডেপুটি করিয়াই ফ্রান্স বসিয়া নাই; মেলায় ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী সেই বোম্বেটেরই মূর্ত্তি গড়িয়া এত সম্মান, এমনি গৌরব তাহাকে দান করিয়াছে! আবার সেই মূর্ত্তির কাছেই যত লোক জড়ো হইয়াছে!

হেমারলিং এতটুকু হইয়া গেল। তাহার ললাটে স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিল! সে না শুনিয়াছিল, নবাবের মূর্ত্তি ফেলিসিয়া শেষ করিয়া তুলিতে পারে নাই, এবং কাল রাত্রি পর্য্যন্ত মেলার তালিকায় এ মূর্ত্তির নামোল্লেখও ছিল না! আজ সহসা বিনামেঘে বজ্রাঘাত! এটুকু জানা

থাকিলে হেমারলিং কখনই বেকে এমন ঘটা করিয়া এখানে আনিবার কল্পনা করিত না! আনিলেও এ ধারটায় যাহাতে তাহার দৃষ্টি না পড়ে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকিত! হায়, হায়, কি ভুলই হইয়া গিয়াছে! আবার ফেলিসিয়াকেও এখন উড়াইয়া দিবার উপায় নাই! এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে নিজের মুখেই সে ফেলিসিয়ার গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছে! সেদিন সাঁতে-রুমা ষ্টেশনে নবাবের অত সাধ-আশায় বাজ ফেলিয়া মনে যে আনন্দের আলো ফুটিয়া ছিল, আজিকার এ ঘটনায় নিমেষে তাহা কালো হইয়া গেল।

বে অনেকক্ষণ ধরিয়া নবাবের সেই মূর্ত্তির পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। মুখে কথা নাই—কুঞ্চিত ভ্রূ—কি এক চিন্তা সমস্ত মনটাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে! এমন সময় নিকটেই একটা উচ্চ হাস্যরব শুনিয়া বে ফিরিয়া চাহিল। নবাব আসিয়াছে। নবাব এক তরুণীর সহিত কথা কহিতেছে। কে ও তরুণী? হেমারলিং কহিল, "ও-ই ফেলিসিয়া।"

সেখানে আরও চার-পাঁচজন লোক দাঁড়াইয়া ছিল। সকলেরই বেশ-ভূষা সম্ভ্রান্ত ধরণের দেখিলেই বুঝা যায়, তাঁহারা কেও-কেটা নয়। বে পরিচয়ে জানিল, ঐ যে কালো হ্যাট মাথায়, উনিই ডাক্তার জেঙ্কিন্সের মুখে গর্ব্বস্ফীত দীপ্ত ভাব। তাহারই পাশে মাদাম জেঙ্কিন্স। মাদাম জেঙ্কিন্স ফেলিসিয়ার কারুকার্য্যের তারিফ করিতেছিল। জেঙ্কিন্স বিশেষ করিয়াই আদেশ দিয়াছিল, "ফেলিসিয়ার সঙ্গে আলাপ করগে—তার কাজের তারিফ করগে।" বেচারী মাদাম,—কি করিবে সে? লোকের মুখে যে কথাটা ঘুরিয়া ফিরিত, মাদামের কানেও তাহা গিয়াছিল। মনের মধ্যে আগুন চাপিয়া তাই সে ফেলিসিয়ার করকম্পন করিল। সে জানিত, ডাক্তারের বুকের মধ্যে ফেলিসিয়ার প্রতি কি ভাব জাগিয়া আছে—কিন্তু কোন দিন সে বিষয়ে সে এতটুকু ইঙ্গিত করে নাই! সে ইঙ্গিতে পরিণাম কি দাঁড়াইবে, সে বিষয়ে তাহার যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল।

তাহার পরই নবাব সবলে তাঁহার ভারী হাতে ফেলিসিয়ার কোমল হাতটি সবেগে নাড়িয়া দিল, উচ্ছ্বসিতভাবে কহিল, "আজ আমায় বড় সম্মান দিয়েছেন—বড় গৌরব। এ ঋণ কখনও আমি শুধতে পারবো না। আমার নামে যে কুৎসা আজ চারিদিকে' রটে বেড়াচ্ছে, আপনি আজ সমস্ত প্যারিকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে আপনি সে-সব মোটে বিশ্বাস করেন না। এ উপকার আমি জীবনে ভুলবো না। এ মূর্ত্তিকে আজ যদি আমি হীরে-জহরতে মুড়ে দি, তবুও আমার এ ঋণ শোধ হয় না!"

ফেলিসিয়ার মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। এতখানি প্রশংসা-সত্ত্বেও তাহার প্রাণ তৃপ্ত হইল না—সে আজ আর-একটি মুখের দুইটা হর্ষ-বাণীর জন্য তৃষিত হইয়া ছিল—আজ আর কাহারও পানে তাহার দৃষ্টি নাই, কাহারও কথা তাহার মনের মধ্যে উঁকি দেয় না! শুধু সেই পরিচিত প্রিয়জনটির চিন্তায় মন ভরিয়া রহিয়াছে! কিন্তু কোথায় সে? কেনই বা তার কথা এমন করিয়া প্রাণের মধ্যে বার বার সাড়া দিতেছে? কেন? কেন? এ কি তবে ভালবাসা—এই কি প্রেম? ফেলিসিয়া কি তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে? সেই সরল উদার সুন্দর গেরিকে ফেলিসিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও ত আজ ভুলিতে পারিতেছে না—এতখানি সমাদর, এমন সম্মান, আজ শুধু তাহার অভাবেই তুচ্ছ, নিতান্ত ম্লান বোধ হয়, কেন? দূরে ঐ যে তাহার মুখখানি দেখা গেল—ঐ যে ঐ ভিড়ের মধ্যে! ফেলিসিয়ার শরীরে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ছুটিয়া গেল। সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। ঐ সে আসে না! না, ও ত গেরি নয়! তবে তাহারই মত মুখখানি, তাহারই মত দীপ্ত সরল চোখদুইটি! না, না, ও যে আলিন—! গেরি নয়! ফেলিসিয়া ছুটিয়া অগ্রসর হইল; ভিড়ের মধ্য লইতে তাহার হাতটি টানিয়া ডাকিল, "আলিন—"

"ফেলিসিয়া···"

তার পর দুইজনে দুইজনকে গাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া ফেলিল
কত দিন—কত দিন পরে আজ উভয়ের সাক্ষাৎ! বৃদ্ধ জুজ্ সগ
দৃষ্টিতে দুই বন্ধুর মিলন-দৃশ্য দেখিল।

আলিন কহিল, "আজ তোমার কি সুখ, ফেলিসিয়া! এত ব
মেলায় সকলের মুখে তোমারই জয়ধ্বনি শুনচি, শুধু! আমার
আজ বড় আহ্লাদ হচ্ছে, ফেলিসিয়া।"

"কিন্তু আমার আহ্লাদ এইজন্য বেশী যে, তোমার দেখা পেলু
আলিন। কত দিন পরে—আলিন—"

আলিন হাসিয়া কহিল, "কিন্তু সে কার দোষ, ফেলিসিয়া?"

ফেলিসিয়ার প্রাণে কে যেন ছুরি বিঁধিয়া দিল। সত্যই ত এ-জ
দায়ী কে? কেন সে দেখা করে নাই—কেন সে কোন খোঁজ লয় নাই
কিন্তু থাক্ সে কথা। ফেলিসিয়া কহিল, "তারপর কেমন আছ, আলিন
খপর কি, সব?"

"কিছু এমন নয়। নতুন আর কি খপরই থাকতে পারে বা আমার?

"জানি, জানি, আলিন। শুধু আপনাকে বলি দিয়ে চলেছ, তুমি—
নয় কি?"

সে কথা কিন্তু আলিনের কানেও গেল না।

সে মৃদু হাসিল মাত্র। কিন্তু দৃষ্টি তাহার উতলা হইয়া আর কাহার
পানে ফিরিয়া গেল। ফেলিসিয়া চাহিয়া দেখিল, নিকটেই গেরি দাঁড়াইয়া।
মাদামোসেল জুজকে অভ্যর্থনা করিল।

"তাহলে তোমাদের আলাপ-পরিচয় আছে, বল।"

"কি? আমায় বলছ?"

আলিন কহিল, "হাঁ, পলকে আমি চিনি বৈ কি! পলের সঙ্গে
তোমার সম্বন্ধে কত কথাই যে হয়—"

ফেলিসিয়া কহিল, "বল কি—পল এত লাজুক—সে—"

ফেলিসিয়া সহসা থামিয়া গেল। একটা কথা বিদ্যুৎ-রেখার মত তাহার প্রাণে ফুটিয়া উঠিল। গেরি তাহার অভ্যর্থনা করিল। সে দিকে ফেলিসিয়া লক্ষ্যমাত্র করিল না। কি একটা কথা সে চুপি চুপি আলিনের কাণে কহিল। নিমেষে আলিন অমনি লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তাহার কাণের ডগা দুইটা লাল হইয়া উঠিল। আলিন মুখ নত করিল। তার পর নিতান্ত ধীরস্বরে সে কহিল, "তুমি কি পাগল হয়েছ, ফেলিসিয়া! আমার এই বয়সে --বল কি, তুমি!" তারপর অতর্কিতে সে পিতার হাত ধরিয়া ফেলিসিয়ার দ্বিতীয় কথার আভাস অবধি এড়াইবার উদ্দেশ্যে সরিয়া গেল।

ফেলিসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গেরি আলিনের হাত ধরিয়া চলিল। ফেলিসিয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। যে কথাটা ছায়ার মত মনের মধ্যে ফিরিতেছিল, সেটা তখনই সত্যের মত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। গেরি ও আলিন—চমৎকার মানায়! কিন্তু উহারা জানে না, হয়ত কি নিবিড় বাঁধনেই দুইজনে ধরা পড়িয়া গিয়াছে—কি অসহ্যভাবেই দুইজনে দুইজনকে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছে! প্রেমের সাড়াটুকুও বুঝি তাহাদের প্রাণে গিয়া পৌছায় নাই! না পৌঁছাক—প্রেম তাহার কাজ সারিয়া লইয়াছে। ফেলিসিয়ার তাহা বুঝিতে এতটুকু বাকী রহিল না। আহা, তাই হউক—দুইজনে দুইজনকে প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসুক! এই আলিন —সুন্দর সরল আলিন···তাহার কাছে ফেলিসিয়া! চাঁদের কাছে মোমের বাতি! ধিক্ তাহার স্বার্থ-চিন্তা! ফেলিসিয়া দুই পায়ে আপনার মনটাকে চাপিয়া ধরিল! তাহার দুই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অন্য দিকে চাহিল। অমনি ডিউক মোরার অভিনন্দন-বাণী কাণে পৌঁছিল।

"তার পর মাদামোসেল—এ যে চমৎকার হয়েছে, চমৎকার! একটা কথা শুধু বলি—কুকুরের মূর্ত্তির নীচে ব্যাখ্যাটা দিলেই ভালো হত। সকলে মানেটা স্পষ্ট বুঝতে পারত।"

ফেলিসিয়া কোন কথা বলিল না—পাথরের মূর্ত্তির মতই স্থিরভাবে সে দাঁড়াইয়া রহিল—দৃষ্টি তাহার উদাস, স্থির। তার পর কোনমতে ধীরস্বরে সে কহিল, "কিন্তু একটা কথা—রাবেলাস মিথ্যে বলেছে—শেয়ালটাকে শেষে হাঁপিয়ে শ্রান্ত হয়ে কুকুরের কাছে ধরা দিতে হল—এ কথাটা রাবেলাস লিখতে ভুলে গেছে। কি বলেন ?" কথা শেষ করিয়া ফেলিসিয়া মৃদু হাসিল। মোরার সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার মুখের ভাব বদলাইয়া গেল। তাঁহার মনে হইল, পৃথিবীর বুক হইতে কে যেন তাঁহাকে টানিয়া উর্দ্ধে আকাশ-পথে উড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে!

সেদিন মেলায় সকলের অপেক্ষা অধিক সুখ পাইলেন, নবাব। বন্ধু-জনে পরিবেষ্টিত নবাব দীপ্ত উচ্চ হাস্যধ্বনিতে মেলা-প্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া দিলেন। এই মূর্ত্তি ফেলিসিয়ার গড়া—এই মূর্ত্তি আজিকার বিরাট মেলায় জয়মাল্য আদায় করিয়াছে! এ কি কম সুখ—কম গৌরব! তাহার উপর তিনি ডেপুটি—কর্সিকার নূতন ডেপুটি হইয়াছেন। ভাগ্যলক্ষ্মী এক মুহূর্ত্তে যেন পথের ভিখারীর হাত ধরিয়া রাজ-সিংহাসনে তাহাকে বসাইয়া দিয়াছেন! কি শুভ মাহেন্দ্রক্ষণই না আজিকার প্রভাতে দেখা দিয়াছে! শুধু সুখ, শুধু সম্মান, শুধুই গৌরব! সমস্ত ধূলি-লাঞ্ছিত মলিন অতীতটাকে যেন সোনার বর্ণে কে রাঙাইয়া দিয়াছে—সমস্ত কদর্য্যতা, সমস্ত মলিনতা, সমস্ত দুঃখ-বেদনা নিমেষে কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে!

ডেপুটি!

তার পর সকলের সহর্ষ অভিনন্দন—সকলের এই একই আন্তরিক শুভ-কামনা! নবাবের মনে হইল, বুঝি তিনি পাগল হইবেন! এত সুখ, ছোট প্রাণে এত আর ধরে না যে!

গৃহে ফিরিবার সময় আসিল। মশার্দ আসিয়া কহিল, "নবাব বাহাদুর, আপনার গাড়ীতে আমাকে নিয়ে যাবেন ?" নবাব তাহার স্পর্দ্ধা দেখিয়া

বিস্মিত হইলেন। তিনি কঠিন স্বরে কহিলেন, "অসম্ভব মশার্দ—আমার গাড়াতে আর জায়গা হবে না।"

মশার্দ কহিল, "নাই হোক—আপনার সঙ্গে আমার গোটাকতক দরকারী কথা আছে—"

"হাঁ! কিন্তু গেরির কাছে আপনার কথার জবাব পাননি কি, আজ সকালে? আপনি যা বলেছেন, সে কথা আমি রাখতে পারব না। বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক আপনি চেয়েছেন! আস্পর্দ্ধাও কম নয়।"

মশার্দ কহিল, "তবু আপনার জন্যে যা করেছি—"

"তার চতুর্গুণ আপনি আদায় করে তবে ছেড়েছেন। আর কিছু হবে না, বুঝলেন! পাঁচমাসে দু'লাখ ফ্রাঙ্ক আপনি নিয়েচেন—আরও চান? আপনার দাঁতে বড় ধার হয়েছে, বুঝলেন—সে ধার এখন কিছু নরম পড়া দরকার!"

তারপর আরও দুইটা রূঢ় কথার পর নবাব জানাইলেন, তাঁহার নিকট হইতে আর একটি ফ্রাঙ্কও আশা করা মশার্দের বাতুলতা। নবাব দৃঢ়-সংকল্প হইয়াছেন। আর একটি ফ্রাঙ্কও দেওয়া হইবে না—কোন সুপারিশ, কোন মিনতিতেও নয়!

"এই তা হলে আপনার শেষ কথা?"

নবাব তাহার দৈত্যের মতই ভীষণ চোখ দুইটার পানে চাহিয়া মুহূর্ত্ত নীরব হইলেন, পরে দৃঢ় স্বরে কহিলেন, "এই আমার শেষ কথা।

"বেশ—তাহলে দেখা যাবে—" বলিয়া মশার্দ আপনার ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া গেল।

জাঁসুলে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। বাহিরে প্রকাণ্ড গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। নবাব উঠিতে যাইবেন, এমন সময় মোরা আসিয়া সবেগে তাঁহার করকম্পন করিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিলেন, "আমার অভিনন্দন, ডেপুটি সাহেব!"

উচ্চ কণ্ঠে মোরার মুখে "ডেপুটি সাহেব" কথাটা শুনিয়া নবাব মুহূর্ত্তে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন। গৌরব-দৃপ্ত ভাবে তিনি সেই জন-তরঙ্গের পানে চকিতে চাহিয়া দেখিলেন। এতগুলা লোকের সম্মুখে ডিউকের মুখে আজ এ বিরাট অভিনন্দন—বড় গৌরবের, বড় সম্মানের কথা এ!

আজ তাঁহার জীবন-আকাশে এ কি নূতন সূর্য্য অপূর্ব্ব দীপ্ত রাগে উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠিল, ভগবান! এত সুখ এ জগতে মিলিতে পারে!

নবাব মোরাকে ধন্যবাদ জানাইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন—গাড়ী ভিড় ঠেলিয়া ছুটিয়া চলিল। মেঘ-ভাঙ্গা আকাশে সূর্য্য তখন স্নিগ্ধ মধুর কিরণ-ধারা বর্ষণ করিতেছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দশের একজন

মে মাসের অপরাহ্ণ। অস্তগামী সূর্য্যের ম্লান কিরণ-রেখা ডিউক মোরার উপরকার বসিবার ঘরের জানালায় সবুজ ভেলভেটের পরদার উপর লুটাইয়া পড়িয়াছিল। চারিধার স্তব্ধ। মন্ত্রিসভার সদস্যের দল আপনাদের কাজ সারিয়া তখন বিদায় লইয়াছে। পথে ডিউকের প্রাসাদের সম্মুখে ডাক্তার জেঙ্কিন্সের গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল।

কাল হইতে ডিউকের শরীরটা খারাপ যাইতেছে। আজ আহারের পর হইতে আরও খারাপ বোধ হইতেছিল, তাই পার্ল-ডাক্তার জেঙ্কিন্সের তলব পড়িয়াছে। ডিউকের কাল হইতে ক্ষুধা নাই, চোখে নিদ্রাও নাই—শরীরটা অত্যন্ত ভার বোধ হইতেছিল।

জেঙ্কিন্স ঠিক সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডিউকের খাস-কামরায় বসিয়া জেঙ্কিন্স ভাবিতেছিল, কি আবার নূতন উপসর্গ ঘটিল যে হঠাৎ এই অবেলায় ডাক পড়িয়াছে! ডিউক চারি-পৃষ্ঠা-লেখা একখানা চিঠি পড়িতে ছিলেন, সম্মুখে একজন অনুচর চোখে অধীর আগ্রহ লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। চিঠিখানা পড়িবার সময় ডিউক নিজের মনেই অসম্বদ্ধ দুই-একটা কি কথা বলিতেছিলেন—মধ্যে মধ্যে কলমটা টানিয়া লইয়া চিঠির গায়ে দুই-চারিটা আঁচড়ও টানিতে-ছিলেন। বাহিরে মর্ম্মরে রচা কৃত্রিম নির্ঝরের জলের উপর সোয়ালোর ঝাঁক মৃদু আনন্দ-ধ্বনি তুলিয়া ঘুরিতেছিল; এবং দূরে পুলের উপর বসিয়া কে ক্লারিয়োনেট বাজাইতেছিল, অপরাহ্ণের স্নিগ্ধ-শীতল বায়ু-তরঙ্গে তাহারই উদাস সুর ভাসিয়া আসিতেছিল।

ডিউক মোরা হঠাৎ চিঠিখানা টেবিলে রাখিয়া অনুচরকে কহিলেন, "না, এ আজ্ আর দেখা হবে না—দাত্তিগ্। কাল নিয়ে এসো—আমার হাত-পাগুলো বড় ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে। এই যে ডাক্তার, দেখ ত—আমার হাত হিম হয়ে রয়েছে, ঠিক যেন বরফ-জলে হাত ধুয়েচি—। আজ দু'দিন ধরে শরীরটা এমনি খারাপ রয়েছে! অথচ, এমন গরম যাচ্ছে—নাঃ, কোথায় যে গোল হল, কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।"

ডাক্তার রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "হুঁ—দেখলুম। একটা কথা,—এর ভিতর কোন অত্যাচার কিছু হয়েছিল?"

ডাক্তারের মনে একটা সন্দেহ জাগিতে ছিল, সঙ্গে সঙ্গে একটু ঈর্ষাও! নূতন সেই বন্ধুটির সহিত ডিউকের অন্তরঙ্গতা ডাক্তার লক্ষ্য করিয়াছিল; কিন্তু সে বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে ত ডাক্তার কোন একটা ইঙ্গিত করিতে পারে না—তাই আজ অবসর পাইয়া সেই বিষয়টার প্রতিই মৃদু ইঙ্গিত করিয়া ডাক্তার এই প্রশ্ন তুলিল। প্রশ্ন তুলিয়া অধীর চোখে আগ্রহ ভরিয়া ডিউকের মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

ডিউকের মুখে কোন ভাবান্তর ঘটিল না—ভ্রূভঙ্গীটাও অকুঞ্চিত রহিল। ডিউক বেশ শান্ত স্বরেই কহিলেন, "ঐটেই তোমার ভুল, ডাক্তার। আমি এখন এত বাঁধা নিয়মে রয়েছি যে ছেলেবেলাতেও বোধ করি এমন ছিলুম না।"

ডাক্তারের মনের মধ্যে ঈর্ষা তীব্রতর হইয়া উঠিল। ডাক্তার কহিল, "তাই ত, তবে গোল হল কি করে?"

ডাক্তার দ্বিতীয়বার আর এ কৌতূহলটাকে পরিতৃপ্ত করিবার সুযোগ পাইল না—ইহার বেশী অগ্রসর হইবার সাহসও তাহার ছিল না—এবং সে বিষয়ে অধিকার আছে কি না, সে সম্বন্ধেও ডাক্তারের মনে বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। ডাক্তার কি বলিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছে না, এমন সময় ডিউক কহিলেন, "শোনো ডাক্তার, যে তুমি কতকগুলো আবল-তাবল হেঁয়ালি বকবে, তার দরকার নেই—সে সব শুনতে আর ভালও লাগে না, আমায় সাফ জবাব দাও—এত ঠাণ্ডা আমি বোধ করছি কেন? কি এ? খুব অল্প কথায় বুঝিয়ে দাও—"

ডাক্তার মুহূর্ত্তের জন্য দ্বিধায় পড়িল—তার পর কহিল, "শরীরে রক্ত নেই—তার উপর খাটুনি, মাথা-ঘামানো,—এই। এ ছাড়া আর ত কোন কারণ দেখচি না।"

"তাহলে এর প্রতিকার কি?"

"প্রতিকার, চুপ করে বসে থাকা—একদম্ জিরুনো। কোন রকমে ঘামানো নয়, কোনরকম খাটুনি নয়। তার উপর যদি হপ্তাখানেকের জন্য কোথাও বেড়িয়ে আসতে পারেন—এই ধরুন, গ্রানবোয়ে—কি—"

ডিউক ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "থামো, থামো। বেড়াতে গেলে এই কৌন্সিলের মিটিং, তবে গে—না, না, সে হতেই পারে না—অসম্ভব!"

ডাক্তার কহিল, "কিন্তু মাথাটাকে একটু ছুটি না দিলে—"

ডাক্তারের কথা শেষ হইল না। একজন ভৃত্য একখানা কার্ড আনিয়া ডিউকের হাতে দিল। ডিউকের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল! ডাক্তার কথা বন্ধ করিয়া কার্ডখানার দিকে চাহিয়া দেখিল—পরিচিত নাম! ডিউক কার্ড রাখিয়া ভৃত্যকে বলিলেন, "আচ্ছা, একটু বসতে বল।" ভৃত্য বিদায় লইল; পরে ডাক্তারের পানে চাহিয়া তিনি কহিলেন, "আসল কথা কি জানো, ডাক্তার, যেমন করেই হোক—অর্থাৎ বুঝেছ কি না—তোমার পার্লের মাত্রা না হয় কিছু বাড়িয়ে দাও, যা দিচ্ছ, তার ডবল দাও। মাথা থেকে নতুন আর কোন-একটা ওষুধ বার কর। এই রবিবারটা আমায় চাঙ্গা রাখো—বুঝতে পারচ, এই রবিবারটা আমার শরীর যেন খুব ভালো থাকে—!"

জেঙ্কিন্স একবার কাশিয়া গলাটা সাফ করিয়া লইয়া বলিল, "আপনাকে কিন্তু ভারী সাবধানে থাকতে হবে, ডিউক বাহাদুর। আপনার শরীর যা হয়েছে, তাতে আমি আপনাকে খুব যে ভরসা দিতে পারি—এ বোধ হয় না। আপনাকে স্পষ্টই বলচি, জানবেন—আমার কর্ত্তব্য বলেই এত স্পষ্ট করে বলচি—"

ডিউক হাসিয়া কহিলেন, "তোমার কর্ত্তব্য-টর্ত্তব্য ও-সব বাঁধা বুলি তুলে রাখো, ডাক্তার। আমি যাতে আরামে থাকি, যা করে সুখ পাই, তাতে তুমি বাধা দিতে এসো না—এ প্রাণটুকু যেমন ভাবেই জ্বলে শেষ হোক্ না কেন, সব বঞ্চিত করে রাখলে আমি আগেই এটুকু ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দেব। সব ছেড়ে বেঁচে থাকার চেয়ে সব নিয়ে একটা ঝড় তুলে মরাও যে ঢের ভালো বোধ হয় আমার।"

বাহিরে একটা শব্দ হইল। ডিউক চাহিয়া দেখিলেন, ডচেস। সুন্দর কুঞ্চিত কেশ-গুচ্ছের মধ্যে সুন্দর মুখখানি লইয়া ডচেস্ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ডচেস্ ভর্ৎসনার স্বরে কহিলেন, "এ কি—এখনও ঘরের কোণে বসে রয়েছ! বেড়াতে বেরোও নি? এই যে ডাক্তার

জেঙ্কিন্স। ডাক্তার, আপনার রোগীকে বকুন ত—কিছুতেই ওঁকে পারা গেল না। এই দেখুন না, আপনাদের মানা সত্ত্বেও উনি এমন বিকেল বেলাটা বন্ধ ঘরের কোণে বসে আছেন! কেবল কাজ, কাজ, কাজ! শরীর না থাকলে কাজ করবে কে?"

ডিউক উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "ঐ শোন, ডাক্তার।" পরে ডচেসের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "কিন্তু তুমি এখনও বড় বেড়াতে যাও নি যে!"

ডচেস্ কহিলেন, "আমি ত একলা যাব না। তোমায় আজ সঙ্গে নিয়ে যাব। কাকা আমায় এক-খাঁচা পাখী পাঠিয়েছেন, তোমায় দেখাব, এসো কত রঙ-বেরঙের পাখী—ছোট ছোট চোখগুলি! যেন কে একজোড়া করে' কালো মুক্তো এঁটে দিয়েছে। ভারী সুন্দর, দেখবে এস।"

"চল" বলিয়া ডিউক উঠিয়া দাঁড়াইলেন; যাইবার সময় ডাক্তারকে বলিয়া গেলেন, "তুমি বসো, ডাক্তার আমি এখনই আসছি।"

ডিউক চলিয়া গেলে, জেঙ্কিন্স বসিয়া সমস্ত ঘরটায় একবার চোখ বুলাইয়া লইল। তাহার মনের ভিতর হইতে কিসের একটা জ্বালা ছুটিয়া বাহির হইতেছিল। সহসা ডিউকের চেয়ারের সম্মুখে টেবিলের ড্রয়ারের উপর তাহার নজর পড়িল। ড্রয়ারটা একটু খোলা রহিয়াছে এবং কলের মুখে রিঙে কয়টা চাবি লাগানো—চাবিটা সোনার। ডিউকের এতখানি অসতর্কতার কারণ আর কিছুই নয়—শুধু একটা গর্ব্বিত অবহেলা মাত্র! জেঙ্কিন্সের মনে হইল, চাবিটা যেন চীৎকার করিয়া বলিতেছে,—কাহার এমন সাহস হইবে যে আমায় স্পর্শ করে!

কাহার এমন সাহস! হাঁ, এত স্পর্দ্ধা! সে সাহস জেঙ্কিন্সের বিলক্ষণ আছে! কিসের ভয়!

জেঙ্কিন্স ড্রয়ার টানিল। ভিতরে বিস্তর কাগজ-পত্র, কিন্তু সবার উপরে ঐ যে একখানা চিঠি, খামে মোড়া—খামের গোড়াটা ছেঁড়া রহিয়াছে, ওটা!—খামের উপর বড় বড় পরিচিত অক্ষরে ডিউকের শিরো-নামা লেখা! জেঙ্কিন্সের প্রাণে কে যেন একটা তপ্ত লোহা ঠেকাইয়া দিল, প্রাণ তাহার জ্বলিয়া উঠিল। চারিদিকে চাহিয়া কম্পিত হস্তে সে খামখানা উঠাইয়া লইল। খাম খানার গায়ে তখনও একটা মিষ্ট গন্ধ মাখানো রহিয়াছে—চারিধার যেন হাজার ফুলের গন্ধে ভরিয়া উঠিল। জেঙ্কিন্স খামখানা হাতে লইয়া দেখিল, সত্য—তাহার সন্দেহ সত্যই তবে! তাই আজকাল ফেলিসিয়া ডাক্তারকে এতখানি অবজ্ঞা দেখাইতেছে, তাই আজ ডাক্তারের সহিত কথা কহিবারও ফেলি-সিয়ার এতটুকু অবসর মেলে না বটে! ভিতরে ভিতরে এতখানি তোমরা গড়িয়া তুলিয়াছ! ফেলিসিয়া, রাক্ষসী!

জেঙ্কিন্সের প্রাণে কে যেন বিষ ঢালিয়া দিল—সে বিষে সর্ব্বাঙ্গ তাহার জ্বলিয়া গেল। এই অপদার্থ ডিউক—এতটুকু যাহার প্রাণ নাই, মন নাই, ধনের গর্ব্বে দুনিয়াকে যে গ্রাহ্যও করে না—নারী যাহার কাছে ভোগের, খেলনা মাত্র—সেই ডিউকের কোন্ গুণে মুগ্ধ হইয়া ফেলিসিয়া এমন করিয়া আপনাকে তাহার হাতে তুলিয়া দিয়াছে! আর জেঙ্কিন্স? যে তাহার জন্য মরে—সেই জেঙ্কিন্সকে এমন নিষ্ঠুর উপেক্ষায় জর্জ্জরিত করিয়া, দগ্ধাইয়াও তোমার তৃপ্তি হইল না, ফেলিসিয়া? তাহার চেয়ে শত গুণ অযোগ্য:টাকায় গড়া প্রাণ-হীন একটা পুতুলকে লইয়া জেঙ্কিন্সের এত বড় প্রাণখানার পানে তুমি চাহিয়াও দেখ না! যে জেঙ্কিন্স তোমার মুখে এতটুকু হাসি দেখিতে পাইলে বর্ত্তাইয়া যায়—সেই জেঙ্কিন্সকে পরখ করিয়াও একবার দেখিলে না, নারী! হায় রূপ, হায় যৌবন, এত অন্ধ তুমি! এমনই সহস্র চিন্তা শরের মত জেঙ্কিন্সের বুকে বিঁধিতে লাগিল। রাগে

হিংসায় চোখ দুইটা তাহার জ্বলিয়া উঠিল, ভয়ে সে চিঠিখানা বাহির করিয়া পড়িতেও পারিল না।

না জানি, চিঠিতে কত কি লেখাই সে দেখিবে! প্রণয়ের কত না ললিত কাকলী, সোহাগের কত না মধুর বচন, কত না মান, কত অভিমান! এমন সময় বাহিরে জুতার শব্দ হইল। জেঙ্কিন্স চোরের মত শিহরিয়া উঠিল! তাড়াতাড়ি চিঠি-সমেত খামখানা ড্রয়ারে ফেলিয়া ড্রয়ারটা সে ঠেলিয়া বন্ধ করিয়া দিল। এক আগন্তুক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। জেঙ্কিন্স টেবিলের উপরকার ছোট ঘড়িটার উপর হইতে নজর ফিরাইয়া কহিল, "নবাব বাহাদুর যে, আসুন। তারপর কি মনে করে?"

"ডিউক বাহাদুর কোথায় গেলেন—আমি বাইরে ছিলুম, আমায় বলে গেলেন, এই ঘরে এসে অপেক্ষা কর্‌তে—"কথা শেষ করিয়া নবাব গর্ব্বিত শিরে ঘরের মধ্যে চারিধারে একবার দেখিয়া লইলেন। খাস-কামরা! ডিউকের 'খাস-কামরা! এ ঘরে ডিউক তাঁহার কোন সাধারণ বন্ধু-বান্ধবকে কখনও আনিয়া বসান না—এ ঘরে নবাব আজ এই প্রথম আসিবার অধিকার পাইয়াছেন। কৃতার্থতার গৌরব-গর্ব্বে নবাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন।

নবাবের উপর ডিউকের ইদানীং যথার্থই একটা আন্তরিক টান পড়িয়াছিল। তাহার কারণও ছিল,—নবাবের মত এই সাহস ও ভাগ্য গড়িবার শক্তিকে বরাবরই তিনি পছন্দ করিতেন। আরও বিশেষ পারির এই কায়দা-মাফিক সম্ভ্রান্ত সমাজের পার্শ্বে নবাবের এই উগ্র প্রকৃতি, শিশু-সুলভ সারল্য ও সীমাহীন শ্রদ্ধা ডিউককে একান্ত মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার উপর নবাব তাস খেলিতে সিদ্ধহস্ত —বাজী হারিয়াও দমিতে জানে না; ডিউকের ছবি চড়া-দরে কিনিতেও অত্যন্ত আগ্রহান্বিত—এই সব কারণেও নবাবের উপর ডিউকের স্নেহ

জন্মিয়াছিল। মায়াও পড়িল, যখন ডিউক দেখিলেন এই নিরীহ নবাবের বিরুদ্ধে সমস্ত পারি একটা ভীষণ বিদ্রোহ জাগাইয়া তুলিয়াছে, তাহাকে প্রতি পদে লাঞ্ছিত করিবার জন্য দারুণ চক্রান্ত করিয়াছে। তাহার সর্ব্বস্ব লুটিয়াও তাকে রক্ষা করিতে কেহ দাঁড়ায় না! নবাব একা—কেহ তাহার সহায় নাই। ডিউক মোরা অবশ্য এ চক্রান্তকারীর দলে যোগ দিলেন না।

জেঙ্কিন্স ও নবাব দুইজনেই ঈষৎ অপ্রতিভ হইলেন। কে কি কহিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া দুইজনেই বিপদে পড়িলেন। অথচ আলাপ-পরিচয় খুবই আছে—চুপ করিয়া বসিয়া থাকাও ভাল দেখায় না। কাজেই দুইজনে নিতান্ত অবান্তর দুই-একটা কথা কহিলেন মাত্র। সম্প্রতি উভয়ের সৌহার্দ্দ্যও হ্রাস পাইয়াছিল—জাঁস্নলে জেঙ্কিন্সকে স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, বেথলিহাম আশ্রমে তিনি আর একটি পয়সাও দিবেন না। নবাব এখন স্থির করিতে পারিলেন না, তিনি আজ ডিউককে যে কথা বলিতে আসিয়াছেন, সে কথাটা জেঙ্কিন্সের সম্মুখে তোলা সঙ্গত হইবে কি না! মেসেজার কাগজখানা কয়দিন ধরিয়া তাঁহাকে যে বিশ্রী গালি দিতে সুরু করিয়াছে, ডিউক তাহা দেখিয়াছেন কি না, দেখিয়া থাকিলে নবাবে প্রতি ডিউকের ধারণার কোনই পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না, তাহা জানিবার জন্যই নবাব আজ এখানে আসিয়াছেন। জানিবার প্রয়োজনও ছিল। কারণ নির্ব্বাচন-মঞ্জুরির সময়টা একেবারে আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সে দিন যে অভ্যর্থনা নবাবের অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল, তাহা পর্য্যাপ্ত হইলেও নবাব আজ ডিউকের আশ্বাস-লাভের জন্য একান্ত উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন।

এমন সময় ডিউক কক্ষে প্রবেশ করিলেন, নবাবের পানে সস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আন্তরিকতার সহিত তাঁহার কর কম্পন করিয়া কহিলেন, "জাঁস্নলে, আমার ভয় হচ্ছে, পারি তোমায় ঠিক উচিতমত

আদর করছে না—দারুণ ঘৃণা আর কুৎসা নিয়ে পারি আজ তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।"

নবাবের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "কিন্তু যা বলেছ, সব মিথ্যা! আপনি যদি দেখতেন—"

"আমি জানি—আমি সে নতুন গালাগালটা পড়েছি।"

"আপনি কি ও-সব বিশ্বাস করেন? সেই কথাটাই আমি জানতে এসেছি। সে জানলে আমি ঠাণ্ডা হতে পারি—আমি তার প্রমাণও এনেছি, আজ।"

ফিতায় বাঁধা একটা কাগজের বাণ্ডিল নবাবের হাতে ছিল। ফিতা খুলিয়া সেই বাণ্ডিলটা নবাব টেবিলের উপর তিনি ধরিলেন। ডিউক কহিলেন, "এ সব দলিল-প্রমাণের কোনই দরকার নেই, জাঁস্লে। আমি ও গালাগালের কথা বিশ্বাসও করি না। আমি বুঝতে পারছি অপর কোন লোকের সঙ্গে তোমাকে ওরা ভুল করে জড়িয়ে দিচ্ছে।"

ডিউক হাসিলেন, হাসিয়া আবার বলিলেন, "এ-সব খপর রাখার দরকার আমার আছে, তাই খোঁজও নিয়েছিলুম। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তোমার নির্ব্বাচন, কারও সাধ্য নেই, বন্ধ করে। তার পর একবার এটা কৌন্সিলের মঞ্জুর হয়ে যাক না—"

জাঁস্লে আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। তিনি কহিলেন, "যদি আমার এ নির্ব্বাচন ঘটে, তবে সে আপনার দয়াতেই ঘটবে। আমার কিন্তু সব বিশ্বাস সরে যাচ্ছে। বিশেষ শত্রুর দল ক্রমেই বাড়ছে। তার উপর, লি মার্কার—হেমারলিঙের চেলা। ব্যারণেস হেমারলিঙ্ত আগে ওরই হাতে খেলার পুতুল ছিল। সে মুসলমান ছিল বলেই লি মার্কার তাকে প্রকাশ্যভাবে বিয়ে করতে পারেনি—না হলে ওদের কথা টিউনিসের লোকের মুখে-মুখে ফিরত। লি মার্কারের জোরেই ত হেমারলিঙের আজ এত জোর!—"

"জাঁস্থলে—"

নবাব কহিলেন, "এ কথা তোলবার প্রয়োজনও ছিল না, আমার। এক হপ্তা আগেই ত আমার নির্ব্বাচন মঞ্জুর হবার কথা ছিল। কিন্তু ঐ লি মার্কারের রিপোর্ট তৈয়ের হয়নি বলেই দিন পেছিয়ে গেল। প্রতি মুহূর্ত্তেই এখন আমার ভয় বাড়ছে—আমার অবস্থাটা ভাবুন, একবার। আমার সমস্ত সম্পত্তি এই নির্ব্বাচনের উপর নির্ভর করছে। বে শুধু অপেক্ষা করে বসে আছে, কি হয়! তাহলেই সে লুটের উদ্যোগ করে! টিউনিসে আমার প্রায় আট লক্ষ টাকা পড়ে আছে—ডেপুটি হতে যদি না পারি, তবে তার সব সে হাত করবে। আমায় তখন পথের ভিখিরী হতে হবে।"

কথা শেষ করিয়া নবাব কপালের ঘাম মুছিলেন। ডিউক কহিলেন "ডেপুটি তোমায় করবই, আমি। আমার চেষ্টায় যতদূর হয়, তার কোন ত্রুটি হবে না। আমি যদি সে সময় রোগে শয্যাগতও থাকি, তবুও আমি যেমন করে পারি কৌন্সিলের সে মিটিংয়ে যাবই। আমায় দেখলে তোমার শত্রু-পক্ষ অনেকটা দমে যাবে, জাঁস্থলে, এ তুমি নিশ্চয় জেনো।"

নবাব এ কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন। তিনি কহিলেন, "ডিউক বাহাদুরের শরীর কি ভালো যাচ্ছে না?"

ডিউক হাসিয়া কহিলেন, "ডাক্তার জেঙ্কিন্সকে যখন এখানে দেখছ, তখন তা বুঝতে পাচ্ছ না? কি বল ডাক্তার? নাঃ, তবে অসুখ এমন কিছু নয়, শুধু কিছু কাহিল বলে নিজেকে মনে হচ্ছে। রক্ত নেই—তা ডাক্তার খানিকটা তাজা রক্ত দেবে বলে ভরসা দিচ্ছে। কি বল ডাক্তার, দেবে ত?"

নবাব কহিলেন, "যদি আমার শরীর থেকে রক্ত দিলে আপনার কোন উপকার হয়—এমন কি আমার সব রক্ত দিলেও যদি আপনাকে—"

ডিউক নবাবের মুখের পানে চাহিলেন—সে মুখে অকপট আন্তরিকতা জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল। ডিউক তাহা দেখিয়া প্রীত হইলেন, মুগ্ধ হইলেন,। ডিউক কহিলেন, "তা যদি নেওয়া যেত, জাঁস্লে, তাহলে দুজনেরই ভাল হত। তুমি এই যে এ সময় এতখানি উত্তেজিত হয়েছ, খানিকটা রক্ত দিলে তুমিও শান্ত হতে পারতে। কিন্তু সাবধান জাঁস্লে—রাগের সময় চট্ করে একটা বেফাঁস কিছু করে ফেলো না যেন। তারা এখন ঐটেই চায়। কিন্তু না, তোমায় খুব সাবধান হতে হবে। তুমি এখন দশের একজন—'পাব্লিকম্যান'! তোমার প্রতি অঙ্গ-ভঙ্গীটি অবধি লোকে এখন দূর থেকে লক্ষ্য করবে, তোমার চাউনিটি অবধি তারা বাদ দেবে না। আর ঐ খপরের কাগজে গালা-গাল! খপরের কাগজ পড়ো না, একেবারে পড়ো না। নিজেকে ঠিক রাখতে না পারো, চঞ্চল হও, তাহলে কাগজ পড়া বন্ধ করে দাও! অসভ্যগুলো আচ্ছা জব্দ হবে, দেখবে। জানো, আমি কি করেছিলুম—ঐ কন্কদ্দি বলে লোকটাকে নিয়ে? সে ক্লারিওনেট বাজায়। দশ বছর আমার পিছনে তার সে বাঁশী নিয়ে সে বাজিয়ে বেড়িয়েছে। দিন নেই, রাত নেই, কেবলি বাঁশীর আওয়াজ! জ্বালাতন হয়ে গেছলুম। তাকে বিদায় করবার জন্য তাকে টাকা দিয়েছি, ভয়ও দেখিয়েছি। কিন্তু কোন ফল হয়নি। পুলিশ? তাতে উল্টো উৎপত্তি হয়। শত্রুপক্ষ কাগজে অমনি বড় বড় প্যারা বার করতে থাকে। শেষে আমি একেবারে চুপ হয়ে গেলুম। তার দিকে ভ্রূক্ষেপও নয়। বাজাক সে, যত পারে চেঁচাক্!—আমি এতটুকু টলব না—ব্যস্! শেষে তাকে পাত-তাড়ি গুটোতে হল। এই কাগজওলাদের সঙ্গেও ঠিক সেই চাল ধর। যতক্ষণ অবধি ওরা বুঝবে, যে ওদের ওই সব লক্ষ্মীছাড়া বাঁদরামিতে তুমি কাতর হচ্ছ, চঞ্চল হচ্ছ, ততক্ষণ ওরা তোমার পিছনে ঘেউ ঘেউ করে মরবে, কিছুতে ছাড়বে না। তার পর তুমি আমার চাল ধর দেখি,—ওরা যখন বুঝবে,—

না, যত গালই দি, লোকটা ভ্রুক্ষেপও করে না, তখন আপনা-আপনিই সব থেমে যাবে। যাক্, এখন আমার এই কথা মেনে চলে দেখ দেখি! তারপর—হাঁ মনে আছে, কাল তিনটের সময় কমিটির মিটিং আছে? তাতে যেয়ো—নিশ্চয়।"

তারপর জেঙ্কিন্সের দিকে চাহিয়া ডিউক কহিলেন, "এখন ডাক্তার, তুমিও শোন, আমার ওষুধের ভাল রকম একটা ব্যবস্থা করে দাও। বেশ শক্ত-গোছ কিছু—"

জেঙ্কিন্স সহসা চমকিয়া উঠিল—এতক্ষণ সে যেন কি স্বপ্ন দেখিতেছিল। জেঙ্কিন্স কহিল, "হাঁ আমি তাই ভাবছিলুমও। বেশ, দেখে-শুনে নতুন একটা ওষুধেরই ব্যবস্থা এবার করব।"

নবাব ও জেঙ্কিন্স উভয়েই বিদায় গ্রহণ করিলে ডিউক ড্রয়ার খুলিয়া ফেলিসিয়ার পত্রখানা বাহির করিলেন। ডিউকের মুখে হাসি দেখা দিল। ডিউক আবার চিঠিখানা পড়িতে লাগিলেন।

* * * *

পরদিন কমিটির মিটিং সারিয়া নবাব যখন বাহিরে আসিলেন, তখন রোদ পড়িয়া গিয়াছে। বাহিরের অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণ-রশ্মিতে চারিধার রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে—বেশ শান্ত শীতল বাতাস বহিতেছিল। নবাব গাড়ী-ঘোড়া বিদায় করিয়া পদব্রজেই চলিলেন। দুই-চারিটা পথ বাঁকিয়া পার্কের সম্মুখে আসিয়া নবাব শুনিলেন, ফিরিওয়ালা হাঁকিতেছে, "মেসেজার। আজ সন্ধ্যার মেসেজার।" নবাবকে দেখিয়া কাগজের প্রকাণ্ড বোঝা পিঠে ফেলিয়া ফিরিওয়ালা তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিল, একখানা কাগজ আগাইয়া ধরিয়া কহিল, "আজকের মেসেজার, সাহেব—"

নবাব একবার ইতস্তত করিলেন,—না, কিনিবেন না। পরক্ষণেই

তাঁহার মনে হইল, সে কি—তিনি না দেশের একজন! একটা ক্ষুদ্র লোকের ক্ষুদ্র কুৎসাকে এতখানি ভয় করা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত নয় ত! এ দুর্ব্বলতার উর্দ্ধে তাঁহাকে উঠিতেই হইবে! নবাব পয়সা দিয়া একখানা কাগজ কিনিলেন। নিকটে পার্কের রেলিঙের ধারে একখানা বেঞ্চ ছিল। সেই বেঞ্চে বসিয়া নবাব কাগজ খুলিলেন। প্রাপ্ত-পত্র-কলমে তাঁহার নজর পড়িল। ঐ যে আবার নূতন গালি বাহির হইয়াছে। নবাবের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। তিনি পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। হাত দুইটা পৈশাচিক ক্রোধে নিস্পিস্ করিতে লাগিল। একবার —একবার সে পাষণ্ডকে যদি হাতের কাছে পাওয়া যায়—

নবাব চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। পথে অনেক লোক চলিয়াছে —সকলেই নিজেদের লইয়া ব্যস্ত। নবাবের পানে চাহিবার কাহারও অবসর ছিল না। নবাব উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

পার্কের চারিধারে তখন অসংখ্য গাড়ী আসিয়া জমিতেছে— ভিক্টোরিয়া, ব্রুহাম মৃদু গতিতে চলিতেছে। ভিতরে আরোহীদের সস্মিত প্রসন্ন মুখ। নবাব ভাবিলেন, কি সুখী ইহারা! কি নিশ্চিন্ত আরামে সব গ্রীষ্মের এ মাধুরী উপভোগ করিতেছে। আহা!

নবাব একদিকে চলিতে লাগিলেন। ও কি! সম্মুখে একটা কেব্রিয়লেটে এক তরুণী—রঙ-করা বিশ্রী মুখ, আর তাহারই পাশে ঐ যে মশার্দ—মশার্দই ত!

নবাব ছুটিয়া গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বজ্রগম্ভীর স্বরে হাঁকিলেন, "রোখো—"

নারীর হাতে ঘোড়ার রাশ ছিল। নারী সে হুঙ্কারে স্তম্ভিত হইল। গাড়ী থামিয়া পড়িল। মশার্দ কহিল, "চালাও।" নারী তখন আবার রাশ ধরিয়া টানিল; ঘোড়া চলিবার উপক্রম করিল।

নবাব আসিয়া ঘোড়ার মুখ ধরিলেন। ঘোড়া পা তুলিয়া পিছু হঠিবার চেষ্টা পাইল।

মশার্দ দেখিল, ব্যাপার সহজ নয়। তাহার ভয়ও হইল। সে কহিল, "ও নবাব। চালাও তুমি—আমি বলচি, চাল্লাও—"

রাশে আবার টান পড়িল। ঘোড়া কিন্তু অগ্রসর হয় না—নবাব তাহার সমস্ত শক্তি লইয়া ঘোড়ার মুখ ধরিয়া গাড়ী রুখিয়াছেন। মশার্দ কহিল, "লাগাও চাবুক—" নারী তখন দ্বিধামাত্র না করিয়া ঘোড়ার দীঘ চাবুকটা লইয়া নবাবের মুখের উপর শপাৎ করিয়া এক ঘা বসাইয়া দিল। নবাবের মাথা হইতে টুপিটা ছিটকাইয়া পড়িয়া গেল। নবাব পাগলের মত ক্ষেপিয়া উঠিয়া ঘোড়াকে দুই হাতে পিছনে ঠেলিয়া ধরিলেন। গাড়ী উলটিয়া যাইবার মত হইল। পরে গাড়ীর উপর উঠিয়া হিঁচড়াইয়া টানিয়া মশার্দকে গাড়ী হইতে নামাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেও লাফাইয়া পড়িলেন। মশার্দ উঠিবার চেষ্টা পাইতেছিল—নবাব বাঘের মতই তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন; অজস্র কিল চড় বর্ষণ করিয়া শেষে পদাঘাতে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া নবাব হাঁকিলেন, "রাস্কেল, এইবার তোমার আস্পর্দ্ধার শোধ হয়েছে ত?" মশার্দ কথা কহিতে পারিল না—ধূলায় গড়াইয়া পড়িল। নবাব তখন তাহাকে ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন; নিশ্বাস সজোরে বহিতেছিল। একজন কনেষ্টবল আসিয়া নবাবের পার্শ্বে দাঁড়াইল। নবাব তাহার হাতে কার্ড দিয়া কহিলেন, "বাণার্ড জাঁস্থলে—কর্সিকার ডেপুটি!"

উপস্থিত জনসঙ্ঘ বিচলিত হইয়া উঠিল। ডেপুটি! যে-সে লোক নয় তবে, দশের একজন!

জনতার সে বিস্ময়-কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য তিলার্দ্ধ সেথানে অপেক্ষা না করিয়া নবাব ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইলেন। মশার্দ তখন গায়ের

ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া সঙ্গিনীর সন্ধানে চোখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ছড়িয়া গিয়াছে, নাক দিয়া গল্ গল্ করিয়া রক্ত পড়িতেছে। পোষাক ছিঁড়িয়া কাদায় গা ভরিয়া গিয়াছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ছায়া

সেদিন রবিবার। ভোরের আলো ভাল করিয়া না ফুটিতেই বৃদ্ধ জুজের উল্লাস-চীৎকারে সারা গৃহে একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। "ও হেনরিতা, ওরে ও এলিস্, আয়, আয়, তোরা শীগ্‌গির আয়। মারানের নাটক থিয়েটার-ওলারা নিয়েছে। আঁদ্রে নিজে খপর দিতে এসেছে। ওঠ্, ওঠ্, ওরে, এদিকে আয়।"

আঁদ্রে কাল রাত্রেই এ সংবাদ পাইয়াছিল। ভ্যাভেঁা থিয়েটারের ম্যানেজার কার্দ্দিলাক কাল তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিয়াছে, নাটকখানি তাহাদের পছন্দ হইয়াছে; শীঘ্রই রিহার্সাল সুরু হইবে এবং এক মাসের মধ্যেই যাহাতে অভিনয় হয়, তারও বন্দোবস্ত চলিতেছে। তার পর দুইজনে বসিয়া কতক্ষণ ধরিয়া এই নাটক-অভিনয়েরই আলোচনা হইয়াছে। কি কি দৃশ্যপট নূতন করিয়া আঁকিতে হইবে, কাহাকে কি ভূমিকা দিলে ঠিক হয়, পোষাক-পরিচ্ছদই বা কেমন তৈয়ার করানো দরকার, এমনই সব কাজের কথা। তার পর থিয়েটার হইতে আঁদ্রে যখন গৃহে ফিরিল, তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। কাজেই এত বড় সুখবরটা জুজের বাড়ীতে আর দেওয়া ঘটে নাই। তবুও নিজের ঘরে যাইবার সময় আঁদ্রে জুজের দ্বারে কাণ পাতিয়া গিয়াছে, কেহ

জাগিয়া আছে কি না! কোন সাড়া নাই, শব্দ নাই—সকলে ঘুমাইয়াছে। কেহ জাগিয়া থাকিলে সেই রাত্রেই যে আঁদ্রে এ খপরটুকু নিশ্চয় দিয়া যাইত, সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ ছিল না। সারা রাত্রিটাই তাহার অত্যন্ত অধীর প্রতীক্ষায় কাটিয়া গিয়াছে। কখন্ ভোর হইবে, কখন সে গিয়া স্নেহশীল জুজের গৃহে এ সংবাদটুকু দিয়া বুকটাকে খালি করিবে! রাত্রে ঘুমও ভাল হয় নাই। কেবলই সে ভাবিয়াছে, এ আনন্দ একা আর ভোগ করা যাইতেছে না—এলিস, আলিন, জুজ, সকলের মধ্যে বাঁটিয়া না দিলেই নয়!

তাই সে প্রত্যুষে যেমনি নীচে জুজের গৃহের জানালা খোলার শব্দ শুনিল, অমনি ছুটিয়া নীচে নামিয়া আসিল। জুজ দাড়ি কামাইতেছিল। একটা গাল সাফ হইয়াছে, অপর গালে তখনও সাবান মাখানো—এমন সময় আঁদ্রে আসিয়া তাহাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ জুজ চমকিয়া উঠিল। এত ভোরে—আঁদ্রে? তাই ত? কি মনে করিয়া—! কোন অসুখ করে নাই ত? আঁদ্রে কহিল, "না, কোন অসুখ নয়। আমার নাটকখানা থিয়েটারওলারা নিয়েছে,—আর এক মাসের মধ্যেই তারা প্লে করবে।" জুজ আনন্দে যেন শিহরিয়া উঠিল। এঁ্যা, সত্য না কি! বাঃ—চাৎকার করিয়া সে তখন মেয়েদের ডাক দিল।

আঁদ্রের এতখানি আনন্দের যথেষ্ট কারণ ছিল। উপেক্ষিত যুবা নিভৃতে এককোণে পড়িয়া আপনার প্রাণ ঢালিয়া এই নাটকখানি লিখিয়া শেষ করিয়াছে। সাহিত্যের নেশা ভূতের মত তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। ইহারই জন্য নিজের মাকে অবধি সে ছাড়িয়া আসিয়াছে—ইহারই জন্য জেঙ্কিন্সের বিলাস-প্রচুর সজ্জিত-সুন্দর গৃহে আজ আর তাহার স্থান নাই। ভক্ত যেমন সর্ব্বত্যাগী হইয়া আপনার দেবতার তপস্যা করে, তেমনইভাবে আঁদ্রে এক কঠোর তপস্যায়

আপনাকে তন্ময় নিমগ্ন রাখিয়াছিল! আজ মিলিয়াছে, সিদ্ধি মিলিয়াছে রে, দেবীর প্রসাদ আজ সে লাভ করিয়াছে! এইবার তাহার নাটকের অভিনয় হইবে! পারির লোক থিয়েটারে আসিয়া জড়ো হইয়া তাহার পরিচয় পাইবে—গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া সাদরে তাহাকে বরণ করিয়া লইবে! কিন্তু শুধুই কি এই বরণটুকুর জন্যই সে কাতর! না—এ নাটক-অভিনয়ের মানে, তাহার অবস্থার পরিবর্ত্তন। চপলা লক্ষ্মীও এবার তাহার জীর্ণ গৃহে আসিয়া দেখা দিবেন—তাঁহার সস্মিত মুখের হাসির ছটায় দারিদ্র্যের আঁধারে-ঘেরা এই ঘর আলোর লহরে ভরিয়া উঠিবে। আর এলিস্—তাহার জীবনের ধ্রুবতারা, যাহার পানে চাহিয়া শত বিপদেও আপনাকে সে অটল রাখিয়াছে, অচপল রাখিয়াছে—সেই এলিসও এবার—

মেয়েরা ছুটিয়া আসিল। আলিন আসিয়া কহিল, "কি হয়েছে, বাবা, ডাকছ কেন? এই যে মস্যু আঁদ্রে—খপর কি?" আলিনের পিছনে এলিসও আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—অধরের কোণে মৃদু হাসির রেখা, নয়নে তাহার সরমে-কম্পিত দৃষ্টি!

জুজ কহিল, "আঁদ্রের 'বিদ্রোহ' এবার থিয়েটারে প্লে হবে রে।"

আলিন কহিল, "বাঃ,—তা আমাদের কি দিচ্ছেন, মস্যু আঁদ্রে? আমি ত গোড়া থেকেই বলছি, আপনার বই থিয়েটার-ওলারা নেবেই নেবে—কেমন, বলিনি?"

আলিনকে মৃদু স্বরে ধন্যবাদ দিয়া আঁদ্রে এলিসের পানে চকিতের জন্য একবার চাহিয়া দেখিল। সে মুখ সরমে রক্তিম, দৃষ্টি নত, নয়ন-পল্লব সঘন কম্পিত! আঁদ্রের শিরার মধ্য দিয়া বিদ্যুতের একটা মৃদু প্রবাহ ছুটিয়া গেল। আঁদ্রে জুজের পানে কোনমতে চোখ তুলিয়া চাহিয়া কহিল, "আপনার সঙ্গে আর একটা কথা আছে, আমার—"

"গোপনীয়---?" জুজ কহিল, "তাই ত, আমায় যে ভাবিয়ে দিলে হে তুমি--এঁ্যা—"তার পর আঁদ্রের কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে জুজ কহিল, "এদের যেতে বলব?"

আঁদ্রে কহিল, "সকলের সরবার দরকার নেই। এলিস বোধ হয়, এর কিছু জানে। আলিন সঠিক না জানলেও কতক বোঝে। তবে এরা---"

জুজ কহিল, "বেশ, এলিস আর আলিন থাকুক। তোরা একবার যা ত না---আবার ডাকলে আসিস্।"

সকলে কলরব করিতে করিতে চলিয়া গেল; ঘর স্তব্ধ হইল। জুজ অধীর আগ্রহে আঁদ্রের পানে চাহিয়া রহিল। আঁদ্রে একবার চারিধারে চাহিয়া লইল---তারপর সে আপনার মনের গোপন কথাটি—আজীবন-সঞ্চিত আশার কথা জুজের কাছে প্রকাশ করিল। আয়োজন দেখিয়া এলিসের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল! বুঝি, সেই কথাটাই! না জানি, জুজ শুনিয়া কি বলিবে? তাহার সারা অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। তবু সে শুনিল, আঁদ্রে আজ জুজের করুণার ভিখারী; তাহারই করুণার উপর আঁদ্রের সব---সমস্ত নির্ভর করিতেছে! আর কিছু নয়, সে শুধু এলিসের পাণি-প্রার্থী!

শুনিয়া জুজ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, "এ কি সম্ভব! আরে, আরে, মাষ্টার আঁদ্রে—তাই ত, এ কথা স্বপ্নেও যে কোনদিন আমি ভাবতে পারিনি। এঁ্যা!" কিন্তু না, বৃদ্ধ রহস্য করিতেছে। জুজ কহিল, "এ'ত খুব ভাল কথা আঁদ্রে! তোমাকে জামাই পাওয়া, বলতে কি,—এর কতক আভাস আমি আগেও পেয়েছি—অবশ্য অপরের কাছে এ-সম্বন্ধে কিছু শুনেও ছিলুম—"

এলিসের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। জুজ তাহা হইলে সব জানে! ছি, কি লজ্জা! সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতেও তাহার

লজ্জা হইতে লাগিল, অথচ চলিয়া যাইবার শক্তি নাই। পা দুইটা নড়িতে চায় না! কথাটা তবে জুজকে বলিল কে? আলিন নয় ত!

হাসিয়া আলিন কহিল, "তাহলে বলব, আমিই এর আভাষ বাবার কাণে তুলি। কেমন বাবা, নয় কি?" কথা শেষ করিয়া আলিন দুই হাতে এলিসকে জড়াইয়া ধরিল। আলিনের বুকে মুখ লুকাইতে পাইয়া এলিস বর্ত্তাইয়া গেল।

তার পর জুজের সহিত আঁদ্রের আরও দুই-চারিটা কথা হইল। বিবাহের পর আঁদ্রে ও এলিস উপর-তলার ঐ ঘরটিতেই থাকিবে, এ-বাড়ী ছাড়িয়া যাইবে না। আঁদ্রে ফটোগ্রাফির ব্যবসায় উঠাইয়া দিবে না—এবং 'বিদ্রোহের' অভিনয় হইতে সে যেরূপ লাভের আশা করিতেছে, তার যদি ব্যতিক্রম না হয়, তাহা হইলে সে কার-বারটাকেও সে ঐ টাকায় আরও ফাঁপাইয়া তুলিতে পারিবে। অর্থাৎ সংসার-সমুদ্রে তাহাদের দুইজনের জীবন-তরী দুইখানি দিব্য তাহারা বাহিয়া যাইবে—এই প্রসন্ন বায়ু ও অনুকূল স্রোত সহায় থাকিলে কোন ভয়ই নাই!

জুজের একটা ভাবনা হইল। সে কহিল, "কিন্তু তোমার মা-বাপ এ বিয়েয় মত দেবেন কি? ডাক্তার জেঙ্কিন্সের অত পয়সা, অমন মান-সম্ভ্রম!"

আঁদ্রের ললাটেও চিন্তার একটা রেখা ফুটিল। সে কহিল, "ওঁর কথা আর তুলবেন না, মশায়। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি—আমি তাঁর কি ধার ধারি যে তাঁকে ভয় করে চলতে হবে?" তার পর একটু থামিয়া আবার বলিল, "তবে আমার মা? তা মা আমায় মাঝে মাঝে দেখতে আসেন—যদিও ডাক্তার জেঙ্কিন্স তাঁকে এখানে আসতে মানা করেছে, তবুও মা সে মানা শোনেন নি ত। এলিসকে মা খুব পছন্দ করেন। আর আমার মা কেমন

লোক, আপনিও পরে দেখবেন। এলিসকে বরং জিজ্ঞাসা করতে পারেন। তবে আমার এই বড় দুঃখ হয় যে, ঐ পিশাচটা মার উপর এত অত্যাচার করে, অথচ আমি তার কোন প্রতিকার করতে পারি না—” আঁদ্রের মর্ম্মের ভিতর হইতে একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস উঠিল—তাহার প্রাণের মধ্যে যে জ্বালা, তাহা সে-ই জানে। সে জ্বালা জুড়াইতে পারে, শুধু এলিসের ঐ সুন্দর মুখের স্নিগ্ধ বাণী,—ঐ চপল নয়নের সস্মিত চাহনিটুকু!

আলিন কহিল, “বাবা, আজ তাহলে এক কাজ করা যাক, এস। এঁর নতুন নাটকের খাতিরে আজ আমরা লঙ্-সাম্পে্ বেড়াতে যাই, চল। কি বল? ওখানে চড়ি-ভাতি করব। আপনি কি বলেন, মসৃ আঁদ্রে?”

হেনরিতা, ইয়া—তাহারাও ইতিমধ্যে আসিয়া জুটিল। তাহারা বলিল, “আমরাও বেড়াতে যাব, দিদি। ও বাবা—”

জুজ কহিল, “বেশ মা—সবাই যাবে। তাহলে, আলিন, চড়িভাতির গোছ-গাছ করে নাও। আঁদ্রের কোন অসুবিধা হবে না ত?”

সেখানে এলিসের সঙ্গ পাইবে! অসুবিধা? আঁদ্রে কহিল, “কিছু না!”

জুজ কহিল, “তাহলে তুমি তৈরি হয়ে এস। আমরাও ঠিক হয়ে নি। তার পর রোদ ওঠবার আগেই একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ব—।”

আঁদ্রে বিদায় লইল। মেয়েরাও আপনাদিগকে সজ্জিত করিয়া সমস্ত গুছাইয়া লইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় পল আসিয়া উপস্থিত হইল। জুজ কহিল, “শুনেছ হে, একটা সুখপর আছে—কার্দ্দিলাক্‌রা আঁদ্রের নাটক অভিনয় করতে নিয়েছে।”

এ সংবাদ সকলের পূর্ব্বে পলই প্রথম পাইয়াছে! এ বিষয়ে

পরিশ্রমও কি সে কম করিয়াছে! কার্দ্দিলাক্‌কে ধরিয়া পলই ত নাটকখানি আগাগোড়া পড়াইয়াছে। আবার পড়াইয়াই তাহাকে ছাড়িয়া দেয় নাই, অভিনয়-আয়োজনে অর্থ-সাহায্যও বিশেষ রকম করিবে বলিয়া আশা দিয়াছে! তাই কার্দ্দিলাক এই নূতন লেখকের প্রথম নাটকের অভিনয়ে অতখানি ব্যগ্রতা ও উৎসাহ দেখাইতে উদ্যত হইয়াছে!

কিন্তু এ কথা পল কাহারও কাছে ভাঙ্গে নাই; এখানেও ভাঙ্গিল না। কার্দ্দিলাক্‌কেও সে প্রতিশ্রুত করাইয়া লইয়াছে, এ কথা যেন আর তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণে প্রবেশ না করে। তাই পল জুজের কথায় সহর্ষ বিস্ময় মাত্র প্রকাশ করিয়া নূতন নাটক ও তাহার লেখকের শুভ কামনা করিল। জুজ কহিল, "তুমি বসো, পল, আমি দু-একটা কাজ সেরে নি। আমরা আজ আঁদ্রের নতুন বইয়ের সম্মানের জন্য লঙ-সাম্পে চড়ি-ভাতি করতে চলেছি। আলিনের সাধ, নতুন নাটকের খাতির করা। আসলে কিন্তু অন্য কারণ আছে। আজ আঁদ্রে আমার কাছে তার সঙ্গে এলিসের বিয়ের কথা তুলেছিল—আমি তাতে মত দিয়েছি। তা তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে কি, না, কোন অসুবিধা হবে?"

"অসুবিধা আর কি! বেশ, তাহলে আমিও যাব।" তার পর কিছুক্ষণ থামিয়া পল কহিল, "তবে আমি শুধু বলতে এসেছিলুম, কিছুদিনের জন্য আপাততঃ আমি টিউনিসে চলেছি,—"

জুজ কহিল, "টিউনিসে,—হঠাৎ?"

পল কহিল, হাঁ, সে টিউনিসে চলিয়াছে। তাহাকে যাইতেই হইবে। নবাবকে এই রক্ত-লোলুপ ব্যাঘ্রগুলার মুখে রাখিয়াই তাহাকে যাইতে হইবে—উপায় নাই! না গেলে নয়! এখানে ডিউক মোরা আছেন, তিনি নবাবকে ইহাদের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবেন, এ আশা বিলক্ষণ আছে।

এমন সময় আলিন আসিয়া ডাকিল, "বাবা—" পরে পল্‌কে দেখিয়া থমকিয়া সে থামিয়া গেল। জুজ কহিল, "কি মা? এই যে পল। পলও আমাদের সঙ্গে যাবে, চড়ি-ভাতিতে যোগ দেবে।" আলিন কোন কথা বলিল না—তাহার মুখে স্বর ফুটিল না। পল তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, "আমায় তোমাদের চড়ি-ভাতির দলে নেবে, আলিন?"

আলিন কোনমতে কহিল, "বেশ ত!"

জুজ কহিল, "পল টিউনিসে যাচ্ছে, আলিন। কতদিন বাদে যে ফিরবে—"

আলিনকে কে যেন অতর্কিতে নিষ্ঠুর আঘাত করিল। মনের সে বেদনা চাপিয়া আলিন একেবারে পলের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "টিউনিসে?"

পল কহিল, "হাঁ, আলিন।"

আলিনের বুকের মধ্যে কে যেন কাঁদিয়া উঠিল। টিউনিসে! তাহার অর্থ কতদিনের অদর্শন! কতদিনের—!

জুজ কহিল, "হাঁ, ভাল কথা, তোমাদের টেরিটোরিয়েলের কি হল? কর্সিকার সে কারবার কেমন চলছে? এখনও যে নবাবের নাম দেখচি—তিনিই বোর্ডের চেয়ারম্যান আছেন। এই আলিবাবার দস্যু-গুহা থেকে নবাবকে টেনে বার করতে পারছ না? বার করা ভারী দরকার হয়ে পড়েছে, মোদ্দা—"

"আমি বুঝি সে, জুজ। কিন্তু মান নিয়ে ওখান থেকে এখন বেরুতে হলে ওতে অনেক টাকা ঢালতে হয়—প্রায় তিন লক্ষ টাকা! অত টাকা এখন হাতেও নেই। তাই আমি টিউনিসে যাচ্ছি—টাকার জোগাড় করতে শুধু। বে ত সর্ব্বস্ব গ্রাস করবার উদ্যোগ করেছে—দেখি, যদি তার গ্রাস থেকে কিছুও বার করে আনতে পারি! এখন তবু কিছু আদায়ের ভরসা আছে—নাহলে পরে—"

বাধা দিয়া জুজ কহিল, "হ্যাঁ তাহলে তুমি যাও, দু-একদিনের মধ্যেই বেরিয়ে পড়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, থলি ভরে টাকা আনো—আর সেই টাকায় নবাব বেচারাকে ঐ জোচ্চোরদের আড়ং, পাগানেত্তিদের দলের হাত থেকে উদ্ধার কর। মোদ্দা, আমি ভাবচি, হেমারলিঙ যে তোমাদের অমন শত্রু, সে ওতে লুকিয়ে খান-কতক শেয়ার কিনলে না যে—?"

আলিন কহিল, "আজ সকালে আমাদের এই আনন্দের মাঝখানে ও লোকটার নাম আর এনো না, বাবা।"

জুজ উত্তেজিতভাবে কহিল, "ঠিক বলেছিস মা। সে রাস্কেল,—তার কথা মনে হলে আমার যেন আর মোটেই জ্ঞান থাকে না। ভগবান এতও সইছেন!"

সহরের শেষে নদীর বালুময় উপকূলে বড় বড় গাছের ছায়ায় ঢাকা বিস্তীর্ণ প্রান্তর। এক ধারে গাড়ী চলিবার পাকা রাস্তা। বেলা পড়িলে এই পথে ধনী ও বিলাসীর গাড়ীর ভারী ভিড় লাগে—দলে দলে সকলে গাড়ী চড়িয়া এখানে বেড়াইতে আসে। পল এধারে আর ইহার পূর্ব্বে কখনও আসে নাই।

একটা ঝোপের ধারে চড়ি-ভাতির আয়োজন হইয়াছিল। সে আনন্দ শেষ করিয়া সকলে এই পথেই বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। পল ও আলিন সকলকে আগাইয়া আসিয়াছিল। এই বিচিত্র শোভায় দুইজনের প্রাণের মধ্যে কি এক অপূর্ব্ব পুলক মুঞ্জরিয়া উঠিয়াছিল! এমন সুখের স্বাদ পল আর পূর্ব্বে কখনও পায় নাই। এত সুখ পৃথিবীতে আছে, ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। আলিনের কোমল হাত খানি পলের হাতে মালার মত বিছাইয়া পড়িয়াছিল—ফুলের মালার মতই তেমনই মৃদু কোমল স্পর্শটুকু! দুইজনে ধীরপদে চারিধারের বিচিত্র

শোভার মধ্য দিয়া পথ চলিয়াছিল। জুজ, এলিস, আঁদ্রে, হেনরিতা প্রভৃতি পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে! এই দীর্ঘ সরল পথে বেড়াইতে বেড়াইতে পলের মনে হইল, তাহাদের সম্মুখে সংসারের দীর্ঘ পথটাও এমনই সরল সুন্দর পড়িয়া রহিয়াছে! কোথাও বাঁক নাই! সে পথে তাহারা দুইজনে এমনই শান্তি বুকে লইয়া, মিলনের নিবিড় বাহুপাশে পরস্পরকে এমনই বাঁধিয়া দুইজনের প্রাণের পরিপূর্ণ প্রেমের ছায়ায় ঢাকা এমনই শ্যামল স্নিগ্ধ পথে চলিয়া যাইবে! আলিনের বুকের মধ্যে এক নূতন রাগিণী সাড়া দিয়া উঠিয়াছিল—এক নূতন আবেশ! তাহার মন হইতে সকল দুর্ভাবনা আজ দূর হইয়া গিয়াছিল।

সহসা চলিতে চলিতে দুইজনে দেখিল, দূরে ছায়া-মূর্ত্তির মত দুইজন অশ্বারোহী পাশাপাশি চলিয়াছে। ক্রমে মূর্ত্তি একটু স্পষ্ট হইলে উভয়েই বুঝিল, তাহাদের একজন পুরুষ, অপরটি নারী। ঘোড়া ধীর পদে চলিয়াছে। ক্রমে মূর্ত্তি আরও স্পষ্টতর হইয়া উঠিল—অশ্বারোহী দুইজন ক্রমে আরও নিকটে অগ্রসর হইয়া গাছের অন্তরাল দিয়া প্রান্তর-মধ্যে প্রবেশ করিল—তখন তাহাদের আর চিনিতে বাকী রহিল না; কে! পুরুষটি ডিউক মোরা, আর নারী ফেলিসিয়া।

পলের মাথার মধ্যে রক্ত চন্‌চন্‌ করিয়া উঠিল। সে আলিনকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "চিনতে পারলে?"

আলিনও চিনিয়াছে—তাহার সমস্ত প্রাণ সুগভীর লজ্জায়, দারুণ বেদনায় ভরিয়া উঠিল। যাহাকে আমরা ভালবাসি, তাহাকে অন্যায় কিছু করিতে দেখিলে মনে যে ভাব হয়, আলিনেরও সেইরূপ হইল। সে শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "বেচারী ফেলিসিয়া!"

ফেলিসিয়াকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হইলেও কথাটা পলের মনে কাঁটার মত বিঁধিল। এই ফেলিসিয়ার উপর কতখানি তাহার বিশ্বাস

ছিল! সে বিশ্বাসে প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে, আজ! তবুও এ বেদনার মধ্যে একটা আরাম ইহাই ছিল যে দুর্ভাগিনী ফেলিসিয়ার জন্য আলিনের নির্ম্মল প্রাণ এতখানি কাতর, পীড়িত! এ সমবেদনায় পল আজ আলিনের প্রাণের যে পরিচয় পাইল, তাহাতে সে জুড়াইয়া গেল।

বেদনার এই স্তব্ধ ভাবটা কাটাইবার অভিপ্রায়ে পল নবাবের কথা ও সেই প্রসঙ্গে তাহার নিজের টিউনিস যাইবার কথা পাড়িল। আলিন কহিল, "তুমি চিঠি লিখো কিন্তু, পল, বেশ বড়-বড় চিঠি। যা দেখবে, শুনবে, সব খুলে লিখো। আমরা এখানে বসে তোমার চিঠি থেকে সে দেশের পরিচয় নেব। বাবার নামেই কিন্তু সব চিঠি লিখো।"

এই সতর্কতায় পল আর একটা গোপন বিষয়ের যথেষ্ট ইঙ্গিত পাইল। সে কথাটা স্পষ্ট করিয়া কোনদিন সে জানিতে পারে নাই। আজ এ সতর্কতার আয়োজন দেখিয়া তাহার অনেকখানি দ্বিধা, অনেকটা সঙ্কোচ কাটিয়া গেল! সে সাহস পাইয়া আলিনের হাতখানি নিজের হাতে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আমি কি ভাবছিলুম, জানো, আলিন? আমার মনে বড় অশান্তি। তুমিই শুধু তা ঘুচোতে পার। যদি তোমার দয়া হয়, যদি তুমি আমায় তোমার দয়ার অযোগ্য না ভাব, আলিন—তাহলে আরও একটা কথা বলি, শোনো। আমি একটা গুরুতর অন্যায় করেছি। আমার বুক ভেঙ্গে যেত, কিন্তু একটা জিনিষ এ বুকটাকে ঠিক রেখেছে। সে কি, জানো—?"

পল বুকের পকেট হইতে ফ্রেমে বাঁধা ছোট একখানি ছবি বাহির করিল—পেন্সিলে আঁকা সুন্দর একখানি মুখের ছবি! আলিন মুহূর্ত্তে সে মুখ চিনিতে পারিল। তাহার চোখ জলে ভরিয়া আসিল। এ তাহারই মুখ! ফেলিসিয়া একদিন তাহাকে বসাইয়া পেন্সিল দিয়া স্কেচ্ করিয়া লইয়াছিল। আড়ম্বর-হীন সারল্যে মণ্ডিত ছোট্ট সুন্দর মুখখানি!

পল কহিল, "এ ছবি আমার—ফেলিসিয়া আমায় দিয়েছে। আজ আমি চলে যাচ্ছি, তাই বলছি, এ ছবি কাছে রাখতে আমার বড় আনন্দ হয়, যদি নিজের হাতে এ ছবি আমার বুকে তুমি তুলে দাও। পরের কাছ থেকে এ ছবি পাবার কোন অধিকার নেই আমার। সে আমি চাই-ও না। নাও, আলিন—তোমায় আজ এ ছবি আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি। তোমার অনুমতি না পেলে এ ছবি রাখবার অধিকার আমার থাকতেও পারে না। যদি তুমি আমার চেয়ে যোগ্যতর কোন বন্ধুকে এ ছবি দিয়ে সুখী হও, তাহলে এ ছবি তাকেই দিয়ো। আর,—আর যদি তোমার মনে হয়—"

পল কথাটা শেষ করিতে পারিল না। আলিনেরও কেমন সব গোল হইয়া যাইতেছিল। গেবির পানে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া সে কহিল, "যদি আমার মনের কথা জানতে, পল—তাহলে এর উত্তরের জন্য কখনই তোমায় এ-রকম ভাবে অপেক্ষা করতে হত না। তুমি যদি আমায় ভালবেসে থাকো ত, যেমন তুমি বলছ, তাহলে আমিই বা তোমায় না ভালবেসে থাকি কি করে, পল? তবে তুমি ত জানো, আমি স্বাধীন নই—আমাকে আর-একটা সংসার মাথায় করে থাকতে হয়েছে। দেখ, চেয়ে দেখ—"

পিছনে অদূরে জুজ, এলিস, হেনরিতা প্রভৃতি আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। আলিন তাহাদের পানে লক্ষ্য করিল।

পল কহিল, "আমিও স্বাধীন নই, আলিন। তোমার মত আমারও শত কাজ, সহস্র দায়িত্ব আছে। তোমার সংসার থেকে আমি তোমায় বিচ্যুত করতে চাই না, আলিন। তুমি যেমন আছ, তেমনই থাকো, তবে শুধু আমায়— আমায়—"

কৃতজ্ঞতায় আলিনের প্রাণ ভরিয়া উঠিল। সে কহিল, "এত দয়া! পল, আমি বড় ভাবনায় পড়েছিলুম, সে ভাবনার হাত থেকে আজ তুমি

মুক্তি দিলে। তোমার আলিন তোমার কাছে আলিন, আর এ সংসারে সে সবার কর্ত্রী—তাই সে থাক্‌বে? তবে ও ছবি তোমার কাছেই রাখো—আমি নিজের হাতে তোমায় দিচ্ছি। শুধু ছবি নয়—আমি নিজেকেও আজ তোমার হাতে দিয়ে দিলুম—যদি তোমার নিতে কোন আপত্তি না থাকে, নাও পল, আমায় নাও। আমার সর্ব্বস্ব, আমার মন, আজ থেকে সব তোমার—তোমারই শুধু।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মেঘ-সঞ্চার

মশাদের সহিত পথে সেদিন সে কাণ্ডটা ঘটিয়া যাইবার প্রায় সাত দিন পরে নবাব ডিউকের প্রাসাদে চলিলেন। সেদিন বৃহস্পতিবার, এ কয়দিন ইচ্ছা থাকিলেও নবাব ডিউকের দ্বারে হাজিরা দিতে একটু ইতস্তত করিতে ছিলেন। সে ঘটনা পল্লবিত হইয়া ডিউকের কানে নিশ্চয়ই পৌঁছিয়াছে! ডিউক অমন ভাবে নিষেধ করিয়া দিবার পরও নবাবের ধৈর্য্যচুতি হওয়া ঠিক হয় নাই। ডিউক ইহাতে নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই অসন্তোষের মাত্রা টাট্‌কা থাকিতেই ডিউকের সঙ্গে দেখা করিতে নবাবের সাহস হইল না। অথচ দেখা না করিলেও নয়! লি-মার্কার তাহার রিপোর্ট লিখিয়া শেষ করিয়াছে, লোকের মুখে এ সংবাদও রাষ্ট্র হইয়াছে। সে রিপোর্টে যুক্তি যত না থাকুক, নবাবের বিরুদ্ধে তীব্র অপবাদের ভাষা যে প্রচুর সঞ্চিত আছে, এ খপরটুকুও নবাবের কানে তাঁহার দুই-চারিজন তথাকথিত হিতৈষী বন্ধু অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিয়া যাইতে ভোল

নাই! এখন নবাবের পক্ষে ডেপুটি নির্ব্বাচিত হওয়ার আশা খুবই কম—তবে ডিউক মোরা তাঁহার সহায়! কাজেই নবাব হাল ছাড়িতে পারেন নাই। আজ তাই সব দ্বিধা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া নবাব ডিউকের প্রাসাদে চলিয়া ছিলেন।

প্রাসাদের অদূরে পথে অসংখ্য গাড়ী। গাড়ীর সার প্রাসাদ পর্য্যন্ত লাইন-বন্দী দঁড়াইয়া গিয়াছে। সে গাড়ার ভিড়ে নবাবের গাড়ার গতি মন্থর হইয়া পড়িল; নবাব বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন। তাই ত! এ যে অসংখ্য গাড়ী! ব্যাপার কি! কোন মজলিসের আয়োজন হইয়াছে না কি! কৈ, নবাব ইহার কোন সংবাদ প্পান নাই ত। তবে তাঁহাকে—? না, তাহা হইলে আজ আর যাওয়া ঠিক হয় না। গাড়ী ফেরানো যাক্! একটা উদ্বেগে নবাবের বুক কাঁপিয়া উঠিল। নিজের উপর রাগও হইল। সেদিন মশার্দকে উপেক্ষা করিলে কি ক্ষতি ছিল! তাহাকে চাব্‌কাইয়াও ত বিশেষ কোন লাভ হয় নাই। ক্ষতি যেটুকু করিবার, তাহা ত সে করিয়াছে। লি-মার্কারের কলমের একটি খোঁচায় নবাবের সমস্ত জীবনটাই বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে! তবু ডিউক তাঁহার সহায় ছিলেন! মশার্দকে সেদিন চাব্‌কাইবার ফলে সেই ডিউক আজ তাঁহার উপর বিরূপ হইলেন—এতখানি বিরূপ যে, মজলিসে তাঁহাকে একটা ডাক দিতেও ভুলিয়া গেলেন! অনুশোচনায় নবাবের প্রাণটা হায়-হায় করিতে লাগিল।

তিনি কোচম্যানকে গাড়ী ফিরাইতে বলিবেন, এমন সময় দুইজন পথিকের কথা তাঁহার কানে গেল। দুজনেরই মুখের ভাব বিশেষ উদ্বিগ্ন। একজন কহিল, "এ যাত্রা তাহলে রক্ষা পাওয়া দায়।" অপর জন কহিল, "তা আর বলতে! কিন্তু হঠাৎ এমনটা হবে, কে ভেবেছিল!"

প্রথম পথিক কহিল, "দোষে-গুণে ডিউক একটা মানুষের মত মানুষ ছিলেন, কিন্তু।"

এ কি কথা! কাহার অসুখ যে এমন অবস্থা! ডিউকের না কি! পথিক দুইজন ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছে, নবাবের গাড়ীও ডিউকের ফটকের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। নবাব মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, ফটক হইতে বাহির হইয়া ডিউকেরই এক ভৃত্য শশব্যস্তে ছুটিয়াছে। নবাব তাহাকে ডাকিয়া কম্পিত স্বরে কহিলেন, "ডিউকের অসুখ না কি?"

ভৃত্যটা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল, "বাঁচেন কি না সন্দেহ! ডাক্তারে বাড়ী অমনি গিস্-গিস্ করছে। কত ডাক্তারই আসছে-যাচ্ছে! দু-একজন স্পষ্ট জবাব দিয়েও গেছে।"

সমস্ত প্রাসাদটা যদি সেই মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া নবাবের মাথায় পড়িত, তাহার আঘাতও বুঝি তাঁহাকে এত বাজিত না। নবাবের চোখের সম্মুখে কে যেন প্রকাণ্ড একখানা ঘষা-কাচের পরদা তুলিয়া ধরিল সমস্ত বাহ্য দৃশ্য চকিতে কোথা মিলাইয়া গেল। বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল। নবাব একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া গাড়ী হইতে নামিলেন। পা তাঁহার টলিতেছিল—মাথার মধ্যে যেন একখানা চাকা ঘুরিতেছিল। কোনমতে পা-দুইখানাকে টানিয়া প্রাসাদের হলে আসিয়া হতাশভাবে নবাব একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। মুখ ঘামিয়া উঠিয়াছে! রুমালে ঘাম মুছিয়া নবাব ভাবিলেন, "তাহলে আমারও সব আশা নির্ম্মূল হয়ে গেল! যাক্, সব শেষ!"

মৃত্যু আজ ডিউকের শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অত্যন্ত অতর্কিতভাবেই সে আসিয়া দেখা দিয়াছে। রবিবার ডিউক যখন বেড়াইয়া ফিরিলেন, তখন তাঁহার মাথাটা অল্প ভার বোধ হইতেছিল। ক্রমে নাড়ীগুলা অসহ্য বেদনায় টন্‌টন্ করিতে লাগিল। সমস্ত শরীরের মধ্যে কে যেন তপ্ত লৌহ ফুটাইয়া দিতেছে, এমনই বেদনা। রাত্রে ঘুম নাই—বিছানায় পড়িয়া সারা রাত্রি ডিউক ছটফট করিলেন।

ডাক্তার জেঙ্কিন্সকে তখন-ই খবর পাঠানো হইল। ডাক্তার আসিয়া ঘুমের ঔষধ দিলেন; তাহার ফলে শেষ-রাত্রিটা ডিউকের কেমন ঘোর আসিল। পরদিন সকালে আবার রুদ্ধ যন্ত্রণা দ্বিগুণ আক্রোশে ফুঁসিয়া উঠিল। বরফ আনো—বরফ! সারাদিন মাথায় গায়ে বরফ চাপাইয়া সে জ্বালা জুড়াইবার চেষ্টায় ভৃত্যের দল হিম্‌সিম্ খাইয়া গেল। তবুও সে জ্বালা জুড়ায় কি। ডিউকের প্রাণখানা যেন তাতিয়া গলিয়া বাহির হইবে! জেঙ্কিন্স ঘর-ঘড়ি ঔষধ বদলাইতে লাগিল, কিন্তু কোন ফলই হইল না।

বাহিরে সংবাদটা তত রাষ্ট্র হয় নাই। জেঙ্কিন্স ইচ্ছা করিয়াই ব্যাপারটাকে লঘু বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। ডিউকের বন্ধুর দল জেঙ্কিন্সের সে আশ্বাসে একরূপ চুপ করিয়াই বসিয়া ছিল। পরে তৃতীয় দিন সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গিল, চোখ চাহিয়া ডিউক দেখিলেন, মাথার বালিশে রক্তের একটা রেখা সুতার মতই জমিয়া রহিয়াছে! দাড়িতে ও ঠোঁটে শুকানো রক্ত! তিনি চমকিয়া উঠিলেন। মানব-জীবনের এই চরমতম দুর্ভাগ্য, রোগের এই বীভৎসতা লক্ষ্য করিয়া ডিউকের হাত-পা, সমস্ত অঙ্গ ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল! মপার্ভ জেঙ্কিন্সের পিছনে দাঁড়াইয়া এই রক্ত লক্ষ্য করিয়া শিহরিয়া উঠিল; ডিউকের মুখের দিকে একবার করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া তাঁহার অলক্ষ্যে জেঙ্কিন্সকে বাহিরে আসিবার জন্য সে ইঙ্গিত করিল।

জেঙ্কিন্স বাহিরে আসিলে মপার্ভ কহিল, "ডিউকের অসুখটা ত এবার বড় বেশী দেখছি, ডাক্তার!"

জেঙ্কিন্স মৃদুস্বরে কহিল, "আমারও আজ ভয় হচ্ছে।"

"এ রোগটা হঠাৎ দাঁড়াল কি করে?"

ডাক্তার ঈষৎ কুপিত স্বরে কহিল, "এরই জন্য আজীবন সাধনা করে আসছেন যে! তাহলেও যখন বয়স কম ছিল, তখন এ-সব

অত্যাচার সইত, এখন সইবে কেন? এই বদ-খেয়ালির জন্যই প্রাণটা আজ যেতে বসেছে।"

দারুণ হিংসায় ডাক্তারের প্রাণ জ্বলিতেছিল। কথাটার মধ্যে তাই প্রাণের সেই সমস্ত জ্বালা সে মিশাইয়া দিয়াছিল! জেঙ্কিন্সের প্রাণে যেমন ঘা দিয়াছ, তেমনি তাহার ফল ফলিয়াছে ত!

পরক্ষণেই কিন্তু সুর বদলাইয়া ক্ষুব্ধভাবে জেঙ্কিন্স কহিল, "বেচারা—বেচারা ডিউক! না, আমি ত কোনই আশা দেখচি না, ম্যাসিয়ো—"

এ কথায় মপার্ভঁর প্রাণে প্রকৃতই বেদনা লাগিয়াছিল। সে কহিল, "শোনো, এত-বড় দায়িত্বের ব্যাপার নিজের হাতে রেখে ভাল করছ না, ডাক্তার জেঙ্কিন্স। এত বাড়াবাড়ি অসুখ—অথচ দ্বিতীয় একজন ডাক্তার ডাকা হয় নি—একটা পরামর্শ করবারও কারও সঙ্গে দরকার বোধ করছ না—!"

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তার কহিল, "বিশেষ ফল যে তাতে পাওয়া যাবে—"

সে কথায় বাধা দিয়া মপার্ভঁ কহিল, "তবু আমাদের মনে একটা সান্ত্বনা চাই ত! ব্রিসে, জুস্‌লিন, বুশাঁর, এঁদের একবার এখনই ডাকা হোক!"

জেঙ্কিন্স কহিল, "কিন্তু ডিউক তাতে ভয় পাবেন না?"

মপার্ভঁ বিরক্ত হইল, চড়া গলায় কহিল, "ভয়! ডাক্তার, তুমি জানো না, ডিউক মোরা আর আমি, দুজনে ভয় কাকে বলে, কখনও জানিনি। যাক্—মোরা ভয় পাবে ভেবে একটা চেষ্টা-চরিত্র অবধি আমরা করব না! আশ্চর্য্য! না, না, ব্রিসে, জুস্‌লিন—এঁদের এখনই ডাকাও। আমি নিজে ডিউককে বলচি, যে আমরা আরও পাঁচজন ডাক্তার ডাকাচ্ছি। রোগটা কি, সকলে মিলে ধরে দিক্—তারপর সকলের পরামর্শ-মত চিকিৎসা চলবে।"

সন্ধ্যার সময় প্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে ডাক্তারদের কমিটি বসিল। পরামর্শ গোপনেই চলিল। সেথানে একটি প্রাণীরও প্রবেশাধিকার ছিল না। ডিউক নিজে ডাক্তার আনাইতে মত দিয়াছিলেন। রোগের যন্ত্রণা তাঁহার সহ্য হয়, তবে এই রোগ যে সাধারণ মানুষের সহিত এক পংক্তিতে তাঁহাকে বসাইতে চায়, এই দুঃখই সব চেয়ে অসহ্য!

তাই ডাক্তারী বৈঠকে পরামর্শের আজ এত ধুম! ডাক্তারদের মুখ গম্ভীর—মুখে কথাও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত! কিন্তু হায়, এতখানি গাম্ভীর্য্যও ডিউকের যন্ত্রণা লাঘব করিতে সক্ষম নয়, আরোগ্য দান ত দূরের কথা!

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ডাক্তারের দল গম্ভীরতর মুখে ডিউকের কক্ষে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। বিচার-প্রার্থী অপরাধীর মত ডিউক করুণভাবে তাঁহাদের পানে চাহিলেন। না জানি, ইঁহারা কি বলিবেন! অবাধ মুক্ত আরোগ্যের আভাষ, না, কঠোর কঠিন মৃত্যুদণ্ড! ডাক্তারদের নীরব গম্ভীর ভাব দেখিয়া ডিউক কহিলেন, "আপনাদের শাস্ত্র কি বলে, বলুন?"

ডাক্তারের দল অস্পষ্ট জড়িতভাবে উৎসাহ-আশ্বাসের দুইটা মৃদু বাণী বলিলেন—টাকা খাইয়াছেন বিস্তর, তার বিনিময়ে এটুকু না দিলে অধর্ম্ম হইবে! তার পর তাঁহারা ডিউকের করকম্পন করিয়া সিগার ধরাইয়া বিদায় লইলেন। মপার্ভ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। জেঙ্কিন্স ও পুরাতন ভৃত্য লুই ডিউকের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। ডিউক জেঙ্কিন্সকে ডাকিয়া একটা কথাও কহিলেন না। তিনি জানিতেন, প্রশ্ন করিলেও এ ব্যবসায়ীদের কাছ হইতে সত্য কথা কিছুতেই আদায় হইবে না। তাই আর বৃথা কথা বাড়াইতে তাঁহার এতটুকু আগ্রহ বা ইচ্ছা ছিল না। মপার্ভ ফিরিয়া আসিলে

ডিউক তাহাকে কাছে ডাকিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে লুকোচুরি করবে না, জানি ভাই! যত কঠোর হোক্, সত্য কথাটা বল দেখি। ডাক্তারেরা কি বলে গেল? আমার আর কোন আশা নেই,—না?"

মপার্ভ মুহূর্ত্তের জন্য স্থিরভাবে ডিউকের পানে চাহিয়া রহিল; তারপর উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল, "কোন আশা দেয় না, ওরা, মোরা।"

ডিউক অবিচলিতভাবেই এ কথা শুনিলেন, শুনিয়া বলিলেন, "হুঁ—" তারপর চেষ্টা-সত্ত্বেও একটা দীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহার বুকের মধ্য হইতে ছুটিয়া বাহির হইল। আর আশা নাই! এবার তাহা হইলে প্রস্তুত হইয়া লও!

তারপর চকিতে ডিউক দেখিলেন, জীবনে যাহা কিছু তাঁহার প্রিয় ছিল,—ক্ষমতা, সম্মান, ঐশ্বর্য্য—এই বিপুল সমারোহ, সব কোথায় সরিয়া গিয়াছে! সেগুলা আর তাঁহার আয়ত্তে নাই—অতীতের সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে! এত বড় আঘাতের বেদনা এড়াইতে অনেকখানি শক্তির প্রয়োজন। সে শক্তি যেন সকলই কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। এত ঐশ্বর্য্য, এত ক্ষমতা, কিছুই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না! হারে মানুষের অক্ষম দুর্ব্বলতা! ভিতরটা তাঁহার অশ্রুর সাগরে ডুবিয়া গেল। কিন্তু না, এ শেষ মুহূর্ত্তে কেন এ কাতর অশ্রু! যে দম্ভ লইয়া আজীবন তিনি কাটাইয়া দিয়াছেন, আজ কেন সে দম্ভকে দূর করিয়া দিবেন! লোকে দেখিবে, ডিউক কাতর হইয়াছেন? না, তাহারা হাসিবে। ডিউকও তবে সাধারণ মানুষের মত মৃত্যুর নামে ভয় পান্! না, কখনই নয়! জীবনে দম্ভের যে ডঙ্কা সমানে বাজাইয়া আসিয়াছেন, এখনও সেই ডঙ্কা বাজাইয়া মৃত্যুর হাতে তিনি আত্মসমর্পণ করিবেন! মৃত্যু ত আসিবেই—ঐ বাগানের অসংখ্য গাছের একটি পাতা,

একটি পল্লবও না ভাঙ্গিয়া, মর্ম্মর সোপানে সুরক্ষিত ফুলগাছগুলার ফুলের একটি দলও ছিন্ন না করিয়া মৃত্যু তাহার কঠোর কর বাড়াইয়া আসিবেই! নীরবে চরণ ফেলিয়া, কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খলা না ঘটাইয়া সে আসিয়া ডিউকের শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিবে, "এস—" তখনি যাইতেই হইবে! কেহ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না! সর্ব্বস্ব দিয়াও নয়। ডিউক তখন চোখের জল ফেলিবেন? না। ডিউক বালিসে চোখ মুছিলেন, মনে মনে ভাবিলেন, আমি প্রস্তুত—ওগো মৃত্যু, প্রস্তুত! চল, কোথায় লইয়া যাইবে? তাঁহার মত মানুষের পক্ষে ইহাই ত যোগ্য তিরোধান ক্ষিপ্র, অবিচল, অতর্কিত!

ডিউক মপার্ভঁকে ডাকিয়া কতকগুলা নামের তালিকা দিলেন, ইহাদিগের সহিত তিনি একবার শেষ দেখা করিতে চান! তখনই তাহাদের কাছে লোক ছুটিল। তারপর জেঙ্কিন্সকে তিনি কহিলেন, "কালকের দিনটা বেঁচে থাকব কি না, বলতে পার, ডাক্তার? একটু যেন বল পাচ্ছি। কিন্তু এ বলটুকু কতক্ষণের জন্য?"

লুই একবার অগ্রসর হইয়া কহিল, "ডচেস্ একবার আসতে চান—তিনি বড় অস্থির হয়ে পড়েছেন।"

ডিউক কহিলেন, "দাঁড়াও, একটু অপেক্ষা করতে বল। এ-দিককার কাজগুলো একবার গুছিয়ে নি, আগে—" তারপর ডিউক বলিলেন, "মপার্ভঁ, ঐ ড্রয়ারটা খোল। ওতে যত চিঠি-পত্র আছে, সব বার করে আমার সামনে পুড়িয়ে ফেলো। না, ওখানে হবে না—অনেক চিঠি। বাইরে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলো। তুমি হাজির থেকো, দেখো, সমস্তগুলো যেন ঠিক পোড়ানো হয়—"

জেঙ্কিন্স দুই পা আগাইয়া আসিয়া কহিল, "চলুন, আমিও নয় সাহায্য করছি। চট্‌পট্ হয়ে যাবে'খন।"

ড্রয়ার খুলিয়া চিঠির একটা প্রকাণ্ড তাড়া লইয়া মপার্ভ ও জেঙ্কিন্স বাহিরে আসিল। রঙ-বেরঙের খামে মোড়া অসংখ্য চিঠি! এখনও মধুর পুষ্প-সুরভি তাহাদের অঙ্গে মাখানো রহিয়াছে—সবগুলাই প্রেমপত্র। কোনটাতে কোন সাহসিকা আপনার প্রাণের ব্যাকুল নিবেদন ঢালিয়া দিয়াছে, কোনটা বা উপেক্ষিতা অভিমানিনীর মৃদু ভর্ৎসনার সুরে ভরা! জেঙ্কিন্স চিঠি বাছিতেছিল—এবং মপার্ভ আগুনে ধরিয়া তাহার সৎকার করিতেছিল। সেই অবসরে ঈষৎ সতর্কভাবে দুই-চারিখানা চিঠির উপর চোখ বুলাইয়া লইতে জেঙ্কিন্স ভুলিয়া যায় নাই। যেন পুষ্প-সুরভির মধ্যে ভাবার কি স্নিগ্ধ সুর ভাসিয়া উঠিয়াছে! যেন এ গোলাপ-কুঞ্জের মধ্যে বসিয়া বিচিত্র পাখীর দল করুণ কাকলী তুলিয়াছে! হঠাৎ দুইখানা চিঠি হাতে করিয়া জেঙ্কিন্স চমকিয়া উঠিল। বড় পরিচিত হস্তাক্ষর! মপার্ভের পানে মৃদু কটাক্ষপাত করিয়া তাহার অলক্ষ্যে চিঠি দুইখানা সে পড়িতে আরম্ভ করিল। মপার্ভের সেদিকে দৃষ্টি পড়িল। মপার্ভ কহিল, "ওহে ডাক্তার, তুমি যদি এমন করে সব চিঠি পড়তে বসো, তাহলে এক মাসেও এ চিঠি পোড়ানো হবে না।"

জেঙ্কিন্সের গাল দুইটা লাল হইয়া উঠিল। চিঠি দুইখানা আগাগোড়া পড়িয়া লইবার উৎকট বাসনা তাহার মনের মধ্যে গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল। তবু মপার্ভের এ কথার পর আর তাহা পড়া ভালো দেখায় না! মপার্ভের মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে! না জানি, জেঙ্কিন্স কোন্ হারামণির সন্ধান করিতেছে! সে তখন সেই চিঠি দুইখানা একধারে ঠেলিয়া রাখিয়া আবার অন্য চিঠি বাছিয়া মপার্ভের হাতে আগাইয়া দিতে লাগিল। মপার্ভ সেগুলা আগুনে ধরিতে লাগিল—দাউ দাউ করিয়া চিঠির গোছা পুড়িতেছিল। তাহার সহিত কত প্রাণের কত গোপন কথা, কত মর্ম্ম-ব্যাকুলতা, প্রেমের

কত মান, কত অভিমান, বিরহের কত বেদনা,—কত পাপ, কত অভিসার, সব আজ আগুনে পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল। জেঙ্কিন্স হঠাৎ একটা চিঠি হাতে লইয়া কহিল, "এটা ত ভালবাসার ব্যাপার নয়। এই যে কি লেখা—প্রিয় ডিউক, আমি ত ডুবিতে বসিয়াছি। দেনার দায়ে বুঝি সব যায়। মান-সম্ভ্রম ধূলায় লুটায়। তুমি যদি—"

মপার্ভঁ কাণ খাড়া করিয়া শুনিল, সহসা সবলে চিঠিখানা ডাক্তারের হাত হইতে টানিয়া লইয়া সে দাঁড়াইয়া উঠিল। এ যে তাহারই লেখা চিঠি! ডিউকের অসতর্কতায় সেখানাও এগুলার সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে! চিঠিখানা আগাগোড়া পড়িবার ইচ্ছায় সেখানা হাতে লইয়া সে জানালার ধারে আসিল, আসিবার সময় ডাক্তারের পানে একটা তীব্র দৃষ্টি হানিয়া আসিল!

জেঙ্কিন্সও এই সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। এই অবসরে সে চিঠি দুইখানা ক্ষিপ্র সে আপনার পকেটের মধ্যে পূরিয়া ফেলিল। এমন সময় হঠাৎ লুইয়ের স্বর শুনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডিউকের তীব্র ভৎর্সনার স্বর—"নে, নে, বাপু, যা পারিস্, নে—মোদ্দা, শব্দ করিস্‌নে! আমায় একটু ঘুমোতে দে।"

মপার্ভঁ ও জেঙ্কিন্স তাড়াতাড়ি ছুটিয়া ডিউকের ঘরে প্রবেশ করিল। গিয়া দেখে, ডিউকের ড্রয়ার খোলা—কতকগুলা মুদ্রা ছড়ানো রহিয়াছে—এবং সম্মুখে দাঁড়াইয়া লুই, তাহার মুঠি মুদ্রায় ভরা! ডিউককে নিদ্রালু দেখিয়া সে টাকা সরাইতে সুরু করিয়াছিল, ডিউক তাহা দেখিয়া ফেলিয়াছেন!

সে রাত্রিটা ডিউকের আচ্ছন্নভাবেই কাটিল। একটু তন্দ্রা আসে, আবার তখনই তাহা ভাঙ্গিয়া যায়। ডাক্তারের ঔষধে রোগ সারিবার এতটুকু সম্ভাবনা নাই। তবুও ঘড়ি ধরিয়া ঔষধ

খাওয়ানো চলিতে লাগিল—মরণ-পথে ডিউক যাত্রা ত করিয়াছেনই—তবু তাঁর যাতনা যতটা লাঘব করা যায়!

তারপর বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে ঘুম ভাঙ্গিলে সম্মুখে মপার্ভ, কার্দ্দিলাক ও আরও দুই-চারিটা নিতান্ত পরিচিত মুখ দেখিয়া ডিউক মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সহরে লোকে কি বল্‌চে?

সহরে অনেক কথারই আলোচনা চলিতেছিল। তবে তাঁহার কথাটা লোকের মুখে বেশী করিয়াই ফিরিতেছিল। ডিউকের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন—বুঝি আর বাচেন না, এইটাই ছিল, সব চেয়ে উত্তেজক সংবাদ! আর নবাব? ডিউকের মৃত্যু,—তার অর্থ, তাঁর সর্ব্বনাশ, ধ্বংস, তাঁহারও মৃত্যু! নবাব এ সংবাদ শুনিয়া বাহিরে কোন কাতরতা দেখাইলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার মনে হইল, বুক যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে সমস্ত পৃথিবীটাই তাঁহার শূন্য মনে হইতেছিল। যেন দারিদ্র্য, ধ্বংস তাহাদের বিকট মূর্ত্তি লইয়া নবাবের চোখের সম্মুখে তাণ্ডব নৃত্য লাগাইয়া দিয়াছে!

ডিউক আজ আপনাকে একটু সুস্থ বোধ করিতেছিলেন। নানা লোক আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেছিল—ডিউক তাঁহাদিগের সহিত দেখা করিতে চাহিয়াছিলেন। বিদায়ের পূর্ব্বে একবার শেষ দেখা!

একে একে সকলে চলিয়া গেলে ক্রমে জঁাস্লের পালা আসিল। ডিউক তখন কেমন অবসন্ন হইয়া পড়িলেন—চোখ তাঁহার মুদিয়া আসিল। জঁাস্লে ঘরে ঢুকিতে জেঙ্কিন্স কহিল. "আঃ, কি লোক! কারুকে এ শেষ মুহূর্ত্তে ভোলেন নি! এইমাত্র আপনার কথাই কচ্ছিলেন। এখন একটু ঝিমিয়ে পড়লেন।"

"আমার কথা বলছিলেন?" নবাবের স্বরে কি যে কৃতজ্ঞতা মিশানো ছিল! জেঙ্কিন্স কহিল, "হাঁ, আপনার নির্ব্বাচনের কি হল, তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেন।"

জাঁস্লে কৃতজ্ঞতায় শির নত করিলেন। এমন সময়ে, মৃত্যু-লোকের দ্বারে দাঁড়াইয়াও ডিউক তাঁহার কথা ভোলেন নাই! হায়, তাঁহারই ভাগ্যদোষে আজ এত বড় বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিতে বসিয়াছে।

ডিউকের সহিত দেখা করিতে আসিয়া জাঁস্লের একটা কথা কহিবারও সুযোগ মিলিল না—ইহাও কি কম দুর্ভাগ্য!

নবাব সে ঘরে আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। মহত্ত্বের এমন ধ্বংস চোখে দেখা যায় না! হৃদয়-হীন পারির মধ্যে একমাত্র যিনি হৃদয়-বান, তাঁহার এ যাতনা দেখিলে পাষাণও বুঝি ফাটিয়া যায়, নবাব ত মানুষ! নবাব বাহিরে চলিয়া আসিলেন। সিঁড়ির কাছে ভৃত্যের দল নানা কথা কহিতেছিল। কেহ বলিল, "ঢের টাকা পেয়ে গেছি। আর চাকরি কর্চ্ছি না।" আর-একজন কহিল, "আমি ডচেসের কাছে থাকব।"

নবাব সে কথা কানে না তুলিয়াই হল-ঘরে দর্শক ও বন্ধুবর্গের জন্য যে খাতা ছিল, তাহাতে নিজের নাম লিখিলেন। লিখিয়াই তাঁহার নজর পড়িল, ঠিক পূর্ব্বেকার নামটির উপর এ কি—এ যে হেমারলিং! তাহার চির-শত্রু হেমারলিং! নবাব শিহরিয়া উঠিলেন—অদৃষ্টের কি ক্রূর পরিহাস, এ! তাঁহার নামের উপরই হেমারলিঙের নাম? সে যেন বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছে!

নবাব আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। এখন তিনি কোথায় যাইবেন! ক্লাবে? বাড়ীতে? না। নবাব হোটেলের দিকে চলিলেন। অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইতেছিল।

হোটেলে লোকের মুখে আর অন্য কোন কথা নাই; কেবলই ডিউকের কথা! ভোজনে বসিয়া একটা কথা ডিউকের কানে গেল—কে বলিতেছিল, "আশা আছে বৈ কি! এর চেয়ে বড় বড় রোগ লোকের সারছে—এ'ত কি! চিকিৎসার অত ধুম!"

নবাবের প্রাণখানা আশার উল্লাসে নাচিয়া উঠিল। আহার অসমাপ্ত রাখিয়াই বিলের টাকা সম্পূর্ণ চুকাইয়া দিয়া আবার তিনি ডিউকের প্রাসাদের অভিমুখে গাড়ী হাঁকাইবার আদেশ দিলেন।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ডিউকের প্রাসাদ উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করিতেছে! সে যেন আশারই হর্ষোজ্জ্বল হাসির দীপ্তি! ভৃত্য-পরিজন এধারে ওধারে নিত্যকার মতই চলা-ফেরা করিতেছে। দেখিলে মনে হয় না, এ গৃহে কোন ভীষণ মর্ম্মঘাতী নাটকের অভিনয় চলিতে পারে! নবাবের বিষণ্ণ চিত্তে আশার আনন্দ-কিরণ ফুটিয়া উঠিল। গাড়ী হইতে নামিয়া তিনি প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখেই চেয়ারে বসিয়া মপার্ভ এবং আরও কয়জন লোক—আচার্য্যও বসিয়া যে! তবে কি—তবে—?

নবাব বিস্ফারিত নেত্রে সকলের পানে চাহিয়া দেখিলেন। মপার্ভ কহিল, "ঠিক থাপ থাবে কি না, এই হচ্ছে কথা! ভাবুন, মোরার যে-সবে বিশ্বাস ছিল—অর্থাৎ বুঝলেন কি না—তাঁর মত লোকের যোগ্য আয়োজন—"

জাঁসুলের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। তাহা হইলে সব শেষ! মপার্ভ কহিল, "এই যে নবাব বাহাদুর। আমাদের এখনই সকলকে খপর পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। দেরী করা ঠিক হবে না। কাল সকালেই কবরের ব্যবস্থা হয়েছে। ডিউকের ইচ্ছাও তাই ছিল। ডিউকের যোগ্য আড়ম্বর-সমারোহ চাই—সেই কথাই হচ্ছে! কত গাড়ী, কত লোক-জন সঙ্গে যাবে—"

নবাবের কানে আর কোন কথাই প্রবেশ করিল না। সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার চোখের সম্মুখে একটা নীল গোলকখণ্ডে রূপান্তরিত হইয়া গেল। নবাব মাথায় হাত দিয়া নিকটস্থ একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। বুকের মধ্য হইতে একটা তীব্র দীর্ঘনিশ্বাস ঠেলিয়া

বাহির হইল। সে নিশ্বাসের শব্দে মপাভঁর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। নবাবের মনে হইল, তাঁহার প্রাণবায়ুটুকুও যেন সে নিশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া গিয়াছে। নবাব মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সমাধি

"তুমি অমন করে কেঁদো না পরী, ওতে আমার বুক ভেঙ্গে যায়। তুমি বরং ফন্তেন্‌ব্লোয় যাও—নিজের কাজ-কর্ম্ম দেখ'গে। ব্রহিমের দশ হাজার ফ্রাঙ্ক হাতে পেলে তোমার আর ভাবনা কি? আমি সেখানে গিয়েই তোমায় টাকা পাঠাব। সে আমার হাতে গড়া মূর্ত্তি চায়—তা তাকে দেব—রীতিমত তার দামও আদায় করে নেব! আবার আমার টাকা-কড়ি হবে—অনেক টাকা! কে জানে, হয়ত সুলতানাও হতে পারি একদিন।"

"তাই হও—তুমি সুলতানাই হও। কিন্তু আমায় আর তা চোখে দেখতে হবে না—আমি ততদিন বাঁচছি না।"

ক্রেনমিজ্ চোখের জল মুছিয়া গাড়ীর এককোণে জড়সড় হইয়া বসিল।

ফেলিসিয়া পারি ত্যাগ করিতেছিল। এখানকার এই ভয়ঙ্কর শূন্যতা, তীক্ষ্ণ নৈরাশ্য ও কঠোর বিদ্রূপ-লাঞ্ছনার মধ্য হইতে সে এখন পলাইয়া বাঁচিতে চায়। মোরার মৃত্যু তাহাকে কি ভীষণ আঘাতই না দিয়াছে! একটা তীব্র দুরাকাঙ্ক্ষার বশে সে ডিউকের হাতে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিল। নিজের সহিত নারীর সকল সম্মান,

সকল গৌরব, লজ্জা-সরম অবধি সমস্তই সে ডিউকের হাতে তুলিয়া দিয়াছিল। আর আজ ডিউক যাইবার সময় ফেলিসিয়ার জন্য তার কিছুই রাখিয়া যান নাই—ফেলিসিয়াকে এই কঠিন নগরের পথের উপর বসাইয়া গিয়াছেন, সারা জীবনের মত তাহাকে নিঃস্ব সর্ব্ব-হারা করিয়া গিয়াছেন। গভীর বেদনায় ফেলিসিয়ার বুক ভাঙ্গিয়া গেলেও চোখে তাহার অশ্রু ঝরিবারও আজ উপায় নাই! শোক-চিহ্ন ধরিবার অধিকার হইতেও সে বঞ্চিতা—অতটুকু সম্মান অবধি আজ ফেলিসিয়ার নাই! কিন্তু কি করিয়াছে ফেলিসিয়া যে, সারা জীবন তুষের আগুনে এমন করিয়া তাহাকে পুড়িতে হইবে! ডিউকের সহিত সেণ্ট জেম্‌সে দুই চারিটিমাত্র সন্ধ্যা-যাপন—দুই-চার রাত্রি থিয়েটারে একত্রে বক্সে বসিয়া অভিনয় দেখা—ইহারই মধ্যে প্রাণহীন প্রণয়-হীন অভিসারের শত কলঙ্ক-রেখা কে যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিয়াছে! উদ্‌ভ্রান্ত নারী,—জগতে চলিবার ঠিক পথটি তাহার জানা ছিল না—আজ তাই সকলের চোখে সে একটা কলঙ্কের ত্যক্ত নিশানের মত পড়িয়া রহিল!

ফেলিসিয়ার একবার মনে হইল, সে আত্মহত্যা করিবে। পরক্ষণেই মনে হইল, না, তাহা হইলে তাহার ভগ্ন হৃদয়ের ইঙ্গিত করিয়া এখনই কুৎসার ধারা সারা পারি-ময় ছড়াইয়া পড়িবে! খবরের কাগজে অমনি মোটা কালো অক্ষরে কালিমার মালা দুলিতে থাকিবে! তবে উপায়—কি উপায় আছে? ফেলিসিয়া স্থির করিল, সে নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়াইবে—পারিতে আর থাকিবে না। কিন্তু দেশ বেড়াইতে গেলে অর্থ চাই,—প্রচুর অর্থ! ফেলিসিয়ার যে তাহার অভাব বড় বেশী। তখন তাহার মনে পড়িল, বের কথা! একজিবিশনে তাহার গড়া মূর্ত্তি দেখিয়া বে'র মুখে প্রশংসার বৃষ্টি ঝরিয়াছিল—বে তাহাকে বহু অর্থ দিয়া টিউনিসে লইয়া যাইবার

প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিল—তাহার গড়া মূর্ত্তি দিয়া যে টিউনিসের প্রাসাদ সাজাইবে। তখন ফেলিসিয়া এ প্রস্তাবে রাজি হয় নাই—প্রাচ্যের বিপুল প্রলোভন তাহাকে এতটুকু চঞ্চল করিতে পারে নাই! আর আজ? আজ তাহার মনে হইল, এ দুর্দ্দিনে ঐ একটি, একটি মাত্র উপায়ই আছে! তাই সে এক মুহূর্ত্তও দ্বিধা করিল না। কয়েকখানা টেলিগ্রামে কথাবার্ত্তা-চলাচলের পর দর ঠিক হইয়া গেল, এবং ফেলিসিয়া টিউনিস-যাত্রার উদ্যোগ করিল। চটপট জিনিষ-পত্র গুছাইয়া লইয়া সে একদিন পারি ত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে ষ্টেশনের অভিমুখে বাহির হইয়া পড়িল। পারিতে আর একদণ্ড নয়! সারা আকাশ যেন এখানে তাহাকে চাপিয়া ধরিবার উপক্রম করিয়াছে! তাই সে এক অজানা দেশে নূতন জীবন-যাপনের কল্পনায় বিভোর হইয়া শত দুশ্চিন্তার হাত হইতে মুক্তি-লাভের চেষ্টায় ছুটিতে চায়।

জেনোয়ায় বের সজ্জিত বজরা তাহার অপেক্ষা করিবে! সেখান হইতে বরাবর সে টিউনিসে যাইবে। সেখানে তাহার থাকিবার জন্য প্রকাণ্ড বাড়ী—গাড়ী-ঘোড়া, লোকজন—অভ্যর্থনার চূড়ান্ত আয়োজন হইয়াছে!

গাড়ীর মধ্যে বসিয়া চক্ষু মুদিয়া ফেলিসিয়া ইতালির সুদৃশ্য বন্দরের ছবি দেখিতেছিল। শ্বেত মর্ম্মরে বাঁধা ঘাট—চিত্র-বিচিত্র পোষাক পরিয়া ইতালিয় কিশোর-কিশোরী নৌ-বিহারে বাহির হইয়াছে—কোথাও বাদ্য বাজিতেছে, লতা-পাতার মালা মাথায় পরিয়া কোথাও ইতালিয় বালক-বালিকার দল গান ধরিয়াছে! তার পর কোথায় সুদূর টিউনিস! মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য্য—মাঠে কালো-কালো ছেলেমেয়েরা সরল আনন্দে নৃত্য করিতেছে, খেলা করিতেছে। চমৎকার বৈচিত্র্য!

আর এখানে পারির আকাশ—কি বিশ্রী কদর্য্য বেশ ধরিয়া তাহাকে

বিদায় দিতেছে! কাল রাত্রি হইতে বৃষ্টির আর বিরাম নাই। পথে কাদা জমিয়া একটা নিরানন্দময় অবসাদের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। অসহ্য এ দৃশ্য! ইহার মধ্য হইতে পলাইতে পারিলে ফেলিসিয়া বাঁচিয়া যায়!

আজ পারির এই নিরানন্দময় বুকের উপর আর-এক নিরানন্দময় ব্যাপারের অভিনয় চলিতেছিল। আজ ডিউক মোরার সমাধি। সেই কাদায়-জলে ভরা পথের উপর জনস্রোতের আজ আর বিরাম নাই। কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছে—সার দিয়া গাড়ী চলিয়াছে। সমাধি-যাত্রায় এমন-বিরাট সমারোহ পারির লোক বহুকাল চোখে দেখে নাই! ফেলিসিয়ার গাড়ী একটা মোড় বাঁকিয়া বড় রাস্তায় ক্রমে এই গাড়ীর ভিড়ে পড়িয়া গেল; তখন তাহার গতি অত্যন্ত মৃদু হইয়া আসিল। ওদিকে গাড়ীর মধ্যে ফেলিসিয়ার মন উধাও কল্পনায় ভাসিয়া দুরন্ত ঘোড়ার মতই ছুটিয়া চলিয়াছে—বাহিরের এই রুদ্ধ স্রোত তাহাকে একেবারে বিষম বিরক্ত করিয়া তুলিল। সে চীৎকার করিয়া কোচম্যানকে কহিল, "জোরে হাঁকাও গাড়ী।"

কোচম্যান সবিনয়ে উত্তর দিল, জোরে চালাইবার উপায় নাই। ডিউকের সমাধি-যাত্রী গাড়ীর ভিড়ে পড়িয়া তাহাকে লাইন ধরিয়া মন্দ গতিতেই যাইতে হইবে; বে-লাইনে বেগে চালাইবার হুকুম নাই। ফেলিসিয়া রাগে উত্তপ্ত হইয়া কহিল, "অন্য রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাও!"

ফেলিসিয়ার মাথার মধ্যে একটা ঘূর্ণী বাতাস ছুটিয়াছিল। যাহার হাত এড়াইবার জন্য সে এত ত্বরা করিয়া আজন্মের বাস ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে, তাহাই আবার এ কি পাকে তাহাকে জড়াইয়া ধরিতে চায়! স্মৃতির দুরন্ত দাহে তাহার মন যেন পুড়িয়া যাইতেছিল। সে একবার গাড়ীর জানলা দিয়া মাথা বাহির করিয়া ঝুঁকিয়া দেখিল

সৈন্যদল বন্দুক নামাইয়া অত্যন্ত গম্ভীর চালে পথ চলিয়াছে, তাহাদের পিছনে সীমাহীন জন-তরঙ্গ! ফেলিসিয়া আর দেখিতে পারিল না; তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। তাহার সকল লজ্জা, সকল অপমান, সকল ঐশ্বর্য্য, সকল দৈন্য যেন এই জনতা-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছে। ফেলিসিয়া কোচম্যানকে কহিল, "প্রথমে যে গলি পাবে, সেই গলিতে ঢুকে গাড়ী জোরে হাঁকিয়ে যাও।" তার পর সে গাড়ীর জানলা বন্ধ করিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

পথে তখন সমাধি-যাত্রায় রীতিমত ঘটা বাধিয়াছিল। রাজ্যের যত সম্ভ্রান্ত, পদস্থ কর্ম্মচারীর দল সেই কাদায় হাঁটিয়া ডিউকের প্রতি সারা নগরের শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছিল। প্রথমেই বিপুল বাদ্য-সমারোহ, পরে পাঁচখানি গাড়ীতে পাদ্রীর দল, সকলেরই পরিধানে কৃষ্ণ পরিচ্ছদ —তার পর ডিউকের সমাধি-শকট, গাঢ় কালো রঙের ছয়টি ঘোড়া সে গাড়ী টানিয়া চলিয়াছে। কফিনের উপর একখানি তরবারি, একটি ইউনিফর্ম-পোষাক ঝালর-দেওয়া হেল্‌মেট টুপি, স্বর্ণ-খচিত তাহার গায়ে বড় বড় মুক্তায় গ্রথিত প্রকাণ্ড একছড়া মালা! ডিউকের গাড়ীর পিছনে শোকচিহ্নধারী কমিটির সদস্য, এবং ডিউকের বন্ধু ও আত্মীয়ের দল হাঁটিয়া চলিয়াছে। সকলেরই মুখে আয়োজনোচিত শোকের উদাস গাম্ভীর ভাব। এতগুলি লোকের মধ্যে প্রকৃত শোকের বেদনা যদি কাহারও বুকে বাজিয়া থাকে, তবে সে নবাবের। তাহার মুখে কে যেন গভীর হতাশার ছাপ আঁকিয়া দিয়াছে। নবাবকে দেখিলে মনে হয়, তিনি যেন ঐ পুরুষটির সহিত আপনার প্রাণের সমস্ত সাধ, আশা, আপনার সকল ঐশ্বর্য্য-গৌরব মাটীর নীচে সমাহিত করিতে চলিয়াছেন।

সমাধি-যাত্রীর দল ক্রমে গোরস্থানে আসিয়া পৌঁছিল। সেখানকার করণীয় সমস্ত ব্যাপার শেষ হইলে হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি দেখা দিল। তখন চারিধারে একটা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া গেল। সকলে ব্যস্ত হইয়া

বৃষ্টি হইতে নিস্তার পাইবার জন্য ছুটিয়া মাথার উপর একটু আশ্রয় লাভের চেষ্টা দেখিল। হেমারলিং আসিয়া একটা ঝোপের মধ্যে দাঁড়াইল—আকাশের পানে অধীর দৃষ্টিতে সে চাহিয়া আছে, এমন সময় সে দেখে, নবাব সেই ঝোপটার দিকেই আসিতেছেন। নবাবের প্রকৃতি হেমারলিঙের বিলক্ষণ জানা ছিল। তাহার একটু ভয় হইল—কি জানি, এখানে কেহ নাই, যদি নবাব মনের ঝাল মিটাইয়া লয়! কাছাকাছি অপর কোথাও সরিয়া পড়িবার উপায় ছিল না। হেমারলিং কি করিবে স্থির করিতে পারিতেছে না, এমন সময় নবাব আসিয়া ডাকিলেন, "লাজেয়ার—"

পরক্ষণেই হেমারলিং আপনার স্কন্ধে নবাবের ভারী হাতের তপ্ত স্পর্শ অনুভব করিল। সে ঈষৎ চমকিয়া উঠিল। নবাব কহিলেন, "শোনো, ভয়ের কোন কারণ নেই। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। আমি শুধু তোমায় অনুরোধ করছি, তুমি আর আমার পিছনে লেগো না।"

হেমারলিং নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। নবাব আবার কহিলেন, "এ যুদ্ধে তোমারই জিত, আমার হার। দেখ, আমি ক্ষতবিক্ষত হয়েছি, আর যুঝতে পারছি না। পুরোনো বন্ধু বলে আমায় দয়া কর। আমায় মুক্তি দাও।"

হেমারলিঙের প্রাণের কম্পন তখনও থামে নাই। গায়ে যত বলই থাকুক, অপরাধীর মন ভয়ে অতি-সহজেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। হেমারলিঙের মনে পড়িল, সেই অতীত দিনের কথা। দারিদ্র্য যখন পিষিয়া মারিতেছিল, তখন দুই বন্ধুতে ভাগ্যান্বেষণে সুদূর টিউনিসে যাত্রা করে। নির্ব্বাসনে থাকিয়া রৌদ্রে ছুটিয়া দুইজনে পয়সার চেষ্টায় কি কষ্টই না সহ্য করিয়াছে! দারিদ্র্যের সমস্ত কঠিন অত্যাচার দুই বন্ধুতে নীরবে মাথা পাতিয়া লইয়াছে! নবাব কহিলেন, "তোমার তাড়া

নেই, বোধ হয় ? এস না, একটু বেড়াই। বৃষ্টিও থেমে গেছে, আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। তোমাকে পেয়ে আমার মনে হচ্ছে, যেন আমি আমার অতীত বিশ বচ্ছর আজ আবার ফিরে পেয়েছি—!"

হেমারলিং কহিল, "হাঁ, আমারও বড় ভাল লাগ্‌ছে। কিন্তু তুমি জানো, আমার পায়ের বেদনার জন্য চলবার ক্ষমতা আমার তেমন নেই ?"

নবাব কহিলেন, "তোমার পায়ের কথা আমি ভুলে গেছলুম। এসো, আমার হাতে ভর দিয়ে এসো।"

ভাইয়ের মত যত্নে নবাব তখন হেমারলিঙের হাত ধরিলেন। খানিকটা চলিয়া উভয়ে একটা বেঞ্চে আসিয়া বসিল। নবাব ডিউকের পানে চাহিয়া কহিলেন, "বেচারা ডিউক—"

হেমারলিং কহিল, "এ মৃত্যুতে দেশের বড় ক্ষতি হল।"

নবাব কহিলেন, "আমার যা ক্ষতি হয়েছে, তার আর সামা নেই। আর যদি কিছুদিনও বাঁচতেন! তোমারই বরাত, লাজেয়ার! তা ছাড়া তোমার ক্ষমতাও খুব!"

হেমারলিং কহিল, "তা যদি বললে, ক্ষমতা আমার নয়, এর জন্য মেরির কাছে আমি ঋণী!"

"মেরি!"

"হাঁ, ব্যারণেস! বিয়ের সময় সে ক্রীশ্চান হয়—তখন তার পুরোনো নাম বদলে মেরি নাম দেওয়া হয়। তার একটা শক্তি আছে, বটে! ব্যাঙ্কের কাজ সে বেশ বোঝে! সে-ই ত সব চালায়—আমার যা-কিছু দেখা-শোনা, সব সে-ই করে।"

নবাব একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তোমার মত বরাত কটা লোকের হয়!"

নবাব আপনার স্ত্রীর কথা ভাবিতেছিলেন! জানোয়ার সে! হৃদয়-হীনা!

তার পর উভয়ে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল—সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া হেমারলিংই কথা কহিল। হেমারলিং বলিল, "তোমার সঙ্গে এই আমি কথা কচ্ছি, এ দেখলে মোর একেবারে রসাতল বাধিয়ে দেবে।"

নবাব কহিলেন, "কিন্তু কৈ, আমি ত তার কোন ক্ষতি করিনি।"

"বিশেষ ভাল ব্যবহারও করনি তুমি। আমাদের বিয়ের পর সেই কাণ্ডখানা মনে পড়ে? তোমার স্ত্রী বলে পাঠালে, যে, একটা বাঁদীর সঙ্গে সে দেখা করতে পারবে না! কেন, আমাদের বন্ধুত্ব কি এ সামান্য কুসংস্কারটুকু ভুলতে পারত না? জানো, মেয়ে মানুষ এ-সব অপমান জীবনে ভোলে না।"

"কিন্তু আমার তাতে কি হাত ছিল, বল? তুমি ত জানো, আফ্রাসিনদের দর্প কতখানি!"

নবাবের যে এ দর্প ছিল না, হেমারলিং তাহা বুঝিত। তাহার উপর এই শ্মশানের বুকে বসিয়া মনের ভাব তাহার কোমল হইয়া আসিয়াছিল। সে কহিল, "শোন বার্ণার্ড, এক উপায় আছে। আমাদের পুরোনো বন্ধুত্ব ঝালিয়ে তোলবার একটি মাত্র উপায় আছে। তোমার স্ত্রীই আমাদের এই ব্যবধান দূর করতে পারে। তার সেই অপমানের কথা ব্যারণেসের বুকে কাঁটার মত বিঁধে আছে! আমাদের বাড়ীর মধ্যকার এই গোলটুকু যদি মিটে যায়, তাহলে আবার আমরা আগেকার মত বন্ধুভাবে পরস্পরে মিশতে পারি—"

নবাব কহিলেন, "কি করলে মেটে, বল?"

"শোন তবে, বলি। আসচে শনিবার ব্যারণেস একটা পার্টি দিচ্ছেন। তাতে পারির সমস্ত বড় বড় লোকই আসবেন। তুমিও তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এসো! অবশ্য নিমন্ত্রণ-পত্র পাবে। তোমার স্ত্রী এসে আমার স্ত্রীর সঙ্গে মেশামেশি করুক—সব গোল চুকে যাবে। আমি বুঝতে পারচি, তুমি বড় বিপদে পড়েচ—আমি তোমায় সে

বপদ থেকে উদ্ধার করব। বেকে ধাব দিয়ে তুমি খুব এক চাল চলেছিলে বটে, কিন্তু কি করবে? তোমার পড়তা যে খারাপ যাচ্ছে, ৭৬ পেয়েও খেলা গুছিয়ে নিতে পারছ না—কেবলই হার হচ্ছে।”

নবাবের দর্পিত শির আজ এতখানি নত দেখিয়া হেমারলিং মনের মধ্যে অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিতেছিল। একটু দয়াও হইল—আহা, পুরাতন বন্ধু! কিন্তু এ দায় হইতে উদ্ধার-লাভের একটি মাত্র উপায় আছে—সে উপায় কি, হেমারলিং তাহারও ইঙ্গিত দিয়াছে! তবু জান্সুলের মন এমনি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, যে কোনদিকেই তিনি ভরসা পাইতেছিলেন না—মোরাকে হারাইয়া তিনি আজ সব হারাইয়াছেন!

হেমারলিং কহিল, “তুমি ডিউককে হারিয়েছ বটে, কিন্তু আমায় ফিরে পাচ্ছ।”

নবাব কহিলেন, “কিন্তু শোন, এতে কি কোন ফল হবে? লি মার্কার ত তার রিপোর্ট লিখে শেষ করে ফেলেছে।”

হেমারলিং কহিল, “আর একটা নতুন রিপোর্ট লিখতে কতক্ষণ! এক, দুই, তিন, চার না হয় পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্ক খরচ কর—সব ঠিক হয়ে যাবে।”

নবাব স্তম্ভিত হইয়া গেলেন—সবিস্ময়ে কহিলেন, “এ কি সম্ভব! লি মার্কার—অমন কড়া লোক—”

“পয়সায় নরম হয় না কে? শোন, টাকাটা কি আর নগদ হাতে ধরে দেবে? একটু ফিকির চাই। লি মার্কারের ছবির ভারা সখ। খুব দামী ছবিতে সে ঘর সাজিয়েচে। সেয়ানবাক্-টাক্ কি এমনি কারো ছবি একখানা দাও দেখি—বলো, আপনার ঘরে টাঙ্গাবার জন্য একখানা ছবি পেলুম—সেখানা টাঙ্গাবার অনুমতি দেন যদি—! ব্যস্! ছবিখানা কোন ধর্ম্ম-বিষয়ের হলে ত আর কথাই নেই—” নবাব ভাবিতে লাগিলেন, তাই ত!…কিন্তু কি করিয়া ছবির প্রসঙ্গ তুলিবেন, তিনি?

হেমারলিং কহিল, "সে আমি ঠিক করে দেব। মোদ্দা, আগে তুমি ব্যারণেসের সঙ্গে সন্ধি করে ফেল! তাহলেই দেখবে, চারিধার ফরসা হয়ে গেছে। আমার যা-কিছু এই মান-সম্ভ্রম, ঐশ্বর্য্য-বল দেখচ, এ-সমস্তর মূলে মেরির বুদ্ধি! মেরির সঙ্গে ভাব করে ফেল, বার্ণাড, তোমার কোন ভাবনা থাকবে না।"

"বেশ, তুমি তাহলে ভার নিচ্ছ—আমায় এ বিপদ থেকে টেনে তুলবে?"

"অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই, বার্ণাড। শনিবার আমাদের ওখানে তোমরা সস্ত্রীক এসো—সেইখানে তখন মেরির সঙ্গে পরামর্শের পর সমস্ত ব্যাপার ঠিক করে ফেলব, অর্থাৎ লি মাকারের ওখানে করে যাওয়া যায়—বুঝেচ?"

"বেশ। তাহলে তুমি আমায় লি মাকারের ওখানে নিয়ে যাবে—?"

"হাঁ হে, হাঁ।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ব্যারণেস হেমারলিং

হেমারলিং এণ্ড সন কোম্পানির অফিস-গৃহের একেবারে দক্ষিণ কোণে তেতলার উপর ব্যারণেস হেমারলিঙের খাস-কামরা। সেই ঘরেই আজ খুব জমকালো রকমের পার্টির আয়োজন হইয়াছে। ঘরখানি সে জন্য বেশ কায়দা-মাফিক সাজানো হইয়াছে। দেওয়ালে লতা-পাতার বিচিত্র ঝালর দুলিতেছে—ঘর একেবারে ফুলের গন্ধে ভরপূর!

অতিথিদের মধ্যে জর্ম্মান, ইহুদি, ব্যাঙ্কার ও কমিশন-এজেন্টের

সংখ্যাই বেশী। আফ্রিকা প্রভৃতি প্রাচ্য দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া ইহারা প্রচুর ধনৈশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিয়াছে—কাজেই হেমারলিঙের প্রাসাদ-ভবনে তাহাদের দ্বার অবারিত বলিলেও চলে।

ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর যতই থাকুক, ব্যারণেসের জীবনে কালির রেখা যথেষ্ট ছিল। পূর্ব্ব-জীবনে সে বাঁদী ছিল। এক দাস-বিক্রেতা আদ্রিয়ানোপ্‌লের বাজারে তাহাকে কিনিয়া মরক্কোর দরবারে বেচিয়াছিল; সম্রাটের মৃত্যুর পর তরুণ বে আহমদ আপনার হারেমের জন্য তাহাকে কিনিয়া লয়। পরে হারেম ত্যাগ করিয়া আসিলে হেমারলিং তাহাকে বিবাহ করে। কিন্তু টিউনিসে ব্যারণেসকে লইয়া হেমারলিং বড় বিপদে পড়িল। সে দেশের কোন গৃহে—তুর্কি বা য়ুরোপীয় যে কোন জাতির হৌক না কেন—কোথাও ব্যারণেসের প্রবেশাধিকার ছিল না। একটা বাঁদীকে বন্ধুর সম্মান দিতে সকলেই নারাজ ছিল। প্যারিতে আসিয়াও হেমারলিঙের সে বিপদ কাটিল না। কাজেই ব্যারণেসকে প্রথম দুই-চারি বৎসর নির্জ্জনে বাস করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ব্যারণেসের বুদ্ধি ছিল অসাধারণ তীক্ষ্ণ—সভ্য সমাজকে বশ করিবার কায়দাও সে বিলক্ষণ জানিত। মন দিয়া অল্প দিনের মধ্যেই সে ফরাসী ভাষা বেশ আয়ত্ত করিয়া লইল—সাজ-সজ্জা ফরাসী কেতায় গড়িল। বহুমূল্য রেশমি পোষাক পরিয়া যখন ঝক্‌মকে বেরুসে চড়িয়া পারির পথে সে বেড়াইতে বাহির হইত, তখন তাহার ঐশ্বর্য্য ও রূপের ছটায় সহরে সকলের তাক লাগিয়া যাইত। সকলে বলিত, হাঁ, একটা রূপসী বটে!

তার পর ব্যারণেস খুব সমারোহে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিল; গির্জ্জায় ও আতুর সভায় অজস্র অর্থ দান করিয়া প্রচুর নাম কিনিল। এই সব ব্যাপারে তাহার প্রধান সহায় ছিল, লি-মাকার। তাহারই উপদেশে ব্যারণেস বুঝিল, এখানকার সমাজকে হাত করিতে হইলে নিজেকে

ক্রীশ্চান্ বলিয়া জাহির করা দরকার। তার পর যাহা করিবার আপনা হইতেই হইবে; আয়োজনের প্রয়োজন হইবে না। কারণ সমাজ বশ করিতে হইলে প্রধান যে দুইটি অস্ত্রের প্রয়োজন, ব্যারণেসের তাহা প্রচুর আছে—সে দুটি অস্ত্র, রূপ ও অর্থ!

লি-মার্কারের কথাই সত্য দাঁড়াইল। পারির সম্ভ্রান্ত সমাজ দুই হাত বাড়াইয়া হেমারলিং-গৃহিণীকে বুকে তুলিয়া লইল। একজন শুধু ইহাতে সায় দিতে পারিল না—সে মাদাম জাঁস্লে। টিউনিসের সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা সে—পারির লোক ব্যারণেসকে যতই মাথায় তুলুক, মাদাম জাঁস্লে এই বাঁদাকে কিছুতেই বন্ধুর চক্ষে দেখিতে পারিল না। এ অপমান ব্যারণেসের হাড়ে বিঁধিয়া রহিল।

তার পর রাজ্যের শক্তিময়ী অধীশ্বরী যেমন ধীরে ধীরে আপনার শক্তির প্রভাব বিপক্ষ পক্ষকে ভালো করিয়াই জানাইয়া দেয়, ব্যারণেসও রূপ ও অর্থের সাহায্যে জাঁস্লে-পরিবারকে তেমনি বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। তখন এক প্রকাণ্ড যুদ্ধ চলিল। সে যুদ্ধে মুখামুখি অস্ত্র চলে না—গোপন অন্তরালে বসিয়া ব্যারণেস শরক্ষেপ করে, আর সে শর বেচারা নবাবকে বিঁধিয়া একেবারে জর্জ্জরিত করিয়া তোলে! নবাব বিপন্ন, পরাজিত হইলেন। হেমারলিং ও তাহার পত্নী জয়ের গর্ব্বে মাতিয়া উঠিল। কিন্তু তবুও ব্যারণেসের মনে একটা ক্ষোভ রহিয়া গেল। এ শর মাদাম জাঁস্লেকে কৈ এতটুকু বিচলিত করিল না ত! ব্যারণেস ভাবিয়াছিল, এ শরের আঘাতের বেদনায় মাদাম জাঁস্লে আসিয়া তাহার দরবারে মাথা নত করিয়া দাঁড়াইবে, তাহার ক্ষমা চাহিয়া তাহার সখীত্ব মাগিয়া সেই অতীত দিনের তীব্র অপমানের জ্বালা হইতে ব্যারণেসকে মুক্তি দিবে! কিন্তু কোথায় মাদাম জাঁস্লে? সে আসিল না।

তাই সেদিন হেমারলিং আসিয়া যখন মেরিকে গোরস্থানের ব্যাপারটা

খুলিয়া বলিল, তখন একটা জয়ের আনন্দে মেরির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মেরি ভাবিল, এবার তবে তাহার পার্টি দেওয়া সার্থক হইল। দর্পিতা নারীর দর্পের শোধ কেমন করিয়া সে লইবে, তাহারই উপায় সে চিন্তা করিতে বসিল।

পার্টির দিন ব্যারণেস একটী লোকের প্রত্যাশায় অধীরভাবে বসিয়া রহিল—কখন্ সে আসে! যত বিলম্ব হইতেছিল, অধীরতা ততই বাড়িয়া উঠিতেছিল! সকলের অভ্যর্থনার ভার অপরের হস্তে অর্পণ করিয়া ব্যারণেস নিজে এক নিভৃত কক্ষে গিয়া বসিয়া রহিল। এই কক্ষের খোলা জানালা দিয়া বাড়ীর ফটক দেখা যায়! বসিয়া বসিয়া বহুক্ষণ কাটিয়া গেল; তবু হায়, সে আকাঙ্ক্ষিত জন আসিল না ত! ব্যারণেসের মনটা ক্রুদ্ধ সর্পের মত গর্জ্জিতে লাগিল।

পার্টি তখন শেষ হইয়া গিয়াছে—রাত্রি গভীর। অতিথির দল যাইতে সুরু করিয়াছে, এমন সময় কালো একটা কোট গায়ে নবাব আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—একলা, তাঁহার মুখ শুষ্ক, চোখে দারুণ হতাশা ও বিরক্তি মাখানো রহিয়াছে। পাগলের মত মূর্ত্তি! মাদাম আসিতে রাজী হইল না—কিছুতেই না! নবাবের সহস্র কাতর অনুনয়েও নয়!

সেদিন ভোর হইতেই নবাব স্ত্রীকে তাড়া দিতে ছিলেন, সাজ-সজ্জার আয়োজন কর, বৈকালে একটা নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইতে হইবে। একে ত এই স্থূল দেহখানা লইয়া টানাটানি করিতে মাদাম জাঁস্থলে সহজেই নারাজ, তার উপর যখন শুনিল, হেমারলিঙের গৃহে নিমন্ত্রণ এবং নিমন্ত্রণের মূলে সেই বাঁদী, তখন সে একেবারে কঠিন হইয়া বসিল, কিছুতেই সেখানে যাইবে না। ইহার জন্য যদি পৃথিবী রসাতলে যায়, যাক্,—তবু না! এত-বড় অপমান মাদাম জাঁস্থলে একটা রাজ্যের বিনিময়েও মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে

পারিবে না। নবাব কত মিনতি করিলেন, কত সাধিলেন,—নহিলে সব যায়—এ অভিমান, এ গর্ব্ব লইয়া বসিয়া থাকিলে পথের ভিখারী হইতে হইবে। প্রাণের যোগ না-ই থাকিল, শুধু একবার হাজিরা দেওয়ায় দোষ কি! অন্তরে বিরক্তির মহা-ভার চাপিয়া রাখিয়া একবার হাসি-মুখে দুইটা কথা বলিলেই বা! কিন্তু মাদামের ধনুর্ভঙ্গ-পণ, কিছুতেই নড়িবার নয়। প্রাণ যায় যাক্—সর্ব্বস্ব হারাইয়া পথে পথে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়, তাহাতেও মাদাম জাঁস্লে কাতর নয়—কিন্তু তাই বলিয়া একটা বাঁদার পার্টিতে গিয়া ইজ্জৎ খোয়াইবে, অত-বড় আফসিন বংশে জন্মিয়া এক কলঙ্কিনী বাঁদার সখীত্ব স্বীকার করিবে—তেমন পিতার কন্যাই সে নয়!

নবাব সাধিলেন, কাঁদিলেন, রাগিলেন, তবু স্ত্রীর মন টলিল না। তখন অগত্যা তিনি একলাই হেমারলিঙের গৃহের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলেন।

হেমারলিঙের গৃহে পৌঁছিয়া সম্মুখেই হেমারলিং ও ব্যারণেসকে দেখিয়া নবাব কম্পিত স্বরে কয়টা কথা উচ্চারণ করিলেন, "মাদাম জাঁস্লের শরীরটা বড় খারাপ—আসতে পারলেন না বলে তিনি ভারী দুঃখিত! আমারও সেজন্য আসতে দেরী হয়ে গেল—" কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ব্যারণেস কহিল, "হাঁ, আমি জানি, জানি আমি—" নবাব স্পষ্ট বুঝিলেন, সে স্বরে ব্যারণেসের মনের সমস্ত ঝাঁজ ফুটিয়া বাহির হইল! ব্যারণেস সেখান হইতে ক্ষিপ্র পাদক্ষেপে চলিয়া গেল।

নবাব ও হেমারলিং উভয়ের মুখে কিছুক্ষণের জন্য কোন কথা ফুটিল না। পরে হেমারলিং একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "বড় দুঃখের বিষয় যে, তোমার স্ত্রী এলেন না!"

গভীর নৈরাশ্যে জাঁস্লের মাথার ঠিক ছিল না। তিনি কোনমতে

হেমারলিঙের কথারই প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিলেন, “বড় দুঃখের বিষয় বৈ কি!” তার পর হেমারলিঙের মুখের পানে চাহিয়া নবাব আবার বলিলেন, “কিন্তু শোন লাজেয়ার, আমাদের স্ত্রীদের মধ্যে বনি-বনা নেই বলে আমাদেরও কেন বনি-বনা থাকবে না? আমাদের বন্ধুত্ব কত দিনের, এ—”

হেমারলিং কহিল, “হুঁ। তা তুমি এখন একটু বসবে কি?”

নবাব কহিলেন, “না থাক্। তুমি বোধ হয় ব্যস্ত আছ—!”

“হাঁ।”

“ভাল কথা! তা হলে লি-মার্কারের সে ছবির কথাটা কবে তোলার সুবিধা হতে পারে, বল দেখি?”

“তার আর সুবিধা-অসুবিধা কি! যেদিন হোক্! ভাল কথা—আমি দিন স্থির করে পরে চিঠি লিখব’খন। দু-একদিনের মধ্যেই সেরে ফেলা যাবে—কি বল?

“তুমি ভুলে যাবে না? দেখো। বুঝচ ত, কত জরুরি কাজ এটা—”

“আরে না, না, ভুলব কি! দু’একদিনের মধ্যেই তুমি আমার চিঠি পাবে। তাহলে আজ—”

তখন নবাব বিদায় লইলেন।

ইহার দুই দিন পরে হেমারলিঙের নিকট হইতে নবাব এক পত্র পাইলেন। হেমারলিং লিখিয়াছে,

“বন্ধুবরেষু

আমি নিজে তোমায় সঙ্গে করিয়া লি-মার্কারের ওখানে যাই, এমন অবসর ইতিমধ্যে চট্ করিয়া মিলিতেছে না! বড় কাজের ভিড় পড়িয়াছে; অথচ এটা খুব জরুরি ব্যাপার। যাই হোক, ভাবিয়া দেখিলাম, তোমার একলা যাওয়াই ঠিক। নয় কি? কোন

দ্বিধা করিয়ো না। লি-মার্কারকে সব বলা আছে। যে কোন দিন সকালে বেলা আটটা হইতে দশটার মধ্যে তুমি তাহার কাছে যাইতে পার।

তোমারই বন্ধু হেমারলিং।"

চিঠির তলায় 'পুনশ্চ' বলিয়া লেখা আছে, "ছবির কথাটা মনে রাখিয়ো।"

চিঠি পড়িয়া নবাব বিস্মিত হইলেন। চিঠিখানার অর্থ কি? সত্যই কি তাহার অবসর নাই, না, অসম্মতি জানাইবার এ একটা ভদ্র রকমের ওজর, শুধু? যাহা হৌক্, এ সব ভাবিয়া দেখিবার আর সময় নাই! কাজেই সকালে একদিন জাঁস্থলে লি-মার্কারের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল।

র‍্যু ক্যাশেয় কাথলিক ক্লবের নিকট লি মার্কারের গৃহ। লি মার্কার ব্যারিষ্টার, লায়নের ডেপুটি, ফ্রান্সের যত ধর্ম্ম সভার এজেণ্ট। হেমারলিঙের সহিত পরিচয় হইবার পর হইতে তাহাকে আর ব্যারিষ্টারি করিতে হয় নাই—হেমারলিঙের ব্যাঙ্কে মোটা রকম পাওনা আছে। সপ্তাহে দুই-চারি দিন হেমারলিঙের অফিস তদারক করাই এখন তাহার কাজ।

লি মার্কারের গৃহে তখন ভারী ভিড়। রাজ্যের লোক নানা কাজে দেখা করিতে আসিয়াছে। সকলে হল-ঘরে বসিয়াছিল—যখন যাহার ডাক পড়িবে, তখন সে গিয়া দেখা করিবে। নবাব আসিয়া সেই দলে মিশিয়া বসিলেন। বসিয়া থাকিতে থাকিতে ক্রমে তাঁহার ডাক পড়িল। নবাব উঠিয়া কম্পিত বক্ষে লি মার্কারের কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ঘরখানি বড়। প্রকাণ্ড একখানা গদিয়ান্ চেয়ারে লি মার্কার তাহার দীর্ঘ দেহ গুঁজিয়া বসিয়া আছে। ঘরের চারিধারে বড় বড় দ্বার—দ্বার-পথে মোটা পরদা ঝুলিতেছে। নবাব লি মার্কারকে অভি-

বাদন করিলেন—লি মার্কার চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলেন, পরে চোখ হইতে চশমা জোড়া নামাইয়া টেবিলে রাখিয়া লি মার্কার কহিলেন, "আপনার কি কথা, বলুন ?"

"সেই কথাই আমি বলতে এসেচি, ম্যাসিয়ো! আপনি হয়ত আশ্চর্য্য হচ্ছেন, যে এ-কথা কমিটির কাছে বললেই চলত—কিন্তু ব্যাপারটা এত ঘরোয়া রকমের যে সাধারণের কাছে অত কথা প্রকাশ করে বলা ঠিক হবে না—বিষয়টা গোপনীয়। বিশেষ, সে কথা নিয়ে সাধারণে নাড়াচাড়া করলে আমার একজন পরমাত্মীয়ের মনে অত্যন্ত ব্যথা দেওয়া হবে। তাই আপনাকে কষ্ট দিতে আমার এখানে আসা।"

লি মার্কার গোঁফে দুই-চারিটা পাক দিয়া বলিলেন, "বলুন।"

নবাব বলিলেন, "শুনুন তবে। আপনার রিপোর্ট যে সঠিক আর নিরপেক্ষ হবে, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে পথে-ঘাটে আমার নামে যে একটা অপবাদ সম্প্রতি রটে বেড়াচ্ছে, সেটা একেবারে মিথ্যা। আশা করি, সে মিথ্যা জনরব থেকে আপনি আমার সম্বন্ধে কোনরকম ভুল ধারণা করে বসেন নি! সেই অপবাদ সম্বন্ধেই দু-চারটে কথা আজ আমি বলতে এসেচি। আপনিও নিশ্চয় সে সব কথা শুনেচেন। আমি আমার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ অবধি আজ সঙ্গে এনেছি। এ সব দেখলে সহজেই আপনি বুঝবেন, ব্যাপারটা কতখানি গোপনীয়, আর কেনই বা সেটা সাধারণে প্রকাশ করা যায় না।"

তার পর নবাব লি মার্কারকে একখানি সার্টিফিকেট দেখাইলেন। সেখানা টিউনিস মন্ত্রী-সভার সার্টিফিকেট—তাহাতে লেখা আছে, দীর্ঘ বিশ বৎসর জাঁস্থলে টিউনিসে ছিলেন—এবং এই দীর্ঘ কালের মধ্যে দুইবার মাত্র তিনি টিউনিস ত্যাগ করিয়াছিলেন—একবার মৃত্যু-শয্যায়

তাঁহার পিতাকে দেখিতে—আর একবার বে'র সঙ্গে দেখা করিতে। তা ছাড়া এ বিশ বৎসরে নবাব কখনও এক দিনের জন্যও টিউনিস-ছাড়া হন নাই! নবাব কহিলেন, "আপনি এখন বলতে পারেন, এমন প্রমাণ আমার হাতে থাকতে কেন এই সব মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদ আমি করিনি? তারও কারণ আছে, ম্যাসিয়ো। আমার এক ভাই আছে—বেচারা ভাই—প্যারি সহরের বিলাস-পাপে পঙ্কিল, রুগ্ন ভাই! প্রথম বয়সে প্যারির বদ্ সঙ্গে পড়ে সে কলঙ্কের কালি মেখে ঘরে ফিরেছিল! কিন্তু—এই যে অপবাদ-কলঙ্ক আমার নামে আজ রটে বেড়াচ্ছে, সত্যই কি সে এতদূর মেখেছিল? তার সন্ধান নেবার সাহস আমার কখনও হয়নি—ভয়ে সে সন্ধান নিইওান আমি। আমার বাপ এই ভাইয়ের উপর বড় আশা গড়ে তুলেছিলেন সেই ভাইয়ের এই আচরণ দেখে তিনি বড়-শোক পেয়ে মারা যান। মরবার সময় অতি-দুঃখে আমায় তিনি বলেছিলেন, 'বার্ণাড, তোমার দাদাই আমায় মারলে! এত বড় লজ্জা, এতখানি কলঙ্ক গায়ে মেখে বাঁচা যায় না!' সে কথা আমি কখনও ভুলবো না।"

নবাব নিশ্বাস ফেলিলেন, পরে আবার কহিলেন, "বাবা গেছেন, কিন্তু আমার মা এখনও বেঁচে আছেন, ম্যাসিয়ো। আমার বেচারী, স্নেহময়ী মা! মা আমার এ-সব কিছুই জানেন না। তিনি জানেন, ছেলে তাঁর রোগে ভুগেই এমন হয়েছে। এ সব কথা শুনলে মা আমার পাগল হয়ে যাবেন। তাই আমি মুখ ফুটে কোন কথা বলতে পারি না। না হলে 'মেসেজার' কাগজ যে দিন প্রথম আমায় গাল দিলে, সে দিন তাকে আমি অমনি ছেড়ে দি! নালিশ-মকদ্দমা করলে চারিদিকে ঢাক বেজে যাবে—মার কানে সব কথা পৌঁছুবে—শুধু সেই ভয়েই আমি চুপ করে সে অপমান সহ্য করেছি। এখন বলুন, ম্যাসিয়ো, আমার অপরাধ কি? আপনার কাছে আমার

এই মিনতি! এই ত প্রমাণ। আমি দেখালুম ত, এ অপবাদের মূলে আমার থাকা কি রকম অসম্ভব! আপনি সব শুনলেন, এখন আপনি আমার বিচার করুন।"

লি মার্কার স্থিরভাবে সব কথা শুনিল, কিছু বলিল না। তার পর নবাব সবিস্তারে আপনার জীবন-কাহিনী বলিয়া গেলেন। পিতার দরিদ্র অবস্থা,—তাহার মধ্যেও বড় ভাইকে মানুষ করিবার জন্য কি তাঁহার আগ্রহ! কত ব্যয়ে তাহাকে সহরে পাঠানো—সেই ভাই শেষে কি হইয়া দাঁড়াইল! তার পর ভাগ্যান্বেষণে কোন্ সে সহায়-হীন সুদূর দেশে নবাব যাত্রা করিলেন! সেখানে জ্বলন্ত রৌদ্রে মাথা পাতিয়া, বন্য অসভ্য লোকগুলার সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া একটি-একটি করিয়া পয়সা উপার্জ্জনের পর এতখানি ঐশ্বর্য্য জমাইয়া তিনি দেশে ফিরিয়াছেন। এখানে চারিধারে কি এ চক্রান্ত—নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র—আর নবাব একা সে সকলের সঙ্গে সমানে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছেন! যিনি একমাত্র সহায় ছিলেন, তিনিও আজ পাশে নাই!

বলিতে বলিতে নবাবের প্রাণ কখনও মমতায় গলিয়া পড়িতেছিল, কখনও ক্রোধে তাতিয়া উঠিতেছিল! লি মার্কার স্তব্ধভাবে বসিয়া সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া চলিয়াছিল। বর্ণনার উচ্ছ্বাসে নবাব শেষে বলিয়া ফেলিলেন, "ভাল কথা! আমার বন্ধু হেমারলিং বলছিল, আপনার ভারী ছবির সখ! অনেক ভাল ভাল ছবি আপনি চড়া দামে কিনেওচেন!"

লি মার্কার নম্র স্বরে কহিল, "কোথায় তেমন ছবি! ছবির দাম কি আজকালকার বাজারে—! ও-সব বড় মানুষেরই সাজে! ডিউক, নবাব—তাঁদেরই এ সখ পোষায়—নাহলে আমাদের মত গরীবদের—? হুঁঃ! ঐ ত ক'খানা ছবি শুধু, এই ঘরেই রয়েছে। ওর দামই বা কি!"

নবাব দেওয়ালের পানে চাহিলেন। লি মার্কার খুব সতর্কভাবে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছিল। নবাব কহিলেন, "মাঝের দেওয়ালটা ফাঁক রয়ে গেছে! আমার কাছে ভার্জ্জিনের একখানি ছবি আছে—ছবিখানি ভাল, দামীও বটে! যদি অনুমতি করেন ত সেখানা ঐ দেওয়ালে টাঙিয়ে দিয়ে যাই।"

নবাবের অলক্ষ্যে লি মার্কারের অধর-প্রান্তে হাসির একটা মৃদু বিদ্যুৎ-রেখা খেলিয়া গেল। লি মার্কার ইহাই চাহিতেছিল। এই কথা-টুকুর জন্যই সে অতখানি ধৈর্য্য ধরিয়া নবাবের কাহিনী দিব্য শুনিয়া যাইতেছিল। এখন এই কথা শুনিয়া লি-মার্কার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তীব্র স্বরে সে কহিল, "আপনি বল্‌তে চান, এই ছবিখানা ঘুষ নিয়ে রিপোর্টটা আগাগোড়া আবার বদলে লিখি—কেমন, এই ত চান আপনি? বলুন, সেই জন্যই আজ এসেছেন এখানে?" পরে দাঁড়াইয়া উঠিয়া ঘণ্টা টিপিয়া লি-মার্কার আবার বলিল, "জীবনে অনেকের অনেক রকম আস্পর্দ্ধা দেখেছি বটে, কিন্তু আপনার এ আস্পর্দ্ধার আর তুলনা নেই! আমার বাড়ীতে বসে আপনি আমায় এমনভাবে অপমান করতে সাহস পান—!"

"কিন্তু শুনুন, ম্যাসিয়ো, রিপোর্টের সম্বন্ধে কোন কথা—"

ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া একটা ভৃত্য কক্ষে প্রবেশ করিল। লি মার্কার তাহাকে কহিল, "এঁকে বাইরে যাবার পথ দেখিয়ে দাও—"

লজ্জায় অপমানে জাঁস্যুলে যেন মরিয়া গেলেন! তিনি উঠিয়া যন্ত্র-চালিতের মত দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার মনে হইল, তিনি যেন শূন্যে ঝুলিতেছেন, পায়ের তলা হইতে মাটীটা সরিয়া গিয়াছে! লি মার্কার কহিল, "আপনি শুধু আজ আমায় অপমান করেন নি, ফ্রান্সের সদস্য সভার অপমান, সমস্ত ফরাসী জাতির অপমান করে-ছেন, তা জানেন? এ কথা আজই আমি সকলকে বলব। মনে

রাখবেন, নবাব বাহাদুর, এটা আফ্রিকা নয়, এ ফ্রান্স। এখানে পয়সায় লোকের বিবেক কেনা-বেচা চলে না।”

নবাব পাগলের মত টলিতে টলিতে ঘর হইতে বাহির হইলেন। তিনি চলিয়া গেলে লি মার্কার উঠিয়া পাশের ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া পরদা টানিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, “কেমন, ব্যারণেস মেরি, আমার অভিনয়টা কেমন দেখলে, সুন্দরী?”

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

নির্ব্বাচন

মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের খর-করজালের মধ্য দিয়া একখানা গাড়ী আসিয়া নবাবের প্রাসাদের সম্মুখে থামিল। ভাড়াটিয়া গাড়ী; মাথায় প্রকাণ্ড এক চামড়ার পোর্টম্যাণ্ট ও দুই-চারিটা ছোট বাক্স।

গাড়ী থামিলে এক বৃদ্ধা নারী গাড়ী হইতে নামিল।

প্রাসাদের দ্বারে এক ভৃত্য দাঁড়াইয়া ছিল। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল, “এ বাড়ী জাঁসুলের?”

ভৃত্য অবাক হইয়া গেল। এই নিতান্ত সাধারণ-গোছ-দেখিতে এক বৃদ্ধা নবাবের প্রতি সম্মান-সূচক কোন উপাধি না দিয়া তাঁহার নাম ধরিয়া বলিল, জাঁসুলে! ভৃত্য কহিল, “তাঁরই বাড়ী। তবে তিনি এখন বেরিয়েছেন।”

“তাতে কিছু আসে যায় না” বলিয়া বৃদ্ধা ভৃত্যকে গাড়ীর মাথা হইতে মোট-ঘাট নামাইতে আদেশ দিল; তার পর গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকাইয়া ভৃত্যকে বলিল, “জিনিষ-পত্তর সব জাঁসুলের ঘরে রাখবি, বুঝলি?”

বৃদ্ধা উপরের ঘরে বসিয়া একটু বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় নবাবের খাস-ভৃত্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধা কহিল, "তোমাদের মনিব বাড়াতে নেই ?"

খাস-ভৃত্য উত্তর দিল, "না।"

"ছেলেরা ?"

"তারা মাষ্টারের কাছে পড়ছে। এখন দেখা হবে না। হুকুম নেই।"

"আর গিন্নী ?"

"উনি ঘুমোচ্ছেন। বেলা তিনটের আগে তাঁর ঘুম ভাঙ্গবে না। সে ঘরে কারও যাবারও হুকুম নেই।"

শুনিয়া বৃদ্ধার হাড় জ্বলিয়া গেল। এই দিনে দুপুরে বিছানায় পড়িয়া গড়ানোর মত অপরাধ মানুষের আর কিছু হইতেই পারে না —বিশেষ বাড়ীর গৃহিণী সে, বয়সেও বুড়া নয়! শিক্ষা-হীনতায় এমন ফল ফলিবে না ই বা কেন ? বৃদ্ধা তখন গৌরির সন্ধান লইল ; ভৃত্য কহিল, তিনি বিদেশে গিয়াছেন।

"বম্পেন ?"

"তিনি হুজুরের সঙ্গে চেম্বারে গিয়েছেন।"

বৃদ্ধা তখন একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া কহিল, "যাক, ভাবনা নেই, তোমরা যাও। আমার জন্য ব্যস্ত হতে হবে না—"খাস-ভৃত্য তখনও সরিল না—চোখে সবিস্ময় দৃষ্টি ভরিয়া বৃদ্ধার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধা তাহার বিস্ময়ের কারণ বুঝিল, তাই মৃদু হাসিয়া কহিল, "আমি কোন কুটুম্ব-অতিথি আসিনি, বাছা। আমি তোমার মনিবের মা। বুঝলে ?"

ভৃত্য তাড়াতাড়ি সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল ; এবং সংবাদটা নিমেষেই ভৃত্য-মহলে রাষ্ট্র হইয়া গেল। সকৌতূহলে প্রায় সকলেই

আসিয়া বৃদ্ধাকে অভিবাদন করিল। সেক্রেটারি ব্যারো আসিয়া কহিল, "আপনাকে আমি আগে দেখেছি, একবার।"

বৃদ্ধা তাহাকে চিনিল। বে'র অভ্যর্থনা-সমারোহের উদ্যোগে লোকটা প্রাণ দিয়া খাটিয়াছিল, বটে! আজ আবার ইহাকে দেখিয়া সে অপমানের কথা নূতন করিয়া মনে পড়ায় বৃদ্ধার প্রাণে ঈষৎ বেদনাও বোধ হইল। বৃদ্ধা কহিল "ভঁ, তুমি ক'দিন ছিলে না, ওখানে?"

সেক্রেটারিকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করায় বৃদ্ধার প্রতি ভৃত্যবর্গের শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম অনেকখানি বাড়িয়া গেল।

কিন্তু প্রাসাদের এই ঐশ্বর্য্য-আড়ম্বরে বৃদ্ধার কিছুমাত্র তাক্ লাগিল না। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার সময় বৃদ্ধা লক্ষ্য করিল, মেঝের উপর আগাগোড়া কার্পেট মোড়া থাকিলে কি হইবে, সেই কার্পেটের প্রান্তে দস্তুর ধূলা জমিয়া রহিয়াছে—আলোর বৃহৎ ঝাড়েও ধূলার অভাব নাই। এত দাস-দাসী, লোক-জন-সত্ত্বেও এই অপরিচ্ছন্নতা দেখিয়া বৃদ্ধার মন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধা দেখিল, এত-সব মূল্যবান আসবাব—তবুও যেন ঘরের একটা শ্রী নাই! বৃদ্ধা নিজের হাতে চিরদিনই গৃহমার্জ্জনা করিয়া আসিয়াছে—এখন পুত্রের ঐশ্বর্য্য হইয়াছে—মার সেবার জন্য পুত্র কোথাও ত্রুটি রাখে নাই, তথাপি বৃদ্ধা এখনও নিজের হাতে কাজ-কর্ম্ম করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। তাই দুই-এক কথার পর সেক্রে-টারির নিকট ভৃত্যদের এই সকল অবহেলা-ত্রুটির সম্বন্ধে অনুযোগ করিতে বৃদ্ধা ভুলিল না। সকলেই বুঝিল, বৃদ্ধা বেশ পাকা রকমের গৃহিণী!

এমন সময় নবাবের পুরাতন ভৃত্য কাবাসু কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধাকে সসম্মান অভিবাদন জানাইল। বৃদ্ধা প্রসন্ন স্বরে কহিল, "এই যে কাবাসু—ভাল আছ ত বাবা?"

এক-গাল হাসিয়া কাবাস্থ উত্তর দিল, "আপনার আশীর্ব্বাদে ভালই আছি!"

"ছেলেরা সব কোথায়? কি করছে সব? ভাল আছে ত?"

"হাঁ।"

"বার্ণার্ডের শরীর ভাল? কাজ-কর্ম্ম চলছে বেশ?"

"কৈ আর তেমন চলছে। তবে মোটামুটি খবর সব মন্দ নয়। যাক, আমি এখন আপনার খাবার বন্দোবস্ত করে দি—"কথাটা বলিয়া কাবাস্থ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল, বৃদ্ধা তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিল, "থাক্ কাবাস্থ, কিছু ব্যস্ত হতে হবে না। আমার খাওয়া হয়েছে।"

কাবাস্থ কহিল, "তবে আমি যাই, ছেলেদের খপর দিই গে—বলিগে ঠাকুমা এসেছেন।"

"না, না, তাদের পড়াশোনার ব্যাঘাত করে কাজ নেই! তোমার মা-ঠাকরুণ বুঝি ঘুমোচ্ছে?"

কাবাস্থ সে কথার উত্তর দিল না। একটু কান পাতিয়া সে কহিল, "ঐ যে ছেলেদের পড়া হয়েছে। তারা আসছে। তাদের পায়ের শব্দ পাচ্ছি। তারা এই দিকেই আসছে বটে!"

সত্যই তাহারা আসিয়া পৌঁছিল! তিনটি সুস্থ সবল বালক—গায়ে গরম পোষাক, মাথায় নরম টুপি, পায়ে লাল মোজা—পিঠে একটা করিয়া চামড়ার ব্যাগ। ছেলেরা আসিয়া এই নূতন আগন্তুকের পানে সবিস্ময় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

কাবাস্থ কহিল, "এঁকে চেনো না?—ঠাকুমা হন যে! তোমাদের দেখতে এসেছেন!"

ছেলেরা অবাক হইয়া বৃদ্ধাকে দেখিতে লাগিল। সাদাসিধা পোষাক, গ্রাম্য সরলতা-ভরা মুখ—ছেলেরা বৃদ্ধার পানে চাহিয়া আপনা

হইতেই বুঝিতে পারিল, এই অপরিচিতা বৃদ্ধার হৃদয়ে প্রচুর স্নেহ! তাহারা ইচ্ছা করিলেই আকণ্ঠ পান করিতে পাইবে! কেমন এক বরাভয় নিশ্চিন্ত আশ্বাসে সে চোখের দৃষ্টি পরিপূর্ণ!

সেক্রেটারি আবার কথা কহিল, সে বলিল, "মাদাম, আজ নবাবের এক মহাদিন। মস্ত মিটিং হচ্ছে। ডেপুটি হবার মিটিং। আজ এ সভায় নবাব তাঁর সমস্ত শত্রুকে জয় করে মাথা তুলে দাঁড়াবেন।"

বৃদ্ধা সেক্রেটারির পানে ফিরিয়া চাহিল। সেক্রেটারি আবার কহিল, "শত্রুদের সংখ্যা কম নয়, আর ক্ষমতাও তাদের অনেকখানি। কিন্তু ভগবান নবাবের সহায়! আমাদেরই জয় হবে।"

এমন সময় এক কাফ্রী বালক আসিয়া সংবাদ দিল, ছেলেদের খাবার দেওয়া হইয়াছে। ছেলেরা বৃদ্ধাকে অভিবাদন করিয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিল। অপর লোকজন চলিয়া গেলে ঘরে যখন শুধু বৃদ্ধা ও কাবাস্থ রহিল, তখন বৃদ্ধা কাবাস্থকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই যে মিটিংয়ের কথা সবাই বলছে—এ কি, কাবাস্থ বল ত?"

কাবাস্থ কহিল, "আজকে ভারী জাঁকালো সভা বসেছে—এই সভায় আজই স্থির হবে যে নবাব বাহাদুর কর্সিকার ডেপুটি হবেন কি না!"

বৃদ্ধা চমকিয়া উঠিল, কহিল, "এঁ্যা,—এখনও ডেপুটি হয়নি! সে কি! আর আমি যে সকলকে বলে আসছি, সে ডেপুটি হয়েছে—তবে যে, আজ মাস-খানেক হল, আমি সাতে রোমানের পথে বাঁধা রোশনাইয়ের বন্দোবস্ত করেছিলুম,—তাহলে সকলকে আমি মিথ্যা কথা বলেছি, এতদিন—?"

কাবাস্থ তখন অনেক কথা কহিয়া বৃদ্ধাকে বুঝাইল যে এক মাস পূর্ব্বে নবাবের নাম শুধু ডেপুটি-পদপ্রার্থীর তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে, আজ পার্লামেণ্ট মহাসভায় সকলের মত সংগ্রহ করিয়া তবে ডেপুটি নির্ব্বাচনের পালা সাঙ্গ হইবে।

শুনিয়া বৃদ্ধা কহিল, "তাহলে আমার বার্ণার্ড এখন কোথায়? সেই সভায়?"

কাবাস্থ কহিল, "হাঁ, মাদাম।"

"মেয়েরা সেখানে যেতে পারে? তাদের বসবার বন্দোবস্ত আছে, সেখানে? তোমার মাঠাকরুণ তবে সেখানে যায়নি যে! তার স্বামীর জীবনে এত বড় একটা ব্যাপার, আর বৌমা সেখানে যায়নি? এদিনে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে কাছে পাবার জন্য তার যে বড় ইচ্ছে হবে। আয় কাবাস্থ, তুই আমায় সেখানে নিয়ে চল্ বাবা। আমি এখনই সেখানে যেতে চাই। সে কতদূর?"

"এই কাছেই। এতক্ষণে সভা বসে গেছে, বোধ হয়। তবে আমার যাওয়া হবে না। এখনি বৌমা ঘুম থেকে উঠবেন। তা ছাড়া আপনার ত সেখানে যাবার টিকিট নেই।"

"নাই থাকল! আমি বলব, আমি জাঁস্থলের মা! এ শুনলে আমায় ঢুকতে দেবে না? আমি সেখানে গিয়ে সব শুনতে চাই, দেখতে চাই।"

হায়, বেচারী মা—! সে জানে না, সেখানে গিয়া সে কি দেখিবে, কি শুনিবে!

কাবাস্থ কহিল, "তাহলে একটু অপেক্ষা করুন—আমি এখনই লোক সঙ্গে দিচ্ছি।"

"কাকেও সঙ্গে দিতে হবে না—তুমি খালি বলে দাও, বাড়ীটা কোন্‌দিকে। আমি নিজেই ঠিক যাব'খন।"

কাবাস্থ কহিল, "কিন্তু তাঁর শত্রুরা সেখানে তাঁর নামে ঢের কলঙ্ক, ঢের অপবাদ রটাবে মা!"

"রটাক। তাতে কিছু এসে যাবে না। আমার ছেলে কি-মানুষ, সে আমি যেমন জানি, তেমন ত আর কেউ জানে না। যার যা-খুসি

বলুক, আমি তাতে এতটুকু হঠব না! তবে আমি চল্লুম, কাবাসু।"
মাথায় টুপি তুলিয়া বৃদ্ধা বাহির হইল।

খানিকটা পথ গিয়া বৃদ্ধা দেখিল, এক প্রকাণ্ড বাড়ীর সম্মুখে লোকজন ও গাড়ী-ঘোড়ার ভারা ভিড়! সকলেই ব্যস্তভাবে চলাফেরা করিতেছে। মুখে বিরাট গাম্ভীর্য্য—লোকগুলা যেন কি এক বিপুল সম্ভাবনায় উদগ্রীব চঞ্চল হইয়া নড়িতেছে, ফিরিতেছে! বৃদ্ধা সেই বাড়ীর ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইল—তারপর দ্বারীকে আপনার পরিচয় দিলে সে একটু সরিয়া বৃদ্ধাকে পথ ছাড়িয়া দিল।

ভিতরে বিস্তীর্ণ হল—সজ্জিত, লোকে লোকারণ্য। অসংখ্য চেয়ার জুড়িয়া সারা পারির লোক বসিয়া গিয়াছে। সকলেরই মুখে একটা কৌতূহলের অধীর আগ্রহ। বৃদ্ধা আসিয়া দ্বিতলে একটা চেয়ারে স্থান সংগ্রহ করিয়া বসিল। আশে-পাশে দুই-চারিজন লোক নবাবের নাম লইয়া রঙ্গ-বিদ্রূপ করিতেছিল। বৃদ্ধার সেদিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না। নীচেকার সেই উত্তাল জন-তরঙ্গ ভেদ করিয়া পরিচিত একখানা মধুর মুখের সন্ধানে সে তখন ব্যস্ত ছিল। ঐ যে ঐ, একধারে চেয়ারে বসিয়া জাঁসুলে। হর্ষের এক চঞ্চল স্রোতে বৃদ্ধার বুক আলোড়িত হইল। জাঁসুলে এত কি গভীর চিন্তায় মগ্ন? আজ এ বিপুল সমারোহ তাহারই জন্য—এমন উৎসব-প্রাচুর্য্যের মধ্যে বার্ণার্ডের এত কি ভাবনা মাথায় আসিল? তবে কি ভাবনার কোন কারণ আছে?

বোধ হয়, আছে। না হইলে এত লোক ঠেলাঠেলি ঘেঁসাঘেঁসি বসিয়া আছে, আর নবাবের পার্শ্বে কেহ বসে নাই কেন? তাহার পাশেই চার-পাঁচখানা চেয়ার একেবারে খালি। যেন অস্পৃশ্য কুষ্ঠ-রোগীর ন্যায়ই সকলে জাঁসুলেকে দূরে রাখিয়া বসিয়াছে। কেন এ সতর্কতা?

নীচে তখন কি কতকগুলা বক্তৃতা হইতেছিল। বৃদ্ধা সেগুলা

ঠিক বুঝিতে পারিল না। কতকগুলা হিসাব-নিকাশের কথা টাকা-পয়সার প্রসঙ্গ। বৃদ্ধা সুগভীর স্নেহদৃষ্টিতে পুত্রের পানে চাহিয়া রহিল। আহা, মার এ প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে তোর সকল বাধা, সকল বিঘ্ন মুছিয়া যাক, বাছা!

সহসা বক্তা থামিয়া বসিয়া পড়িল। ঘণ্টা বাজিল। আর একজন লোক বক্তৃতা করিতে উঠিল। সে ভীষণ জনতা মুহূর্তে স্থির হইয়া বসিল। একটু পূর্ব্বে কোলাহলের এই যে একটা মিশ্র গুঞ্জনধ্বনি উঠিতেছিল, নিমেষে তাহা থামিয়া গেল। বৃদ্ধাও কি-এক সম্ভাবনার আশায় বক্তার পানে কৌতূহল দৃষ্টিতে চাহিল।

তাইত—লোকটা ও কি বলে। বার্ণাডের নাম করিল, না? বৃদ্ধা জীর্ণ মনের সকল শক্তি সংগ্রহ করিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিল। লি মার্কার প্রকাণ্ড খাতা খুলিয়া রিপোর্ট পড়িতেছিল। বৃদ্ধার চক্ষু ক্ষণে ক্ষণে কখনও পুত্রের, কখনও বা বক্তার পানে ঘড়ির কাটার মত ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। বক্তা নানা জটিল রহস্যের বিবরণী দিতেছিল, তারপর বলিল, আইনের প্রতি এতটুকু সম্ভ্রম নাই—প্রবঞ্চনা, ষড়যন্ত্র, অত্যাচারের চূড়ান্ত করিয়া বেড়াইয়াছে! দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্তেরও অভাব ছিল না! ভাড়া-করা গুণ্ডার মত এখন দেশের বুকে চাপিয়া বসিয়া লোকের রক্ত শুষিয়া খাইতে চায়! বক্তা উচ্ছ্বাসের আবেগে কহিল, "হাঁ, ভদ্র-মহোদয়গণ, দেশের লোকের রক্ত শুষিয়া খাইতেছে!"

কথাগুলা যেন বাজের মতই শুনাইল। বৃদ্ধ চমকিয়া উঠিল, বিস্ফারিত নেত্রে বক্তার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। এ কাহার কথা বলিতেছে? কে গুণ্ডা—দেশের রক্ত কে শুষিয়া খাইতে চায়?

লি মার্কার বলিল, "এখন আমার একটি প্রশ্ন আছে—আপনারা বুঝিয়া সে প্রশ্নের মীমাংসা করুন। চিরদিন দস্যু-তস্করের দলে যে মিশিয়া বেড়াইয়াছে, দেশের নাড়ীর সহিত যাহার কিছুমাত্র যোগ নাই,

তেমন একটা লোক আজ দেশের বুকে বসিয়া দেশের দণ্ডমুণ্ডের একজন কর্ত্তা হইতে চায়! থাকিবার মধ্যে আছে তাহার টাকা! টাকায় সে সকলের তাক্ লাগাইয়া দিয়াছে, স্বীকার করি। কিন্তু সে টাকা কোথা হইতে কেমন করিয়া সে সংগ্রহ করিয়াছে, আপনারা তাহার কোনো সন্ধান রাখিয়াছেন কি? সে টাকা যত মূর্খ নির্ব্বোধকে ঠকাইয়া সে সংগ্রহ করিয়াছে! এ টাকা সে লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছে, চুরি করিয়া আনিয়াছে—হাঁ ভদ্র-মহোদয়গণ, এ টাকা চোরের টাকা—বাটপাড়ের টাকা! আপনারা আজ তাহার টাকার জমক দেখিয়া দেশের প্রতি আপনাদের কর্ত্তব্য ভুলিবেন না। তাহার উপর যখন দেখিতেছেন, এখনও এখানে আসিয়াও তাহার প্রবঞ্চনা-বৃত্তি শোধরায় নাই, নির্লজ্জের মত এখানে বসিয়াও দিব্য সে লোক ঠকাইবার ব্যবসায় সুরু করিয়াছে—আপনারা বোধ হয় বুঝিয়াছেন, আমি কোন্ ব্যাপারের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছি। যদি না বুঝিয়া থাকেন, তবে স্পষ্টই খুলিয়া বলি।

"আপনারা কি ঐ কর্সিকার নূতন কোম্পানির সম্বন্ধে কোন সংবাদ রাখিয়াছেন? শূন্য খনি, আর আগাছার জঙ্গলের অবস্থাটা স্বচক্ষে কেহ দেখিয়া আসিয়াছেন কি? এই সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে এমন কি কেহ নাই, যিনি ঐ কোম্পানির শেয়ার কিনিয়াছেন? তাঁহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইতে কয়টা টাকা ঘরে ফিরিয়া পাইয়াছেন? সে কোম্পানির কার্য্যই বা কতদূর অগ্রসর হইল? বিজ্ঞাপনের চমক লাগাইয়া এই যে-ব্যক্তি দেশের লোককে ঠকাইতেছে, সে আজ কর্সিকার ডেপুটি-পদের প্রার্থী! সুখের বিষয়, এ কারবার-সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট হইতে তদন্তের আদেশ হইয়াছে। তখনই সকল সংবাদ আপনারা ওজন্ করিয়া বুঝিয়া পাইবেন! কিন্তু এইখানেই ইহার শেষ নয়! আরও একটা কথা আছে—

"এই লোকটি ভাবে, টাকায় সব পাওয়া যায়, দেশ-নায়কের বিবেক অবধি ক্রয় করিতেও সে পশ্চাৎপদ নয়, এতখানি তাহার ধৃষ্টতা! তাহার উপর সে একজন জেল-ফেরত আসামী—দাগী লোক! সে আজ বহু বৎসরের কথা—এই জাঁসুলে জেলে গিয়াছিল। তাহার প্রমাণও আমি দেখাইতেছি।"

লি মার্কার তখন বার্ণাডের রুগ্ন ভ্রাতার সমস্ত কলঙ্ক ভালো করিয়াই তাহার গায়ে লেপিয়া লেপিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলার সম্মুখে ধরিতে লাগিল। বিপুল জনতা রুদ্ধ নিশ্বাসে সব কথা শুনিয়া যাইতেছিল—সহসা তাহার মধ্য হইতে এক রমণীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "সাবাস! সাবাস!" সে নারী ব্যারণেস হেমারলিং।

শুনিতে শুনিতে বৃদ্ধার আপাদ-মস্তক এক বিষম ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। আর জাঁসুলে? এতক্ষণ নত মুখে তিনি বসিয়াছিলেন—শেষের এই অপবাদগুলা শুনিয়া তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। তাঁহার চোখ দুইটা বাঘের চোখের মতই তখন জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছিল।

লি মার্কারের বক্তৃতা তখনও শেষ হয় নাই। সে বলিতেছিল, "এখন আপনারা বলুন, এমন লোককে আপনারা কৌন্সিলে বসিতে দেখিলে কি সুখী হইবেন? গর্ব্বে আপনাদের বুক ভরিয়া যাইবে? দেশে কি আর দ্বিতীয় যোগ্য ব্যক্তি নাই? যদি না থাকে, তবে কর্সিকাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া সাগর-গর্ভে ডুবাইয়া দিন্, কোন ক্ষোভ থাকিবে না।"

লি মার্কার উপবেশন করিল। জন-তরঙ্গে তখন সমালোচনার একটা অস্ফুট কাকলী উঠিয়াছে! নানা তর্কের মৃদু সঙ্কেত! স্পষ্ট কিছু বুঝা যায় না। সেই অস্ফুট কাকলীর মধ্যে নবাব তাঁহার বিপুল দেহ লইয়া দণ্ডায়মান হইলেন—ললাট ঘর্ম্মাক্ত। নবাব গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ—"

বিরাট সভা আবার স্তব্ধ হইল। সকলেই নবাবের পানে চাহিয়া দেখিল। একজন উচ্চ কণ্ঠে কহিল, "নবাবের জবাবটা এখন শোনা যাক্—কি বলে ?" বৃদ্ধা বিস্ফারিত নেত্রে পুত্রের পানে চাহিয়া রহিল।

রুমালে ললাটের ঘাম মুছিয়া একবার কাশিয়া নবাব কহিলেন, "আমি আমার নির্ব্বাচন সমর্থন করিবার জন্য কিছু বলিতে চাহি না। আপনাদের ইচ্ছা না হয়, আমায় নির্ব্বাচিত করিবেন না, তাহাতে আমি বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হইব না। কিন্তু ঐ শেষের অপবাদ সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাই। আমাকে জেল-ফেরত আসামী, দাগা বলা হইয়াছে এবং লি মার্কার তাহার প্রমাণ অবধি আপনাদের সম্মুখে খাড়া করিয়া দিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন। এই অপবাদ-সম্বন্ধেই শুধু একটি কথা আমি বলিতে চাই। কেন না, আমার নিজের নাম, বংশ ও সন্তানদের মঙ্গলের জন্যও সকল কথা প্রকাশ করা সঙ্গত এবং তাহা আমার কর্ত্তব্য।

"ভদ্রমহোদয়গণ, চুরি বাটপাড়ি করিয়া এ টাকা, এ ঐশ্বর্য্য আমি সংগ্রহ করি নাই। যে যাহা বলে, বলুক—কিন্তু আমার মত যদি কেহ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সমস্ত আত্মীয়-জন ছাড়িয়া আপনার সাধের জন্মভূমি হইতে বহুদূর দেশে গিয়া শরীর খাটাইয়া পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, তবে তিনিই বুঝিবেন, আমার সে কষ্ট, সে পরিশ্রমের মূল্য কি। সে কথার প্রয়োজন নাই—সে কথা আমি এখানে তুলিতেও চাহি না।

"এই যে অপবাদে আমায় আজ কলঙ্কিত করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাই। এ অপবাদ একেবারে মিথ্যা। আপনারা একটু কষ্ট করিয়া যদি সন্ধান লন, তবে সহজেই দেখিতে পাইবেন, যে, যে-সময় প্যারিতে জাঁস্যুলে নামে এক ব্যক্তির জেল হয়, সে সময় আমি বিদেশে ছিলাম। আরও দেখিবেন, আমার নাম বার্ণাড জাঁস্যুলে—কিন্তু জেল-ফেরত জাঁস্যুলের নাম লুই।"

সহসা নবাবের কণ্ঠরোধ হইল। কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইবার সময় চকিতের জন্য দ্বিতলের একটা আসনের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল—অমনি তাঁহার সারা অঙ্গ কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল। এ কি, এ যে মা! নবাব থপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন—আর একটি কথাও বলিতে পারিলেন না।

চকিতে তাঁহার মনের মধ্যে ঝড় বহিয়া গেল। বলার আর বাকী কি রহিল? এমনই স্বার্থপর কুপুত্র সে, যে-কথা মা জানিতেন না—যে-কথা জানিবার তাঁহার সম্ভাবনাও ছিল না, সেই কথা হঠাৎ কি এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে জাঁসুলে বলিয়া ফেলিলেন! হায়, তুচ্ছ পদ-গর্ব্বের লোভে মার মনে আজ তিনি কতখানি আঘাত দিলেন! বহু চেষ্টা করিয়া আবার তিনি উঠিলেন, কহিলেন, "আমায় ক্ষমা করিবেন। ইহার অধিক আর আমি বলিতে পারিব না। বলিবার শক্তি বা অধিকারও আমার নাই। কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, ও অপবাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই—ও কলঙ্ক হইতে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত।"

জন-সঙ্ঘ সহসা নিষ্ঠুর বাধা পাইয়া বিষম বিচলিত হইয়া উঠিল। নবাবের করুণ উক্তিতে যাহাদের একটু সহানুভূতি উদ্রিক্ত হইতেছিল, তাহারাও বিরক্ত হইল। এমনই কোলাহল-বিড়ম্বনার মধ্যে বজ্রের মত সভাপতির বাণী ধ্বনিয়া উঠিল, "বার্ণার্ড জাঁসুলের নির্ব্বাচন নামঞ্জুর।"

একটি মাত্র কথা! কিন্তু একটা লোকের জীবন সে কথার ঘায়ে একেবারে ভাঙ্গিয়া চুর মার হইয়া গেল

উপরে বসিয়া জাঁসুলের মা অবাক হইয়া গেলেন—এ কি—! লোকজন চলিয়া যাইতেছে যে! চারিদিকে ছত্রভঙ্গ ব্যাপার! দেখিতে দেখিতে বিস্তীর্ণ হল খালি হইয়া গেল। বার্ণার্ডও যে উঠিয়া যায়!

ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া বৃদ্ধা পার্শ্ববর্ত্তিনী এক মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হল কি? সব উঠে যাচ্ছে যে?"

"নবাব হেরে গেল—ডেপুটি হল না।"

"হল না!" বৃদ্ধার বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। তাহার মুখ পাণ্ডু হইয়া গেল। কোনমতে সম্মুখের রেলিঙে ভর দিয়া বৃদ্ধা আপনাকে পতন হইতে রক্ষা করিল;—তাহার মাথা ঘুরিতেছিল, পা কাঁপিতেছিল। তার পর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই বৃদ্ধা সব বুঝিয়া লইল। পুত্র কি কথা বলিতে গিয়া আর বলিতে পারিল না? বলিতেছিল, কিন্তু তাহার সহিত চোখো-চোখি হইবামাত্র থামিয়া গেল! পুত্র শুধু মার জন্য এতখানি স্বার্থত্যাগ করিল! আপনার ভবিষ্যৎ—আপনার সকল সাধ, সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া স্বচ্ছন্দে সে এত বড় কলঙ্কের কালি মুখে মাখিয়াই বসিয়া রহিল! বৃদ্ধা মুহূর্ত্তে বুঝিল, হতভাগা লুই শুধু নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই—তাহার অমন ভাইয়েরও সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইল! বৃদ্ধার মনে হইল, এই এতগুলা লোককে দাঁড় করাইয়া নিজে সে একবার সব রহস্য সকলের কাছে প্রকাশ করিয়া বলে! একজন ছেলে খারাপ বলিয়া সে-অপমান প্রকাশ হইবার ভয়ে আর একজনের উপর অবিচার করিবে, এমন প্রাণ তাহার নয়। ইহা সে চায়ও না। কোথায় বার্ণার্ড? আসুক সে—মমতার কোন প্রয়োজন নাই! সত্য কথা সে খুলিয়া বলুক—এ মিথ্যা অপবাদ তাহার মাথায় বহিবার কোন প্রয়োজন নাই! মার প্রাণে আঘাত বাজিবে, বাজুক! এ ত্যাগ মা হইয়া ছেলেকে সে কখনই মাথায় তুলিতে দিবে না!

বৃদ্ধা অগ্রসর হইয়া আসিয়া একজনকে সম্মুখে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় গেল, বার্ণার্ড? নবাব,—আমার ছেলে?"

লোকটা কহিল, "এই যে, আপনিই তাঁর মা? তিনি আমায়

পাঠালেন, আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য। তিনি গাড়ীতে আছেন। আসুন।"

বৃদ্ধা তাহার সহিত নীচে নামিয়া আসিল। বাহিরের দালানে তখনও বহু লোক দাঁড়াইয়া গল্প-গুজব করিতেছিল—নবাবের নামে হাসি-ঠাট্টাও বেশ চলিতেছিল। একজন বলিল, "কিন্তু বলতে বলতে হঠাৎ অমন থেমে গেল কেন?"

আর একজন হাসিয়া কহিল, "বুঝলে না? একটা কথা বলা সহজ—তারপর ঐ প্রমাণ-পত্র যে লি মার্কারের হাতে—তাই আর কি চেপে গেল।"

বৃদ্ধার মাথা চন্‌চন্ করিয়া উঠিল। সে তীব্র স্বরে কহিল, "না, তা নয়। শুনুন আপনারা তবে, আমি বলছি—আমি তার মা—বার্ণাডের মা—আমি সব কথা খুলে বলছি। আমার দুই ছেলে,—বার্ণার্ড ছোট, বড়র নাম লুই।" বৃদ্ধা সহসা দেখিল, সম্মুখে দাঁড়াইয়া লি মার্কার। সে অগ্রসর হইয়া বলিল, "এই যে—আপনিই না অত কথা বলছিলেন—বার্ণার্ডকে অত দোষ দিচ্ছিলেন! শুনুন, আমি তার মা—আমার দুই ছেলে,—বার্ণার্ড আর লুই। এই লুই প্রথম বয়সে—"

লোকগুলা বিদ্রূপের একটা তীব্র কটাক্ষ হানিয়া চলিয়া গেল। বৃদ্ধা কাতরভাবে কহিল, "ওগো, তোমরা একটু দাঁড়িয়ে শুনে যাও। একটু শোনো, না হয় তাকে ডেপুটি নাই করলে! তা বলে একজন নিরীহ নির্দ্দোষ লোকের উপর অন্যায় অবিচার করো না—"

কিন্তু হায়, এ যে অরণ্যে রোদন! এ যেন ভিতরে এতক্ষণ ঘোড়দৌড়ের খেলা চলিতেছিল—খেলা-ভঙ্গে তেমনই লঘু চিত্তে শিষ দিতে দিতে সকলে ঘরে ফিরিতেছে! অথচ নিষ্ঠুর সব, জানে না যে, এই খেলায় তাহার প্রিয়তম, তাহার অমন গুণের পুত্র বার্ণার্ডের কি দারুণ

সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে—তাহার বুকের পাঁজ্‌রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ! বৃদ্ধার মনে হইল, ভগবান কি নাই—এ পাপের শাস্তি কি তিনি দিবেন না ?

এমন সময় নবাব আসিয়া করুণ কণ্ঠে ডাকিলেন, "মা, এসো, বাড়ী এসো ।"

বৃদ্ধা ঝাঁপাইয়া পুত্রের বুকে মুখ লুকাইল—ফুঁপাইয়া কোনমতে বলিল, "কেন তুমি সব কথা খুলে বললে না, বাবা ? কেন এ কলঙ্ক মেখে বসে রইলে ? সব খোয়ালে যে !"

নবাব ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "কিছু খোয়াই নি মা। কিছু চাই না—আমি। কলঙ্ক ? দিক্ ওরা কলঙ্ক—আমার মার কোল আছে—সেখানে আমার জন্যে প্রচুর শান্তি জমা রয়েছে। আমার কি সর্ব্বনাশ হবে ? কিছু না ! তুমি বাড়ী এসো।"

নবাব মাকে টানিয়া লইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। কিন্তু মাকে মুখে সান্ত্বনা দিলে কি হইবে, বুক তাহার ফাটিয়া যাইতেছিল। গাড়ী চলিলে মার বুকে মাথা রাখিয়া ছোট শিশুর মতই মৃদু কণ্ঠে নবাব ডাকিলেন, "মা, মা, মা আমার—" সে স্বরে বুক-ভাঙ্গা বেদনা যেন উছলিয়া উঠিতেছিল !

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

জীবন-লীলা

মাদাম জেঙ্কিন্স সজ্জিত সুন্দর কক্ষে বসিয়া পিয়ানোর সুরে কণ্ঠ ছাড়িয়া নূতন গানটা গাহিবার চেষ্টা করিতেছিল। ওস্তাদ সেদিন সকালে আসিয়া এই গানটাই শিখাইয়া গিয়াছিল। মাদাম গাহিতেছিল,

ভালবেসে তারে কেঁদে সারা আমি
ভাঙে বুক সখি, বলিতে।
সে যে বলে মোরে, 'ভালবাসি কত'—
সে কেবলি মোরে ছলিতে।

বেদনার এই স্বর-লহরী বাহিরের আকাশ-বাতাসটুকুকে অবধি করুণ করিয়া তুলিয়াছিল। মাদাম আবার গাহিল,

এই যে প্রাণের প্রেম-আরাধন,
আদর সোহাগ, প্রীতির বচন—

গাহিতে গাহিতে মাদামের বুক বেদনায় ভরিয়া উঠিল। হঠাৎ সুর ছাড়িয়া সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। গানের সুরে আজ নিজেরই প্রাণের সহস্র সুপ্ত বেদনা সাপের মত ফণা তুলিয়া উঠিয়াছে! সেগুলা যেন এখনই তাহাকে দংশন করিবে! মাদাম পিয়ানো ছাড়িয়া উঠিয়া জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে কৃত্রিম পাহাড়ের গায়ে-রচা কৃত্রিম নির্ঝর হইতে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জল সহস্র ধারায় উছলিয়া পড়িতেছিল—রৌদ্র-কিরণ পড়ায় সে জল আবার রূপালি ঝালরের মত দেখাইতেছিল। মাদাম একদৃষ্টে সেই নৃত্যশীল জলরাশির পানে চাহিয়া রহিল।

ডাক্তার জেঙ্কিন্স গৃহে ছিল না। কাজের ভিড়ে ও রোগীর আহ্বানে ডাক্তার আজ কয়দিন প্যারি ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। তাই এই নিঃসঙ্গ নির্জ্জনতায় মাদামের প্রাণের মধ্যে নিষ্ফল প্রণয়ের সহস্র বেদনা কোনমতেই আর আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। সে আজ কত দিনেরই বা কথা! ইহারই মধ্যে তাহাদের প্রণয়-স্রোতে এতখানি বাধা লাগিল, কেন? আজ কয় মাস ধরিয়া দুইজনের কথাবার্ত্তাও-অনেকটা ঢিলা পড়িয়া আসিয়াছে। আহারের সময় মাত্র দুইজনের শুধু সাক্ষাৎ হইত—তখন সংসারের প্রয়োজনীয় দুই-চারিটা

াপা-বাঁধা কথা ছাড়া উভয়ের মধ্যে আর কোন কথাই হইত না। পর কথা যদি উঠিত ত সে মাদামের পুত্র মারাণকে লইয়া। ডাক্তার মারাণের সম্বন্ধে দুই-চারিটা কঠিন মন্তব্য প্রকাশ করিত, মাদাম স্তব্ধ হইয়া সে মন্তব্য শুনিয়া যাইত,—চোখের পিছনে অশ্রু ঠেলিয়া বাহির বার চেষ্টা পাইত, মাদাম প্রাণপণে সে অশ্রু রোধ করিত। এই প্রাণহীন বর্ব্বর যদি সে অশ্রু দেখিয়া ফেলে ত পরিহাসের আর সীমা থাকিবে না! মার প্রাণের সে আন্তরিক বেদনার এতটুকু অপমানও মাদাম সহ্য করিতে পারিবে না!

এত দুঃখেও ডাক্তারের প্রতি মাদামের ভালবাসা কিন্তু একতিল কমে নাই! আজ কাল করিয়া বিবাহ-ব্যাপারটা পিছাইতে পিছাইতে ক্রমেই চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। ইচ্ছা থাকিলেও মাদামের সে কথা নূতন করিয়া তুলিবার প্রবৃত্তি ছিল না! অথচ বিবাহ-বন্ধন-হীন এই ঘৃণ্য জীবনও আর বহন করা যায় না! একবার অতিকষ্টে মাদাম কথাটা তুলিয়াছিল—ডাক্তার হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল, "সুবিধে-মত হবে'খন। তোমার কি সন্দেহ হয় আমাকে?" ইহার পর মাদামের মুখে আর দ্বিতীয় কথা জোগাইয়া ওঠে নাই।

তার পর চারিদিকে বিপদের মেঘ ঘনাইয়া আসিল। ডিউকের মৃত্যু ডাক্তারের সমস্ত আশার মূল কাটিয়া দিয়াছে! এত বড় একটা রোগীকে মৃত্যু আসিয়া হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া গেল! ডাক্তার বিষম রাগিয়া গেল; প্রমাদ গণিল। ডাক্তারের উপর দেশের লোকের বিশ্বাসও কমিয়া গিয়াছে, বেথলিহামের অমন আশ্রমটাও লোকসানে দাঁড়াইল—নবাব আর তাহাতে এক পয়সা দিয়াও সাহায্য করিবে না! নানা কারণে কোন দিকেই আর সামঞ্জস্য রক্ষা করা যাইতেছিল না। ডাক্তারের আর্থিক অবস্থাও ক্রমে খারাপ হইয়া দাঁড়াইল! এই সকল ব্যাপারের জন্য ডাক্তার কিছু দিনের মত পারি ছাড়িয়া বাহিরে কোথাও থাকিবার

সঙ্কল্প করিল। মাদাম নিঃসঙ্গ একা এই প্রকাণ্ড পুরীর মধ্যে পড়িয়া রহিল। বিবাহ যদি হইয়া যাইত, তাহা হইলে মাদাম কেমন থাকিত, বলা যায় না—কিন্তু এই অবহেলিত জীবন লইয়া এত বড় পুরীর মধ্যে পড়িয়া থাকা—এ অসহ্য কষ্ট, নির্ম্মম দুঃখ!

তবু এ কষ্টের মধ্যেও মাদাম কোনমতে একটু সান্ত্বনা খুঁজিয়া লইয়াছিল। খুঁজিয়া বাছিয়া মনের মত গানগুলি গাহিয়া কোনমতে সে দিন কাটাইবার চেষ্টা করিতেছিল। আপনার প্রাণের সহিত কথা কহিয়া, আপনার মনকে এ সমস্ত বেদনার সাক্ষ্য রাখিয়া মাদাম একটু সান্ত্বনার খোঁজ করিতেছিল—কিন্তু কোথায় পরিতৃপ্তি, কোথায়ই বা সান্ত্বনা! কিছুই মিলে নাই!

বাহিরের পানে চাহিয়া মাদাম আপনার সমগ্র জীবনটার উপর দিয়া একবার চোখ বুলাইয়া লইতেছিল, এমন সময় দাসী আসিয়া হাতে একখানা কার্ড দিল। কার্ডে লেখা আছে—"হার্ত্তুজ্—এজেন্ট।"

দাসী কহিল, লোকটি মাদামের সহিত দেখা করিতে চায়—বিশেষ প্রয়োজন আছে।

মাদাম কহিল, "তুমি বলো, ডাক্তার সাহেব বাড়ী নেই!"

দাসী কহিল, "বলেছি, তিনি বললেন, মাদামের কাছেই তাঁর দরকার।"

"আমার কাছে?" মাদাম ভাবিল, আমার সহিত এ অপরিচিত লোকটার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে! নিশ্চয় কোন ভুল করিয়াছে! তবু একটু পরে কহিল, "আচ্ছা, যাও, তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও।"

হার্ত্তুজ্ আসিয়া মাদামকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। কাঠের মত শক্ত মুখ—ভাবহীন চক্ষু—ক্রমাগত আইন ঘাঁটিয়া বেড়াইলে যেমন একটা মমতা-হীন কাঠিন্যের ছাপ মুখে-চোখে আঁটিয়া বসে,

লোকটার মুখে-চোখে তেমনই একটা কঠিন পরুষতা! সে মুখ দেখিলে বুকের রক্ত জল হইয়া যায়!

মাদাম কহিল, "আপনি জানেন না, বোধ হয়, আমার স্বামী ডাক্তার জেঙ্কিন্স এখন এখানে নেই—আর তাঁর বিষয়-কর্ম্ম সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না?"

হাতে কাগজের তাড়া দেখাইয়া হার্ত্তুজ্ কহিল, "আমি সব কথা জানি, মাদাম, তাঁর কাছ থেকেই আমি আসচি।"

মাদামের মুখ চকিতে পাংশু হইয়া গেল। মাদাম কহিল, "তাঁর কাছ থেকে আসছেন, আপনি?"

"হাঁ, মাদাম। ডাক্তারের অবস্থা এখন,—অর্থাৎ সে সব আপনি ত জানেনই। চারদিকেই তাঁর সব কারবারে লোকসান যাচ্ছে। তাই তিনি বাড়ী, গাড়ী, ঘোড়া, আসবাবপত্র, অর্থাৎ সবই আর কি, এই মোক্তার-নামায় আমায় বিক্রী করবার অধিকার দিয়েছেন।"

মাদাম একটা কথা বলিতে যাইতেছিল,—মোক্তার-নামা কেন? এ কাজ কি আমি করিতে পারিতাম না? কিন্তু সহসা দারুণ অভিমান তাহার বুকের মধ্যে গর্জ্জিয়া উঠিল! ইহার সহিত তর্ক? না, ঘৃণা হয়! মাদামকে নিরুত্তর দেখিয়া হার্ত্তুজ্ আবার কহিল, "একটা কথা—আপনাকে না বললেও নয় মানে, ডাক্তার জেঙ্কিন্স পারিতে করে ফিরবেন, আর ফিরবেন কি না, তারও কোন ঠিকানা নেই—অর্থাৎ যেখানে তিনি অমন মাথা তুলে অতখানি প্রতিপত্তিতে বাস করতেন, এখন সব খুইয়ে সেখানে থাকা বুঝতেই ত পারছেন—তাই আর কি তিনি বলেছেন, আপনি যদি আপনার ছেলের সঙ্গে থাকতে চান ত তাতে তাঁর কোন আপত্তি নেই। মানে, আপনি এখন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই—অর্থাৎ বুঝচেন কি না—"

মাদামের কানে আর কোন কথাই প্রবেশ করিল না। সুতার

মুখ ধরিয়া টানিলে রিলে-জড়ানো সুতা যেমন অনর্গল বাহির হইতে থাকে, হার্ত্তুজের মুখ হইতে তেমনি কথার রাশি বন্ধন-মুক্ত হইয়া অবাধে বাহির হইতেছিল। মাদামের কর্ণে তখন চকিতে সেই গানের সুরের রেশটুকু বাজিয়া উঠিল—

এই যে প্রাণের প্রেম-আরাধন,
আদর, সোহাগ, প্রীতির বচন—

মাদাম ভাবিল, মিথ্যা, মিথ্যা কথা! এত মিথ্যা কে রচিয়াছিল? ভালবাসা—! সে ত শুধু কথার কথা মাত্র! তখনই আবার তাহার চিত্তে নারীর গর্ব্ব জাগিয়া উঠিল। দৃপ্ত স্বরে মাদাম কহিল, "থাক্, আর কোন কথা বলতে হবে না, মশায়, আমি সব বুঝেচি। বুঝেচি যে, আমায় এই দণ্ডে ঘর ছেড়ে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে—একটা দাসীর মত পথে দাঁড়াতে হবে। আর কথা বলে আমায় অপমান করবেন না। যথেষ্ট হয়েছে, আমি এখনই যাচ্ছি।"

হার্ত্তুজ একটু সহানুভূতি দেখাইবার উদ্দেশ্যে কঠিন মুখে হাসির রেখা টানিয়া কহিল, "আমি কি করব বলুন, মাদাম, এর জন্য যথার্থই আমি দুঃখিত! তবে ডাক্তার বলে দিয়েছেন, এ ছাড়াছাড়ির জন্য তাঁর খুব কষ্ট হয়েছে—কিন্তু কি করেন? তিনি নিরুপায়! হাঁ, তবে তিনি বলে দেছেন—টেবিল, চেয়ার, সোফা, কোচ, বাজনা,—এ সব জিনিসের মধ্যে আপনি যা দরকার মনে করেন, সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন—এ বিষয়ে আপনার মতকে মেনে চলতে আমি বাধ্য। ডাক্তার আপনাকে একেবারে নিঃসম্বল করতে চান না—এই আর কি মানে!"

মাদাম বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "তাঁর যথেষ্ট অনুগ্রহ! থাক্, এ অনুগ্রহের কোন প্রয়োজন নেই।" বলিয়া মাদাম ঘণ্টা টিপিল, নিমেষে এক দাসী আসিয়া দেখা দিল।

মাদাম কহিল, "আমি এখনই বেরুব—আমার টুপি আর ক্লোকটা দিয়ে যাও। শীগ্‌গির—"

দাসী চলিয়া গেলে মাদাম হার্ত্তুজ্‌কে কহিল, "এখানকার এ সমস্ত জিনিষ ডাক্তার জেঙ্কিন্সের। আপনি এ সমস্তই বিক্রী করিতে পারেন। আমি এর কিছুই নিতে চাই না—আমার কোন দরকারও নেই।"

হার্ত্তুজ্‌ কোন জবাব দিল না। জবাবের কোনই প্রয়োজন ছিল না। তাহার কাজ শেষ হইয়াছে—বাকীটুকুতে হস্তক্ষেপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

মাদাম একটা ড্রয়ার খুলিয়া কতকগুলা চিঠি-পত্র বাহির করিল। এগুলা মারাণের চিঠি। যতগুলি চিঠি সে মাদামকে লিখিয়াছিল, মাদাম তাহার সবগুলিকেই যত্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। এইগুলাকে নাড়িয়া চাড়িয়া বুকে ধরিয়াই মাদাম আপনার অতৃপ্ত স্নেহের ক্ষুধা মিটাইতে বসিত! দাসী পোষাক আনিয়া দিলে মাদাম তাহা গায়ে দিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া আবার ড্রয়ার খুলিল,—যদি একখানা চিঠিও পড়িয়া থাকে! না, নাই—একখানিও নাই!

দাসী কহিল, "একখানা গাড়ী ডেকে দেব?"

"না, গাড়ী কি হবে?" মাদামের স্বর অচঞ্চল। মাদাম বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

বেলা তখন পাঁচটা বাজিয়াছে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বার্ণার্ড জাঁস্লে মার বুকে মাথা গুঁজিয়া গাড়ী করিয়া সম্মুখে ঐ পথ দিয়াই চলিয়া যাইতেছিল। মাদাম জেঙ্কিন্সের জীবন-নাটকের অভিনয়টুকুও নবাবের জীবন-অভিনয়ের মতই করুণ, বেদনাময়। না, বুঝি, এ অভিনয়ের খেলা আরও করুণ, কেন না, ইহা নিতান্তই আকস্মিক, নিতান্তই অতর্কিত!

মাদাম জেঙ্কিন্স ক্ষিপ্র চরণে চলিয়াছিল। কি দারুণ, ভীষণ এ পতন! পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে বসিয়া ছিল—চারিধারে সম্ভ্রম ও সম্মানের কি বিপুল সমারোহ—আর এখন? মাথা গুঁজিবার এতটুকুও আশ্রয় নাই। নিতান্তই নাম-হানা অভাগিনী, পথের কাঙালেরও অধম সে! হারে নির্ম্মম অদৃষ্ট!

মাদাম এখন কোথায় যাইবে? কি করিবে?

মারাণের কথাই আজ সকলের আগে মনে জাগিল। কিন্তু পুত্রের কাছে সকল অপরাধ, সকল ত্রুটি স্বীকার করা—মান-ইজ্জৎ খোয়াইয়া অমন উঁচু-মন ছেলের কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়া—সে বড় কষ্ট—ওগো, সে কষ্ট সহিবার সামর্থ্য যে মাদামের আজ নাই! কি বলিয়া কোন্ মুখ লইয়া অমন ছেলের সম্মুখে গিয়া আজ সে দাঁড়াইবে? না, না, সে পারিবে না! তবে? মৃত্যু! মৃত্যুই তাহার একমাত্র উপায়—মুক্তির একটিমাত্র পথ! যত শীঘ্র পারা যায়, মৃত্যুর হাতেই আপনাকে সঁপিয়া দিতে হইবে! কিন্তু কেমন করিয়া, কোথায় গিয়া মরা যায়? মৃত্যু-লোকে যাইবার পথ ত অনেক! মনে মনে সব পথগুলারই একটা ছবি সে আঁকিয়া লইল। সহসা মাদামের মনে হইল, কিন্তু এ মৃত্যু— আত্ম-হত্যার সে বিকৃত বীভৎস মূর্ত্তি, তীব্র কুৎসা—না, না, চারিধারে কোলাহল পড়িয়া যাইবে। সে কোলাহলে ছেলের মাথা আরও হেঁট হইবে! সে অনেক সহ্য করিয়াছে—বেচারা এ-কলঙ্ক সে সহ্য করিতে পারিবে না! না, না, ছেলের হিতের জন্য আত্মহত্যা করা হইবে না! আত্মঘাতিনী সে হইতে পারিবে না! তবে—উপায়, উপায় কি?

মাদাম জেঙ্কিন্স মুহূর্ত্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল, পরক্ষণেই কি ভাবিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। সহসা কে অভিবাদন করিয়া ডাকিল, "মাদাম জেঙ্কিন্স—"

মাদাম মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখে, মার্কুইস দ্য মপার্ভ—শক্ত প্লেট-ওয়ালা সার্টের উপর কালো ভেলভেটের কোট চড়াইয়া দর্প-স্ফীত বক্ষে দাঁড়াইয়া—জামার বোতামের ছিদ্রে এক গুচ্ছ ফুল গাঁথা—মুখে মৃদু হাসির রেখা। মাদাম মৃদু হাসিয়া প্রত্যভিবাদন করিয়া দ্রুত সরিয়া গেল, দাঁড়াইল না।

মোরার প্রিয় বন্ধু মপার্ভ। মুখে হাসির রেখা টানিলেও ভিতরটা তাহার আজ পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছিল। টাকা-কড়ি সব বন্যার জলে ধুইয়া ভাসিয়া গিয়াছে। পাওনাদারের ভিড়ে বাড়ীতে টিঁকিবার জো নাই। কেবলই তাগাদা আসিতেছে! পোষাকের দাম, আসবাবের দাম—দেনায় মপার্ভের মাথার চুল অবধি বিকাইবার জো! পাওনাদারের দল শেষ তাগাদায় হার মানিয়া আদালতের আশ্রয় লইয়াছিল। সেই দিনই পাঁচ-ছয়খানা ক্রোকের নোটিশ জারি হইয়াছে। মাথা আর তুলিয়া রাখা যায় না। মপার্ভের বুকের পাঁজরা-গুলা যেন চূর্ণ হইয়া যাইবে, এমনই মনে হইতেছিল। নোটিশ পাইয়া মপার্ভ বাড়ী ছাড়িয়া পথে ঘুরিতেছিল। কি করিবে, উপায়ও স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। অত-বড় বংশের ছেলে হইয়া দেনার দায়ে শেষে কি জেলে যাইবে—মপার্ভ জেলে? না, না, না।

গোপনীয় চিঠি-পত্রগুলা পুড়াইয়া ছাই করিয়া ছোট-খাট ব্যাপার-গুলা সারিয়া লইয়া মপার্ভ আজ পথে বাহির হইয়াছে, মরিবার জন্য। সে মরিবে। কিন্তু কোথায় গিয়া, কেমন করিয়া মরিবে? পারিতে নয়। এখনই একটা হুলুস্থুল বাধিয়া যাইবে। কলঙ্কের কালিতে সহর কালো হইয়া উঠিবে। মরিবে সে নিশ্চয়—কিন্তু পারির বাহিরে গিয়া মরা চাই। এক নিভৃত নির্জ্জন কোণে! বিকৃত মুখে পরিচয়ের চিহ্নমাত্র থাকিবে না। মপার্ভ তাই মরিবার জন্য এক নিভৃত বিজন কোণের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল।

হাঁটিয়া সহর পার হইয়া মপার্ভ এক ক্ষুদ্র গ্রাম-প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিল। তখন রাত্রি হইয়াছে। খানিকটা পথ চলিয়া মপার্ভ দেখে, এক কয়লার দোকানের পাশে গেট-ওয়ালা একটা বাগান। বাগানের ফটকে অস্পষ্ট আলোর অক্ষরে লেখা রহিয়াছে, "বাথ" (স্নানাগার)। মপার্ভর মুখে হাসি দেখা দিল। আঃ, এতক্ষণে মিলিয়াছে,—ঠাঁই মিলিয়াছে! এই নিভৃত গ্রাম-প্রান্তে ক্ষুদ্র একটা বাথ-রুমে,—ঠিক! কেহ চিনিতে পারিবে না—কোন গোল হইবে না—নাম-হীন পরিচয়-হীন একটা সাধারণ শবের মতই তাহার মৃত দেহটাকে ইহারা টানিয়া কোথায় জঙ্গলের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিবে'খন। ঠিক হইয়াছে! মরিবার জন্য এমন ঠাঁই আর কোথাও মিলিবে না ত!

মপার্ভ ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিল। সম্মুখেই খানিকটা সরু পথ—পথের দুইধারে বন্যগাছের ঝোপ! পথ গিয়া একটা কুটীরের দ্বারে মিশিয়াছে! মপার্ভ দ্বারের সম্মুখে আসিয়া ডাকিল, "বেয়ারা—"

একটা লোক আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

মপার্ভ কহিল, "জল তোয়ের কর। স্নান করব।"

মপার্ভকে ভিতরে বসিতে বলিয়া ভৃত্য চলিয়া গেল। ঘরের সম্মুখেই একটা প্রকাণ্ড আয়না ছিল। মপার্ভ তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আপনার প্রতিবিম্বের পানে চাহিয়া রহিল—এই গর্ব্ব-স্ফীত বুক, এই তেজোদ্দীপ্ত মুখ—না, আর এখন ও-সব দেখিয়া ও-সব ভাবিয়া কি ফল? হাতের পাশা পড়িয়া গিয়াছে—ও-সব কথা ভাবিবার অবসর নাই, প্রয়োজন নাই!

ভৃত্য আসিয়া সেলাম করিয়া জানাইল, জল তৈয়ার হইয়াছে। "চল—" বলিয়া মপার্ভ কুটীরের বাহিরে আসিল। বাগানের এক কোণে বাথ-রুম—মপার্ভ ভিতরে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

* * * * *

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কম্পিত বক্ষে মাদাম জেঙ্কিন্স আঁদ্রের ষ্টুডিয়ো-ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরে কেহ নাই! মাদামের পা কাঁপিয়া উঠিল। সে যেন চোর—এ ঘরের বিমল শান্তিটুকু যেন সে চুরি করিতে আসিয়াছে! ঘরের একটা চাবি তাহার কাছে পূর্ব্ব হইতেই ছিল—মারাণের দেওয়া চাবি—আর একটা মারাণ নিজে রাখিত। কাজেই নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিতে বাধিল না!

চির-প্রথামত টেবিলের উপর ভাঁজ-করা এক টুকরা কাগজও ছিল। মারাণের লেখা। মারাণ লিখিয়া রাখিয়াছে, "আমি রিহার্সালে যাইতেছি। সন্ধ্যার পর ফিরিব।"

এ ব্যবস্থা বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। মা যদি আসিয়া পুত্রকে দেখিতে না পায়, তাই বাহিরে গেলে কখন্ তাহার ফিরিবার সম্ভাবনা---সে কথা এমনই ভাবে সে লিখিয়া রাখিত। সেই লেখাটুকু বুকে ধরিয়া মাদাম সেই কাগজটুকুতে অজস্র চুম্বন ঢালিয়া প্রাণ ভরিয়া সে একবার কাঁদিল। কিসের লোভে, কিসের প্রলোভনে, এই পুত্রের সান্নিধ্য ছাড়িয়া সে দূরে ছিল? পুত্রের প্রতি কিসের জন্য সে এতখানি অবিচার করিয়াছে—মার প্রাণের সমস্ত স্নেহ-ভালবাসারও এতখানি অপমান করিয়াছে? ধিক তাহার নারী-জন্মে, ধিক তাহার মাতৃত্বে! এই ক্ষুদ্র ঘরের কোণে যে বিপুল শান্তি জমা রহিয়াছে, তাহার একটা কণাও যে জেঙ্কিন্সের সেই অত-বড় প্রাসাদে খুঁজিলে মেলে না! কখনও ত মেলেও নাই! মাদামের দুই চোখ বহিয়া হু-হু করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

মাদাম বসিয়া অতীতের কথা ভাবিতেছিল। পাপিষ্ঠের প্রতারণাময় কথা, সেই সব প্রলোভন—পুত্রের সহিত ছাড়াছাড়ি—কি সে মুহূর্ত্তগুলা!

চিন্তার পর চিন্তা তরঙ্গ তুলিয়া নাচিয়া ছুটিয়াছিল। তাহার আর সীমা নাই, শেষ নাই!

সহসা বাহিরে জুতার শব্দ পাওয়া গেল! শিষ দিতে দিতে আঁদ্রে আসিয়া ঘরে ঢুকিল। অন্ধকার ঘর। মন আজ তাহার উল্লাসে ভরা ছিল—জুজের গৃহে ভোজ! একটা আলো! আলো চাই! আজ যে একটু সাজিবার প্রয়োজন আছে! প্রণয়ী আজ প্রণয়িনীর গৃহে ভোজন করিবে। আলো জ্বালিতেই পিছনে কাহার দীর্ঘশ্বাস শুনা গেল। চমকিয়া আঁদ্রে ফিরিয়া চাহিল, রুদ্ধ স্বরে বলিল, "কে? মা!"

অমনি দুইখানা অধীর হস্ত আসিয়া আঁদ্রেকে আঁটিয়া ধরিল—স্নেহের কি উষ্ণ তাপ সে স্পর্শে! মা ছেলেকে বুকে চাপিয়া ধরিল, ধরিয়া কহিল, "হাঁ, আমি।"

দুই-চারিটা কথা কহিয়াই মাদাম পলাইবে, স্থির করিয়াছিল। তাড়াতাড়ি সে বলিল, "একটু বেড়াতে যাব আমি। তাই যাবার আগে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে এসেছিলুম।

"কেন মা? তুমি কোথায় যাবে? এত তাড়াতাড়ি কেন? আমার নতুন নাটক থিয়েটারে 'প্লে' হবে—তুমি দেখবে না? না মা,—তোমায় দেখতেই হবে। তার পর আমাদের বিয়ে আসচে—তুমি সে সময় না থাকলেই নয় যে মা! ও বুঝি তোমায় আসতে দেবে না? সেই মতলবেই—"

মাদাম তাড়াতাড়ি সে কথায় বাধা দিয়া দুই-একটা মিথ্যা ওজরে কথাটা চাপা দিবার চেষ্টা করিল, আঁদ্রে কহিল, "না মা, আমি কোন কথা শুনতে চাই না।"

মাদাম আর পারিল না, কাঁদিয়া বসিয়া পড়িল। আঁদ্রে আসিয়া মার হাতটা টানিয়া আপনার দুই হাতে চাপিয়া ধরিল, কহিল, "কি হয়েছে মা—আমায় বল তুমি? বল আমায়—"

মাদাম চোখের জল মুছিয়া কহিল, "কিছু না, বাবা, কিছু নয়—আমার মনটা ভাল নেই—তাই একটু ঘুরে আসতে চাই। তুমি আমায় এমনি চোখেই দেখো—আমি তোমার মা—বড় দুঃখিনী, অভাগিনী মা—"

আঁদ্রে মিনতি করিল, "না, মা, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমায় বল, কি হয়েছে?"

মাদাম কোন কথা কহিল না; ছেলের মুখের পানেই চাহিয়া রহিল।

আঁদ্রে কহিল, "তোমাদের কি ছাড়াছাড়ি হয়েছে, তবে?"

মাদাম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, মুখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল, "আমায় বলো না, ও-সব কোন কথা তুলো না, মারাণ।"

"মা, আমার কাছে কি লুকোচ্ছো, তুমি! আমি ত ছ'মাস আগেই বলে ছিলুম—নয় কি মা?"

"তুমি তা হলে সব জানো?"

"সব জানি। এ যে ঘটবে, তা আমি বহুদিন থেকেই জানি, মা। আমি ত এই দিনেরই প্রতীক্ষায় ছিলুম—"

"আমি এখানে এলুম—"

বাধা দিয়া মারাণ কহিল, "এই ত তোমার ঘর, মা—এ তোমার মন্দির। আজ দশ বছর আমি তোমার কাছ-ছাড়া হয়েছি—তোমার কাছ থেকে দশ বছরের স্নেহ আমার পাওনা আছে—আর ত আমি তোমায় ছেড়ে দেব না।"

বাহিরে আবার কাহার পদ-শব্দ শুনা গেল! এলিস মারাণের খোঁজে আসিয়াছিল। ঘরে ঢুকিয়াই আলিঙ্গন-বদ্ধ মাতা ও পুত্রকে দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। মারাণ কহিল, "এসো এলিস,—মার কাছে এসো। আমার মা। মা, এই এলিস, তোমার বৌ—"

দুই হাত বাড়াইয়া মাদাম তখন এলিসকে বুকের মধ্যে টানিয়া

লইল, অজস্র চুম্বনে তাহার মুখখানিকে রাঙাইয়া তুলিল, তার পর গাঢ় স্বরে কহিল, "একবার আমায় ডাকো—'মা' বলে একবার তোমরা দুজনে আমায় ডাকো। আমার সব দুঃখ এখনই ঘুচে যাবে।"

আঁদ্রে, এলিস দুইজনে তখন মাদামের বুকে মাথা রাখিয়া ডাকিল, "মা—"

"আঃ, বড় সুখ, বড় আরাম রে—" সুগভীর পরিতৃপ্তিতে মাদামের বেদনা-দার্ণ মন ভরিয়া গেল। সত্যই এ বড় সুখ! পৃথিবীতে এত সুখ ছিল, মাদাম তাহা কোনদিন ধারণাও করিতে পারে নাই।

ও-ধারে পল্লী-প্রান্তে অবস্থিত ক্ষুদ্র বাথে তখন মহা কলরব পড়িয়া গিয়াছে। একজন লোক বহুক্ষণ বাথে ঢুকিয়া বাহির হইতেছে না দেখিয়া ভৃত্যকে সন্ধান লইতে পাঠানো হয়। সে গিয়া দেখে, রক্ত-মাখা একটা মাংস-পিণ্ড পড়িয়া আছে—তাহার মুখে-গলায় অজস্র ক্ষুরের ঘা—প্রাণ-হীন দেহ! ফুলের মত শুভ্র সার্টের প্লেট রক্তে রাঙা হইয়া গিয়াছে। বীভৎস মুখ! দেখিলে চেনা যায় না! সে চীৎকার করিয়া উঠিল।

হায়, বেচারা মপার্ভ! মাদামের এ তৃপ্তির একটি কণার স্বাদও সে জীবনে কখনও পায় নাই! এই স্নেহ-ভরা দৃষ্টির অতি-ক্ষীণ একটা রশ্মি কোনদিন তাহার আঁধার বুকে মুহূর্ত্তের জন্যও ফুটিবার অবকাশ পায় নাই! হতভাগ্য জীব!

বিংশ পরিচ্ছেদ

বিদেশে

তিন সপ্তাহ পরে পল দ্য গেরি টিউনিস হইতে দেশে ফিরিতেছিল। তিন সপ্তাহ কাল টিউনিসে থাকিয়া সে হেমারলিং কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত

বিপুল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে। সেখানে পৌঁছিয়াই সে শুনিল, জাঁস্লুলের বিরুদ্ধে গোপনে এক মকর্দ্দমা রুজু করিয়া যে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তিতে ক্রোক দিয়া বসিয়াছে। নবাবের অফিস বন্ধ, জাহাজ ও সম্পত্তিতে শীল পড়িয়াছে—এবং তাঁহার প্রকাণ্ড প্রাসাদের সম্মুখে সতর্ক সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন রাখা হইয়াছে! সমস্ত আয়োজন ঠিক—শুধু লুঠের দ্রব্য ভাগ করিয়া লইতেই যা বাকী! ইহারই মধ্যে মাথা খেলাইয়া গেরি বাহিরের টাকাকড়িগুলাকে কোনমতে আদায় করিয়া দ্রুত দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিল।

সে কি অক্লান্ত শ্রম, বিপুল সংগ্রাম! ইহার মধ্যে নৈরাশ্য বা অবসাদ কোনটিকেই গেরি মুহূর্ত্তের জন্য আমোল দেয় নাই! হেমারলিঙের ফাঁস কাটাইয়া নবাবের পাওনা টাকার কতক উস্থুল করিয়া গেরি টিউনিসে আর মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করা সঙ্গত ভাবিল না। কে জানে, মামুদ বের হুকুমে এখনই এ টাকা হয়ত পথেই বাজেয়াপ্ত হইতে পারে! ইহার উপর সে টেলিগ্রাম পাইয়াছিল, পারিতে নবাবের নির্ব্বাচন নাকচ হইয়া গিয়াছে! এ সংবাদ টিউনিসেও রাষ্ট্র হইয়া ছিল। গেরি তখন দ্রুত আসিয়া একখানা ইতালী-গামী জাহাজে টিকিট কিনিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিল। সে দশ লক্ষ টাকা আদায় করিয়াছিল। এই লুঠের বন্দরে আবার পাছে তাহা হারাইতে হয়, এই ভয়ে ক্ষণে ক্ষণে তাহার রোমাঞ্চ হইতেছিল।

সকালে জাহাজ ছাড়িল। গেরি যখন ডেকে বসিয়া দেখিল, টিউনিসের শ্বেত অট্টালিকাগুলা জাহাজের পশ্চাতে একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেছে, তখন সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ক্রমে জাহাজ আসিয়া জেনোয়ার বন্দরে নোঙর ফেলিল। গেরির বুকটা একবার ছাঁৎ করিয়া উঠিল। কি জানি, টিউনিস হইতে যদি কোন টেলিগ্রাম আসিয়া থাকে এবং সেই টেলিগ্রাম পাইয়া ইতালীয় পুলিশ যদি জাহাজে উঠিয়া তাহার

সন্ধান করে? কিন্তু না. কেহই তাহার কোন সন্ধান করিল না। পল জাহাজ হইতে নামিয়া ট্রেনে উঠিল। এই ট্রেন বরাবর সমুদ্র-তীর দিয়া মার্শেল যাইবে।

পথে কিন্তু এক বিপদ ঘটিল। সাভোনা ষ্টেশনে এঞ্জিন বিগড়াইল। দশ-বারো ঘণ্টা এখানে এখন অপেক্ষা করিতে হইবে। রিলিফ্-এঞ্জিন না আসিলে ট্রেনের আর নড়িবার সামর্থ্য নাই।

তখন আবার সকাল হইয়াছে। বিলম্বে বিরক্ত হইয়া গেরি ট্রেন হইতে নামিয়া পড়িল। কোথায় গিয়া এখন এই সময়টুকু কাটানো যায়! লোক-চক্ষুর সম্মুখে থাকিতে কিছুতেই তাহার মন সরিতেছিল না। বেচারা জাঁস্লেের কথাই সর্ব্বাগ্রে তাহার মনে হইল। তাঁহার ইজ্জৎ, তাঁহার সম্ভ্রম—সব যে এই টাকার উপর নির্ভর করিতেছে। আর আলিন,—তাহার প্রাণাধিকা আলিন? সে যে গেরির পথ চাহিয়া বসিয়া আছে! কিন্তু উপায় নাই—দশ-বারো ঘণ্টা এখানে এখন পড়িয়া থাকিতেই হইবে'!

গেরি তখন একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া নাইস্ সহরটা দেখিয়া লইবার সঙ্কল্প করিল

চারিধার তরুণ সূর্য্য-কিরণে ঝলমল করিতেছিল—সেই স্নিগ্ধ রৌদ্রে স্নান করিয়া তরু-লতা অপূর্ব্ব শ্রীতে সাজিয়া উঠিয়াছে! দূরে-অদূরে অনতি-উচ্চ গিরিমালা নীল আকাশের দিকে অসংখ্য শৃঙ্গ-বাহু তুলিয়া আনন্দে যেন তাহাকে অভিবাদন করিতেছিল। পথের দুই পার্শ্বে সবুজ শষ্পে মণ্ডিত ভূমি অঙ্গে সূর্য্য-কিরণ মাখিয়া সবুজ ভেলভেটের মতই পড়িয়া ছিল! চারিদিকে সমস্তই সজ্জিত, সুন্দর! গেরির অশান্ত চিত্ত সে দৃশ্যে মুগ্ধ হইল!

গেরির গাড়ী আসিয়া পর্ব্বত-প্রান্তে অবস্থিত ব্রেহাট হোটেলের সম্মুখে থামিল। গেরি হোটেলে ঢুকিতেই সম্মুখে দেখিল, প্রকাণ্ড

একটা কুকুর। কাতুর, না? ফেলিসিয়ার কুকুর? দেখিতে হুবহু কাতুরের মতই।

গেরি আসিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিল। পোষাক ছাড়িয়া হাত-মুখ ধুইয়া সে খোলা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল। পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গাছগুলা চঞ্চল শিশুর মতই বায়ুর সহিত লীলা-রঙ্গে মাতিয়া খেলা করিতেছে। হঠাৎ পাশের ঘরে কাহার স্বর শুনা গেল! এ কি স্বপ্ন! গেরি চমকিয়া উঠিল। না, ভুল হইয়াছে, নিশ্চয় ভুল! এ পৃথিবীতে দুইজনের কণ্ঠস্বরে এতখানি মিল থাকিতেই পারে না! স্নিগ্ধ বায়ুস্পর্শে গেরির সকল ক্লান্তি ঘুচিয়া গিয়াছিল—তাহার তন্দ্রা বোধ হইতেছিল। গেরি আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। নিদ্রা আসিয়া নিমেষে তাহার শ্রান্ত শিরে হাত বুলাইয়া দিল; গেরি ঘুমাইল। ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখিল,—বিচিত্র, মধুর সে স্বপ্ন!

—আলিনের সহিত যেন সে মধু-বাসর-যাপনে যাত্রা করিয়াছে! সুন্দরী বধূ! উজ্জ্বল চক্ষু,—প্রেম ও বিশ্বাসে ভরা আলিনের দৃষ্টি তাহারই মুখের উপর স্থির নিবদ্ধ! আর এই হোটেলেরই অপর প্রান্তের ঘরে সে ছিল—ফেলিসিয়া! তাহার উজ্জ্বল শুভ্র রেশমী পোষাক—ভায়োলেটের গন্ধে ভরপূর! অদূরে ফেলিসিয়ার অস্তিত্ব সে স্পষ্ট অনুভব করিতেছিল।

আবেগে গেরি আলিনকে চুম্বন করিল। আলিন চমকিয়া সরিয়া গেল। তাহার মুখে নিমেষে করুণ বিষাদের এমন একটা ছায়া পড়িল যে তাহা দেখিয়া গেরির প্রাণ আর্দ্র হইল। গেরি সাদরে আলিনকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। আলিন তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া মৃদু কম্পিত স্বরে কহিল, "ফেলিসিয়া রয়েছে—তুমি আমায় আর ভালো বাসবে না।" হাসিয়া গেরি কহিল, "কে বললে, ফেলিসিয়া এখানে আছে?" আলিন সহসা মুখ তুলিয়া সভয়ে বলিয়া উঠিল, "হাঁ, সে

আছে, ঐ যে—ঐ যে সে—"আলিন পাশের ঘরের দিকে অঙ্গুলি দেখাইল! অমনি গেরি শুনিল, ফেলিসিয়ার স্বর! স্পষ্ট! ফেলিসিয়া হাঁকিতেছে, "কাহুর—কাহুর—"

চমকিয়া গেরি জাগিয়া উঠিল। চোখ মুছিয়া সে দেখে, ঘরে সে একা! কোথায় আলিন? কোথায় সে প্রেমের লীলা-রঙ্গ? কিন্তু এ কি! এবার সে বেশ স্পষ্ট শুনিল, পাশের ঘরে একটা কুকুর ডাকিতেছে। গেরি বিছানায় পড়িয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিল। পাশের ঘরে কে করাঘাত করিল। পরমুহূর্ত্তেই গেরি মানুষের কণ্ঠ শুনিল, "দোর খোল গো—আমি এসেচি—আমি জেঙ্কিন্স।"

এ কি সত্য—না, এখনও সে স্বপ্ন দেখিতেছে? না, এ'ত স্বপ্ন নয়! ঐ যে জানালার বাহিরে পাহাড় দেখা যায়। ঘরে রৌদ্র-কিরণের ঢেউ উথলিয়া উঠিয়াছে—আর এই ত সে জাগিয়া আছে! তবে—তবে?

গেরি বিছানায় উঠিয়া বসিল। সত্যই কি তবে ফেলিসিয়া এখানে আছে? আর সেই পাপিষ্ঠ জেঙ্কিন্সটাও এখানে আসিয়া জুটিয়াছে! পাশের ঘরে দ্বার খোলার শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে পরুষ কণ্ঠে সেই পরিচিত স্বর—"কেমন, এবার তোমায় খুঁজে বার করেছি ত!"

না, কোন ভুল নাই। নাম না বলিলেও শুধু সে স্বর শুনিয়াই গেরি ঠিক বুঝিত, এ আর কেহ নয়, জেঙ্কিন্স! এমন কঠিন কর্কশ স্বর আর কাহারও থাকিতে পারে না।

জেঙ্কিন্স কহিল, "তোমায় আজ পেয়েছি, তা হলে। আট দিন ধরে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি—জেনোয়া থেকে নাইসের মধ্যে তন্ন তন্ন করে তোমার সন্ধান করেছি। আমি জানি, তুমি এখনও বেরিয়ে পড়নি। বের বজরা এখনও বন্দরে বাঁধা রয়েছে! সমুদ্রের ধারে সমস্ত হোটেলে খোঁজ করেছি! ব্রেহাটের কথা আজ মনে পড়ল।

ভাবলুম, হয়ত তাহলে এখানেই আছ। এসে খোঁজ নিলুম—ঠিক! এখানেই তুমি আছ, তাহলে! আঃ—"

কিন্তু এ কাহার সহিত জেঙ্কিন্স কথা কহিতেছে? কৈ, কেহ জবাব দিল না ত! তবে—তবে—না, ঐ যে কে উত্তর দেয়! বড় কোমল মৃদু কণ্ঠ! উত্তর হইল, "হাঁ, এখানে আছি। কিন্তু তাতে কি হয়েছে, শুনি?"

গেরি উঠিয়া দেওয়ালে কাণ পাতিয়া দাঁড়াইল। তাহার বুকের মধ্যে একটা দারুণ অস্বস্তি মাথা ঝাড়িয়া দাঁড়াইয়াছিল—মাথাটা ঘুরিতেছিল। জেঙ্কিন্স কহিল, "আমি এসেছি, তোমায় আটকে রাখতে। টিউনিসে তোমায় যেতে দেব না।"

"টিউনিসে আমার কাজ আছে। আমি সেখানে যাবই!" না, কোন ভুল নাই। এ স্বর ফেলিসিয়ারই বটে!

জেঙ্কিন্স কহিল, "কিন্তু তুমি বুঝচ না—ফেলি, শোনো—"

"কোন দরকার নেই, শোনবার। আমি নিজে যা ভাল বুঝব, করব। তুমি আমার অভিভাবক নও যে আমায় উপদেশ দিতে আসবে! আমি অবাক হচ্ছি, তোমার এ আস্পর্দ্ধা দেখে! এ অনধিকার-চর্চ্চা কেন? তোমার উপদেশের মূল্য, জেনো—ঐ কুকুরটার চীৎকারের মতই—অমনি অর্থহীন, অকেজো বলে আমি তা মনে করি।"

"বোঝো, ফেলিসিয়া, তোমার এই রূপ, এই বয়স! টিউনিস তোমার পক্ষে এমন অবস্থায় মোটেই নিরাপদ জায়গা নয়। বিশেষ তুমি একা—"

"পারিতেও আমি একা ছিলুম। তা ছাড়া আমি কনস্তাঁকে নিয়ে যাচ্ছি—!"

"শুধু কনস্তাঁকে নয়—আমাকেও তাহলে সঙ্গে নিতে হয়।"

"তোমাকে?" ফেলিসিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিল, পরে কহিল,

"আর তোমার পারিকে—তোমার মক্কেলদের—তোমার সুসভ্য সমাজটিকে — বল, বল, তাদেরও সঙ্গে নিতে হবে, না? তুমি পাগল!"

"যাই বল, ফেলিসিয়া, তুমি যেখানেই যাও না কেন, আমি তোমার সঙ্গে যাবই—এ আমার প্রতিজ্ঞা।"

তার পর মুহূর্ত্তের জন্য উভয়েই স্তব্ধ রহিল। পল ভাবিল, এ ভাবে লুকাইয়া এ সকল কথাবার্ত্তা শোনা তাহার পক্ষে উচিত হইতেছে না! কিন্তু প্রাণে তাহার অদম্য কৌতূহল জাগিয়াছিল। যদি কিছু নূতন তথ্য সংগ্রহ হয়! ক্লান্তিতে পা তাহার ভারী বোধ হইল, দাঁড়াইয়া থাকিতে কষ্ট হয়! তবুও পারির সুসভ্য সম্ভ্রান্ত সমাজের যে দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা ধীরে ধীরে আজ আপনার বদ্ধ ফাঁসের সুতাগুলাকে জোট্ খুলিয়া মুক্ত করিয়া ধরিতেছিল, তাহার যতখানি ধরিতে পারা যায়—শুধু এই আশায় পল কিছুতেই আপনাকে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। সেই জন্য কোন মতে সে নিশ্বাস রোধ করিয়াও স্থির জড়পুত্তলির মতই দেওয়ালে কান পাতিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

ফেলিসিয়া কহিল, "বাজে কথা যাক্ জেঙ্কিন্স—তুমি চাও কি?"

"আমি তোমায় চাই, ফেলিসিয়া!"

—"জেঙ্কিন্স—" সে স্বর তীব্র, পরুষ।

—"হাঁ, আমি শুধু তোমায় চাই, ফেলিসিয়া। এ কথা আমায় মুখে উচ্চারণ করতে তুমি বারণ করেছ—কিন্তু অন্য অনেকে তোমার কাছে এই কথাই বলেছে, তখন তুমি বিরক্ত হওনি—কাজেই আমি আবার এ কথা বলছি। আমার কথাই বা তুমি রাখবে না কেন, ফেলিসিয়া?"

পাশের ঘরে মুহূর্ত্তে যেন বাজ হাঁকিল। ফেলিসিয়া তীব্র দীপ্ত স্বরে কহিল, "সাবধান হয়ে কথা বলো, জেঙ্কিন্স, আমার মর্য্যাদায় আঘাত করো না। যতই তোমার শক্তি থাকুক না কেন,—তবু জেনো, আমিও একেবারে দুর্ব্বল নই। এ ধৃষ্টতার শাস্তি আমি দিতে জানি—"

গদ্গদ কণ্ঠে জেঙ্কিন্স কহিল, "কেন এত রাগ করছ, ফেলিসিয়া? আমি তোমায় ভালবাসি—চিরকাল ভাল বেসেছি—। কেন, তুমি বিচার করে দেখ, তোমায় ভালবাসি বলে—"

"আমায় ভালবাস!" ফেলিসিয়া বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "ভালবাস, জেঙ্কিন্স? তোমার মর্জ্জি হয়, আমায় ভালবাসতে পার। কিন্তু জেনো, আমারও মর্জ্জি, আমি তোমায় ঘৃণা করি। এত ঘৃণা মানুষ ইতর পশুকেও করতে পারে না! আমার যা-কিছু বিশ্বাস, ভক্তি, সে সমস্ত তোমারই জন্য আজ ধূলায় লুটিয়ে গেছে! আমার সমস্ত জীবনটা তোমারই নিশ্বাসে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে! আমার নারীত্ব তোমারই স্পর্শে কলঙ্কিত অপমানিত হয়েছে! তুমিই আমাকে আমার মর্য্যাদার আসন থেকে টেনে এনে মাটীতে লুটিয়ে দেছ। তোমার সঙ্গ-সুখের চেয়ে আমি যে-কোন অমর্য্যাদা, যে-কোন হীনতাকে আজ মাথায় তুলে নিতে পারি। পারির সমাজের যা-কিছু ভাণ, মিথ্যা, সব যে আমি মাথায় তুলে নিয়েছি, নিয়ে নিজের অস্তিত্ব হারিয়েছি—এ শুধু তোমারই কৃপায়! আর কেউ তোমায় চিনতে না পারুক, আমি তোমায় চিনি—একটা ভণ্ড, স্বার্থপর, পাপিষ্ঠ, নির্লজ্জ, কাপুরুষ—পারির সমস্ত কলঙ্ক, সমস্ত পাপের কুৎসিত প্রতিমূর্ত্তি—তুমি এসেছ, আমার কাছে ভালবাসা জানিয়ে আমার হৃদয় অধিকার করতে—?"

ক্রোধে ফেলিসিয়ার মুখে কথা আর বাহির হইল না। সে রাগে ফুঁসিতে লাগিল।

জেঙ্কিন্স কহিল, "তুমি এ সব কি বলচ, ফেলিসিয়া? যদি তুমি জান্তে, তোমার এ রাগে আমার বুক কতখানি জ্বলে যাচ্ছে! দায়ে পড়ে আমায় এমন অমানুষ হতে হয়েছিল, ফেলিসিয়া! কি বিপুল বিঘ্নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমায় দিন কাটাতে হয়েছিল, তা যদি তুমি জানতে! তবুও একমাত্র তোমাকেই আমি চিরদিন ভাল বেসেছি!

তোমার ক্রোধ, তোমার বিদ্রূপ, তোমার অপমান—কিছুতেই আমার এ ভালবাসা কম পড়েনি। সেই ভালবাসার বলেই আমার সাহস আজ-পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ আছে—না হলে তোমার কাছে ঘেঁসতেও আমার আজ সাহস হত না, ফেলিসিয়া। আজ আর কোন দিকে আমার লক্ষ্য নেই—কোন বিষয়ে স্পৃহা নেই। আমি সব ত্যাগ করতে পারি—ত্যাগ করেওছি—কিন্তু তোমার আশা আমি জীবন থাকতে ত্যাগ করতে পারব না। ফেলিসিয়া, তুমি আমার হও, আমায় বিয়ে কর।"

"বিয়ে!"

"হাঁ, বিয়ে।"

"আর তোমার স্ত্রী?"

"সে মারা গেছে।"

"মারা গেছে? মাদাম জেঙ্কিন্স মারা গেছে! এ কথা সত্য?"

"তুমি আমার স্ত্রীকে জানতে না, ফেলিসিয়া। যাকে 'মাদাম' বলে জানতে, সে আমার স্ত্রী নয়। তার সঙ্গে যখন আমার দেখা হয়, তখন আমার যথার্থ স্ত্রী যে, সে বেঁচে ছিল। আয়ার্লাণ্ডে থাকত সে। এর সঙ্গে জানাশোনা হবার ঢের আগেই আমার গলায় দড়ি পড়েছিল। তখন আমার বয়স পঁচিশ বৎসর। আয়ার্লাণ্ডে আমি ডাক্তারি পড়ছিলুম। অবস্থা খারাপ—পড়ার খরচ চলত না। সেই সময় এই বিয়ে হয়। তার নাম ছিল মিস্ ষ্ট্র্যাঙ্গ। দেনায় তখন আমার মাথার চুল অবধি বিকোবার জো। এই মিস্ ষ্ট্র্যাঙ্গের ভাইয়ের কাছেও পাঁচশ পাউণ্ড ধার জমে গেছল। সে আমায় জেলে পাঠাবার উদ্যোগ করেছিল, কাজেই সেই জেল আর দেনা, এ দুয়ের হাত এড়াতে তার বেতো-রোগী বোন মিস্ ষ্ট্র্যাঙ্গ্‌কে আমি বিবাহ করি! ভেবেছিলুম, কালে তাদের সম্পত্তিরও মালিক হব। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর! সম্পত্তি পাওয়া দূরে থাক, সেই বেতো স্ত্রী ক্রমে বিষম বোঝা হয়ে দাঁড়াল।

তার কড়া তদারক আর চড়া মেজাজের জ্বালায় আয়ার্লাণ্ড ছেড়ে পারিতে এলুম, ভাগ্যান্বেষণের চেষ্টায়। চারিদিকে বিপদের সাগর, কূল-কিনারা দেখা যাচ্ছিল না, তাতে মানুষকে একটু দুঃসাহসিক হতে হয়—সেই দুঃসাহসে ভর করে পারিতে এসে মাথা তুললুম। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝে মানুষের উপর আমার প্রবল ঘৃণা জন্মেছিল। সেই ঘৃণার বিষে জর্জ্জরিত হয়ে চারিদিকে শুধু বিষই ছড়িয়েচি। মান, ইজ্জত, টাকা, সবই দু'হাতে কুড়িয়ে বেড়িয়েছি! কিন্তু কোন দিন শান্তি পাইনি! তাই শেষে সে-সব ছেড়ে দিয়েছি। স্ত্রীর সে ভাইটা নিঃসম্বল হয়ে মারা গেলে বেতো স্ত্রীকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হলুম। আজ আমি আবার মুক্ত, স্বাধীন—"

"মুক্ত, স্বাধীন! ঠিক বলেছ, জেঙ্কিন্স! তবে যে তোমার স্ত্রী না হয়েও স্ত্রীর অধিক তোমার অনুগত, দাসীর মত পড়েছিল, তাকে কেন বিয়ে কর না!"

"না, তা হয় না। সেও এক কয়েদ! অত মিন্‌মিনে ভাব, অত অনুরাগ, তাও আমার অসহ্য বোধ হয়। তা ছাড়া তাকে ঘরে এনে রাখলেও যেদিন তোমায় দেখেচি, মন আমার সে দিন থেকে তোমারই পিছনে ছুটে ফিরেছে—মন শুধু তোমাকেই চায়। তার সঙ্গে আমার সব দেনা-পাওনা চুকিয়ে এসেছি।"

"হঠাৎ এমন সর্ব্বত্যাগী হলে যে!"

"পারি, সমাজ—সব ত্যাগ করেছি। সেখানে শান্তি নেই, সুখ নেই—"

"পারিতে আর ফিরবে না?"

"না। এখন শুধু তোমার সঙ্গ-সুখের প্রার্থী আমি—। সব ত্যাগ করে আমি তোমার বাসায় গেলুম। গিয়ে দেখলুম, বাড়ী খালি পড়ে আছে—গায়ে টিকিট আঁটা, "বাড়ীভাড়া।" তখন আমার মাথার মধ্যে

রক্ত চন্ চন্ করে উঠল। পাখা উড়ে পালিয়েছে! তুমি পারি ছেড়ে আসায় সেখানে আমার আর সুখ নেই—আমিও তাই পারি ছাড়লুম। তুমি তোমার ঘর-বাড়ী বেচে ফেলেছ, আমিও আমার ঘর-বাড়ী বেচে এসেছি।”

“আর সে? সেই সাধ্বী, সেই অনুগতা নারী, যে তোমার স্ত্রী না হয়েও লক্ষ স্ত্রীর চেয়ে তোমায় ভালবাসত, তোমার সুখের জন্য নিজের প্রাণ দিতেও যে কুণ্ঠিত নয়—সেই নারীকে তুমি পথে বসিয়ে এসেছ! চমৎকার কাজ করেছ, জেঙ্কিন্স, চমৎকার! আজ তার সেই পরিত্যক্ত মহামূল্য আসনে আমায় বসাবার জন্য তুমি অনুরোধ করতে এসেছ! স্বার্থপর, কাপুরুষ—”কথাটা বলিয়া ফেলিসিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

জেঙ্কিন্স করুণ স্বরে কহিল, “আর আমায় লজ্জা দিয়ো না, ফেলিসিয়া। তাকেও যে আমি ত্যাগ করেচি, সে তোমারই জন্য! আজ আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে এসেছি, শুধু তোমারই আশায়। আমার এ অবস্থায় তুমি আমায় তাড়িয়ে দিয়ো না—নিষ্ঠুর হয়ো না। আমায় দয়া কর।”

“দয়ার আশা মনেও স্থান দিয়ো না, জেঙ্কিন্স! এত বড় নিষ্ঠুর কাপুরুষের হাতে আপনাকে আমি সঁপে দেব,—আর এমন পরিচয় পাবার পরও? তা হয় না, জেঙ্কিন্স, তা অসম্ভব!”

জেঙ্কিন্স তখন ভূমির উপর নতজানু হইয়া বসিল, করুণ আবেদনের দৃষ্টিতে ফেলিসিয়ার পানে চাহিয়া রহিল।

ফেলিসিয়া কহিল, “এ দুরাশা ত্যাগ কর, জেঙ্কিন্স। তুমি অসম্ভব কামনা করছ। আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোথাও কিছু রাখা-ঢাকা নেই। বিশেষ এ-সব কথার পর তোমাকে মুহূর্ত্তের জন্যও আমি বিশ্বাস করতে পারব না। তা ছাড়া আরও শোনো, জেঙ্কিন্স, আমার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক নয়—আমি মোরার রক্ষিতা ছিলুম।”

পল চমকিয়া উঠিল। এ সন্দেহ আভাষে তাহার মনে উঁকি দিত। তবুও সেই কণ্ঠ হইতে এমন পরিষ্কার অকম্পিত স্বীকৃতি সে কোন দিনই আশা করে নাই! পৃথিবীর সমস্ত আলো নিমেষে যেন তাহার চোখের সম্মুখে নিবিয়া গেল। এই নারী—এই হৃদয় লইয়া এমন নিষ্ঠুর খেলা খেলিয়া আসিয়াছে!

জেঙ্কিন্স মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া উত্তর দিল, "আমি তা জানি। তুমি তাকে যে সব চিঠি লিখেছিলে, তার কতক আমার হাতে পড়েছে।"

"আমার চিঠি?"

"হাঁ, তোমারই চিঠি—এই সে চিঠি। নাও, আমি এ চিঠি তোমায় ফিরিয়ে দিলুম; নাও। ও চিঠি অনেকবার করে আমি পড়েছি, আমার সব মুখস্থ হয়ে গেছে। এ চিঠির কথা মনে হলে আমার বড় কষ্ট হয়! কিন্তু জীবনে এর চেয়েও ঢের বড় বড় কষ্ট আমি সহ্য করেছি। ওঃ, কত পার্ল যে আমি খাইয়েছি। যত খেয়েছে, তত চেয়েছে। এই পার্লই তার মৃত্যুকে আরও এগিয়ে এনেছিল! আমি বড় জ্বালা পেয়েছিলুম, ফেলিসিয়া, জ্বলে পার্লের মাত্রা বাড়িয়ে তাকেও আরো জ্বালিয়েছি! তবুও সে চেয়েছে। আমিও তার মুখে ধরে দিয়ে মনে মনে বলেছি,—আরও জ্বলতে চাও, তুমি? নাও, খেয়ে জ্বলো, আরো জ্বলো—"

* * *

পল সভয়ে সরিয়া আসিল। আর না—এত বড় পাপের কথা ধৈর্য্য ধরিয়া কাণে শুনাও যায় না! সে আর শুনিবে না!

সহসা তাহার দ্বারে করাঘাত হইল—"গাড়ী হাজির—"

পল তাহার পোর্টম্যাণ্ট তুলিয়া লইয়া দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। পাশের ঘর তখন নিস্তব্ধ হইয়াছে। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। পল দ্রুত হোটেল হইতে বাহির হইয়া গেল।

গাড়ী ছাড়িলে পল আপনার জামার পকেট হইতে পেন্সিলে আঁকা একখানি ছবি বাহির করিল! সুন্দর মুখ, উজ্জ্বল চোখ! সে চোখে অখণ্ড বিশ্বাস—অপূর্ব্ব অনুরাগ জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছে। পল স্থির দৃষ্টিতে সে ছবির পানে চাহিয়া রহিল, পরে পরিপূর্ণ আবেগে, ছবিখানাকে অজস্র চুম্বন বর্ষণ করিয়া সেখানাকে বুকে চাপিয়া ধরিল। তাহার প্রাণের জ্বালা মুহূর্ত্তে জুড়াইয়া গেল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রথম-অভিনয়-রজনী

কার্দ্দেলাকের নূতন থিয়েটারে লোক আর আজ ধরে না। মারাণের নূতন নাটক 'বিদ্রোহে'র আজ প্রথম-অভিনয়-রজনী। নানা সাজে সজ্জিত দর্শক দলে দলে আসিয়া জমিতে লাগিল। থিয়েটারের সম্মুখে অনেকখানি পথ আলোর ঘটায় দিনের মতই উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। গাড়ী ও লোকের ভিড়ে সে এক সমারোহ-ব্যাপার! সকলেরই মুখে ব্যস্ত আগ্রহের একটা ছাপ সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে।

টিকিট-ঘরের পাশেই কার্দ্দেলাক দাঁড়াইয়া ছিল। আশার আনন্দে দুই চোখ তাহার দীপ্ত, উজ্জ্বল—সস্মিত মুখ। বিস্তর টাকা ধার করিয়া এই শেষবার সে তাহার ভাগ্য-পরীক্ষায় উদ্যত হইয়াছে। গৃহটা নবাব এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন—সাজসজ্জায় ও সরঞ্জামে কার্দ্দেলাকও প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছে! তিনবার দেনার দায়ে তাহার নামে দেউলিয়ার ছাপ পড়িয়াছিল—চতুর্থ বার সে জীবন পণ করিয়া আবার লাগিয়াছে! মনটা সন্দেহে বেশই দোল খাইতেছিল

সময়টা সুবিধার নয়। পারির থিয়েটার-বাজ লোকেরা এখন পারি ছাড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে! তাহার উপর নাট্যকারটি একেবারে নূতন, সাধারণের অপরিচিত! 'বিদ্রোহ' তাহার এই প্রথম নাটক! এমন ক্ষেত্রে আশা করিতে মন ওঠে না! যাহা হউক, তবুও সে কপাল ঠুকিয়া আয়োজনে ধূম বাধাইয়া দিয়াছিল। দলে দলে লোক আসিতেছিল শুনিয়া কার্দ্দেলাক আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইল—ভিড় দেখিয়া তাহার সকল সন্দেহ দূর হইল! এবার তবে জয়, জয়, নিশ্চয় জয় জয়কার!

শঙ্কিত চিত্তে মারাণ কিন্তু ষ্টেজের এক নিভৃত কোণে দাঁড়াইয়া ষ্টেজ-ম্যানেজারের কার্য্য-কলাপ লক্ষ্য করিতেছিল। বুক তাহার নৈরাশ্যের এক অজানা ভয়ে দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতেছিল। অসম্ভব ভিড়ের কথা কাণে শুনিয়াও বাহিরেরে আসিতে তাহার সাহস হইল না। এতগুলা লোকের দৃষ্টির সম্মুখে বাহির হইতে প্রাণ তাহার একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তবু সকলের কথায় একবার সে কোনমতে যবনিকার অন্তরাল হইতে উঁকি দিয়া রঙ্গালয়ের ভিতরে চাহিয়া দেখিল—বিরাট গৃহে লোক একেবারে গিস্ গিস্ করিতেছে। তিল-ধারণের স্থান নাই! এমন লোকারণ্য পূর্ব্বে সে আর কোথাও দেখিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না!

আর ঠিক পনেরো মিনিট বাকী আছে। ষ্টেজ-ম্যানেজারের কাজ শেষ হইয়াছে। অভিনেতা অভিনেত্রীর দল সাজিয়া প্রস্তুত। শুধু পট উঠিলেই হয়! দারুণ উদ্বেগে মারাণের প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে এখন কি করিবে, কোথায় যাইবে? উপরে—বক্সে? চারিধার হইতে অসংখ্য চোখের দৃষ্টির শর এখনই তাহা হইলে তাহাকে বিঁধিয়া ফেলিবে! তবে কি সে ষ্টেজের পাশে দাঁড়াইয়াই অভিনেতা-অভিনেত্রীর দলকে উৎসাহ দিবে? কিন্তু এ উদ্বেগ লইয়া উৎসাহ দিবার

শক্তিই বা তাহার হইবে কি করিয়া! তাহার নিজেরই প্রাণ যে দুই-একটা উৎসাহ-বাণী পাইবার আশায় উন্মুখ অধীর হইয়া আছে! সেটুকু না পাইলে প্রাণটাকে ঠিক রাখা যে ভারী কঠিন কথা! তবে—তবে?

কার্দেলাক আসিয়া মহা-উৎসাহে মারাণের করকম্পন করিয়া কহিল, "যান, আপনি উপরে গিয়ে বসুন—দেখবেন, কেমন হয়।" মারাণ কোন জবাব না দিয়াই দ্রুত উপরে চলিয়া গেল। নীচে তখন কাতার দিয়া দর্শকের দল বসিয়া গিয়াছে—অধীর আগ্রহের এক নিবিড় গুঞ্জনে সারা নাট্যগৃহ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে! এসেন্সের বিচিত্র গন্ধে রঙ্গালয় এমনই সুরভিত যে মনে হয়, সাজানো বাগানে অজস্র ফুল ফুটিয়া সুবাসে চারিধার যেন ভরপূর করিয়া দিয়াছে! ষ্টলে পারির সম্ভ্রান্ত সমাজ—বিচিত্র বেশ-ধারী নর-নারী মুখে চোখে তীব্র কৌতূহল মাখিয়া গল্প-গুজব করিতেছে, গ্যালারিতে রঙ্গপ্রিয় সাধারণ লোক, উপরে বক্সে সৌখীন নর-নারীর দল! মারাণ আসিয়া একটি বক্সের পিছনে দাঁড়াইল—এলিস ও আলিনকে লইয়া বৃদ্ধ জুজ এই বক্সে সম্মুখের আসনে, আর মারাণের মা তাহাদেরই পিছনে উজ্জ্বল আলো ও লোক-চক্ষুর আড়ালে কোনমতে আপনাকে গোপন করিয়া বসিয়াছিল। উত্তেজনায় এই কয়টি প্রাণীর চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। মারাণ আসিয়া মার কাছে বসিল।

বৃদ্ধ জুজ ঘড়ি খুলিয়া কহিল, "আর তিন মিনিট বাকি—"মারাণের বুকে কে যেন পাথর ঠুকিতেছিল। আর তিন মিনিট! না জানি, এই অধীর দর্শকের দল কি করিবে? নীচে হইতে দর্শকের দল ক্ষণে ক্ষণে এই বক্সটির পানে সকৌতূহল দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল। এ বক্সে ও কাহারা বসিয়াছে? পোষাক নিতান্তই সাধারণ ব্যক্তির মত, দেখিলে একটুও সৌখীন বলিয়া মনে হয় না! এ বক্সের মূল্যও যে

অনেক! দেখিলে মনে হয় না ত যে বক্সের মূল্য দিবার উহাদের সামর্থ্য আছে!

সহসা ঝম্ ঝম্ করিয়া অর্কেষ্ট্রায় বাজনা বাজিয়া উঠিল। মারাণের চিত্তে স্পন্দন ছুটিয়া গেল। তারপর একেবারে যবনিকা উঠিল ও নাটকের প্রথম দৃশ্য সজ্জিত সুন্দর বেশে দেখা দিল। মারাণ বিস্মিত দৃষ্টিতে মঞ্চের পানে চাহিল। পাত্র-পাত্রী কথা সুরু করিয়া দিয়াছে—মারাণ শুনিল, তাহারই লেখা কথা দিব্য দক্ষতার সহিত ইহারা বলিয়া চলিয়াছে! পক্ষী-মাতা তাহার শিশুকে প্রথম উড়িতে দেখিলে যেমন সতৃষ্ণ ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহার প্রতি ভঙ্গীটুকু লক্ষ্য করে, মারাণ ঠিক সেইভাবেই অভিনেতা-অভিনেত্রীর বাক্ ও চলিবার-ফিরিবার প্রত্যেক ভঙ্গীটুকু লক্ষ্য করিতে লাগিল।

দর্শকমণ্ডলী স্থির চিত্তে অভিনয় দেখিতেছিল। কোথাও এতটুকু সাড়া-শব্দ নাই! একটা সূচ পড়িলেও তাহার শব্দ শুনা যায়—বিরাট রঙ্গগৃহ এমনই স্তব্ধ, কোলাহল-হীন! সহসা নীচে ষ্টলে একজন দর্শক মৃদু কণ্ঠে কহিল, "এ যে পদ্য!" আর একজন দ্রুত তাহাকে বাধা দিয়া কহিল, "চুপ, ভারী চমৎকার!" মারাণের প্রাণের মধ্য দিয়া আনন্দের একটি বিদ্যুৎ-শিখা ছুটিয়া গেল। দর্শকদের এই নিস্পন্দ পলক-হীন দৃষ্টি—এই অধীর কৌতূহল—সে যেন নবীন নাট্যকারের কৃতিত্বকে ধ্যান-মৌনভাবে বরণ করিয়া লইবারই সঙ্কেত!

কবির ছন্দ রঙ্গমঞ্চে তখন নদীর শান্ত তরঙ্গের মতই নাচিয়া ছুটিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছিল। সুদক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্রীর কুশল কণ্ঠে সে ছন্দ বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। প্যারির সৌখীন সমাজের মহা-সৌখীন ব্যক্তিগুলি হইতে গ্যালারির নিতান্ত ভাবহীন সাধারণ দর্শকের চিত্তটুকুও সে ছন্দের সলীল মৃদু তরঙ্গে নৌকার মতই দোল খাইতেছিল।

ও-ধারের বক্সে বসিয়া হেমারলিং, ব্যারণেস ও ব্যারণেসের প্রণয়ী লি মার্কার দীপ্ত কৌতূহলে নাটকের প্রতি ছত্র অনুসরণ করিতেছিল,—তাহার পাশের বক্সে পারির বিখ্যাত বিলাসিনী সুজান্ ব্লক্ সাজসজ্জার দিকে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া ষ্টেজের পানে চাহিয়া ছিল—তাহার পাশে এমি ফেরাট। মশাদ্‌ তাহার কুশ্রী নায়িকার সঙ্গে আর-এক বক্সে বসিয়া গল্প থামাইয়া অভিনয় দেখিতেছিল। পেণ্টে মুখের ধবল দাগগুলাকে ঢাকিয়া আসিলেও পাছে সেগুলা লোক-চক্ষে একটুও ধরা পড়ে, এই ভয়ে পট উঠিবার পূর্ব্বক্ষণ অবধি সেগুলার পানে সে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতেছিল; কিন্তু অভিনয়ে এমনই উত্তেজনা, রচনায় এমনই নূতনত্ব ছিল যে এখন সে কথা সে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিল! সকলেই নাট্যকারের রচনা-কৌশল ও অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয়-দক্ষতায় একেবারে যেন তন্ময় মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। মারাণ স্মিত মুখে কম্পিত চিত্তে দর্শকের মুখের উপর দিয়া ক্ষণে ক্ষণে আপনার ব্যাকুল দৃষ্টি বুলাইয়া লইতেছিল!

সহসা দর্শক-দলে চাঞ্চল্যের মৃদু তরঙ্গ দেখা দিল। বিপুল জনসঙ্ঘ কিসের সাড়া পাইয়া উপরের দিকে ফিরিয়া চাহিল। কোণের যে বহুমূল্য বক্সটি এতক্ষণ খালি পড়িয়াছিল, সকলের দৃষ্টি সেই দিকে ফিরিল। অমনি সকলের মুখে-চোখে একটা সঙ্কেতের ঢেউ ছুটিয়া গেল! মারাণ ফিরিয়া চাহিল, শূন্য বক্সে একজন লোক আসিয়া বসিয়াছে। মারাণ মুহূর্ত্তে চিনিল, সে নবাব।

দশ দিনে নবাবের বয়স যেন কুড়ি বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। চুলে অসম্ভব পাক ধরিয়াছে। অমন দুর্ঘটনার পর নবাবকে এ কয়দিন কেহ পথে বাহির হইতে দেখে নাই। ক্ষুব্ধ, আশা-হত নবাব আপনাকে নিরাপদ গৃহ-দুর্গে বদ্ধ রাখিয়াছিলেন। দিনের আলো, মুক্ত আকাশ, মুখরিত পথ,—এ সবের মায়া নবাব দৃঢ় চিত্তে ত্যাগ করিয়াছিলেন।

বাহিরে তাঁহারই নাম লইয়া পারির লোক কিরূপ গর্জ্জন করিতেছে, তাহার আভাযমাত্র নবাবের কাণে পৌঁছায় নাই। ধ্বংসের একটা ভীষণ ছায়া নবাবের দীপ্ত প্রাণটাকে রাহুর মতই গ্রাস করিতেছিল। মাদাম জাঁস্ত্রাল এ সব ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া নিগ্রো বাঁদী-বান্দা লইয়া হাওয়া খাইতে দেশান্তরে গিয়াছিল বোকাম্প তহবিলের দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রতিক্ষণেই দারুণ দুর্ভাগ্যের আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিতেছিল। নবাবের বৃদ্ধা মাতা শুধু আসন্ন ধ্বংসের মুখে পুত্রকে আগুলিয়া বসিয়াছিল। নবাব একেবারে বাক্‌হীন ক্ষুব্ধ বেদনায় এক মহা-সর্ব্বনাশের প্রতীক্ষা করিতেছিল। বাহিরের সহিত তাঁহার সব সম্পর্ক আজ চুকিয়া গিয়াছে!

এমন সময় মার্শেল হইতে গেরির টেলিগ্রাম আসিল, নবাবের দশ লক্ষ টাকা কোনমতে আদায় করিয়া সে ঘরে ফিরিতেছে। নবাবের মনে নৈরাশ্যের কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছিল, মুহূর্ত্তে কে যেন তাহা ঠেলিয়া সরাইয়া দিল। আশার সূর্য্যালোক আবার মৃদু কিরণে জাগিয়া উঠিল। দশ লক্ষ টাকা! আঃ,—দেনা-পত্র তবে শোধ হইবে; দেউলিয়া নামের কলঙ্ক হইতেও মুক্তিলাভ ঘটিবে! আবার নূতন করিয়া জীবনটাকে গড়িবার সুযোগ মিলিবে! নবাব উঠিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া টেবিলের উপর হইতে একটা খবরের কাগজ তুলিয়া খুলিয়া দেখিলা। কাগজ খুলিতেই কার্দ্দেলাকের থিয়েটারের বিজ্ঞাপন চোখে পড়িল। মারাণের নূতন নাটক লইয়া থিয়েটার খুলিতেছে! ভারী সমারোহ ব্যাপার! নবাবেরই টাকায় তৈরী থিয়েটার, তাঁহারই বুকের রক্তে রাঙানো-সাজানো। নবাব ভাবিলেন, একটু ঘুরিয়া আসা যাক্। পারির লোকগুলাও দেখুক, তাহাদের বর্ব্বর নিষ্ঠুরতা নবাবকে একটুও বিচলিত করিতে পারে নাই।

মা আসিয়া পুত্রের মুখের ভাব দেখিয়া নিষেধ করিল—পুত্র

হাসিয়া মার সে উদ্বেগ কাটাইয়া দিলেন। মা শিহরিয়া নিবৃত্ত হইল।

বক্সে ঢুকিয়াই নবাব উপস্থিত দর্শক-মণ্ডলীতে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলেন। কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্যও করিলেন না। দর্শকমণ্ডলী সে ভাব বুঝিল। তখন তাহাদের মধ্যে যাহারা নিতান্ত নির্লজ্জ, তাহারা দুই-চারিটা কঠিন মন্তব্য প্রকাশ করিতে ছাড়িল না।

একজন কহিল, "নবাব না ?"

"তাই ত নবাবই যে।"

"ইস্, কি বেহায়া হে !"

"মুখ দেখাতে লজ্জা হল না ! ডাকাত বেটা—"

নবাবের একবার মনে হইল, উপর হইতে এই দণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া এই সব অসভ্য বন্য জানোয়ারগুলার টুঁটি চাপিয়া ধরেন ! কিন্তু না, উহাদের মন্তব্য কানে শুনিয়াও না শুনার ভাব দেখাইয়া উহাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নিষ্ফল করিয়া দিতে হইবে ! ভিতরে ভিতরে নিষ্ফলতার দুঃখে ইহারা গুমরিয়া মরুক !

কিন্তু হায় রে—এমন করিয়া আপনাকে অবিচল রাখাও যে অনেকখানি শক্তির কাজ ! নবাবের এ দুর্ব্বল হাড়ে অতখানি শক্তি আজ নাই ! নবাব প্রাণপণে আপনাকে সম্বরণ করিলেন। বর্ব্বরগুলা তবুও তাহাদের মন্তব্য-প্রকাশে ক্ষান্ত হইল না। নবাব আর কাহারও পানে ফিরিয়া চাহিলেন না। পথে কুকুর চীৎকার করিলে সাহসী পথিক যেমন সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া অটল ঔদাসীন্যে আপনার পথে চলিয়া যায়, সে সকল নীচ মন্তব্যে নবাবও ঠিক তেমনই উদাসীন থাকিয়া অভিনয় দেখিতে লাগিলেন।

এমন সময় প্রথম অঙ্কের শেষে পট পড়িল। তখন সকলে হাঁফ ছাড়িয়া চারিদিকে চাহিয়া নানাবিধ মিশ্র কোলাহলের সৃষ্টি

করিল। কতকগুলা ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা শুধু নবাবের কানে গেল। আপনার বক্সে অটলভাবে বসিয়া সে সব কথার শর নবাব ঔদাসীন্যের দুর্জ্জয় বর্ম্মে রোধ করিতে লাগিলেন।

"চমৎকার বই। এরা প্লে করচেও খাসা—"

"একেবারে নতুন ধরণের বই!"

"নবাব কি বলে এল হে এখানে? বুকের পাটাও ত কম নয়!"

"দেখা যাক—আগাগোড়া বইখানা কেমন দাঁড়ায়!"

"এইটিই প্রথম বই! নতুন নাট্যকার!"

"লি-মার্কারটা একেবারে ব্যারণেস হেমারলিঙের খপ্পরে পড়েছে।"

"তাই হেমারলিঙের এত পসার।"

"আরে ছ্যা! বড়লোকের সবই কি খারাপ!"

"জেঙ্কিন্সটা গেল কোথায়?"

"টিউনিসে আছে। ফেলিসিয়াও তার সঙ্গে জুটে গেছে। বের কাছে দুজনেরই ভারী খাতির! বে'কে ঠেসে পার্ল খাওয়াচ্ছে! পশার জমিয়েছে খুব, সেখানে।"

"একের নম্বর—একেবারে, বুঝলে কি না!"

সহসা নবাবের বক্সের পিছনে মৃদু কোমল কণ্ঠে কে কহিল, "নাই বা আলাপ থাক্‌ল, বাবা—তুমি যাও আলাপ করগে! আহা, উনি নেহাৎ একলা রয়েছেন—"

"কিন্তু আলিন, আমায় যে উনি মোটেই চেনেন না, মা—"

"নাই চিনুন, নিজে থেকে চেনা করে নাও গে! তুমি একটু কথা কওগে। উনিও জানবেন, ওঁর তবু একজন বন্ধুও এখানে আছে—"

পরক্ষণেই নবাব ফিরিয়া দেখেন, এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁহার বক্সে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে বৃদ্ধ জুজ। সে কি আরাম—কি

আশ্বাস পাইয়া নবাব সাগ্রহ বাহু বাড়াইয়া বৃদ্ধকে অভ্যর্থনা করিলেন! বৃদ্ধের তপ্ত হাত আপনার হাতে ধরিয়া নবাব এক অপরূপ স্নেহের সংস্পর্শে মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বেকার সেই বর্ব্বর গ্লানির কথা ভুলিয়া গেলেন। তার পর বহুক্ষণ ধরিয়া নানা বিষয়ে দুইজনে কত কথা কহিলেন। এমন স্নেহ-আশ্বাস-ভরা স্বর নবাব এ সহরে পূর্ব্বে আর কখনও শোনেন নাই! আহা, এতদিন তুমি কোথায় ছিলে, বন্ধু! এই লুঠের আড্ডা, বর্ব্বরতার মজলিসের অন্তরালে এমন একখানি সুন্দর প্রাণ লইয়া লুকাইয়া তুমি কোথায় বসিয়াছিলে! এখানে যশের জন্য, টাকার জন্য দিবারাত্র শৃগাল-কুকুরের দ্বন্দ্ব চলিতেছে—এই কদর্য্য রক্তাক্ত রণ-ক্ষেত্রের পশ্চাতে এমন একখানি স্নেহের নির্ম্মল নিরাময় নীড় আছে জানিলে নবাব যে কবে সেখানে গিয়া মাথা গুঁজিয়া বাঁচিতেন!

ঘণ্টা বাজিল। দর্শকের দল যে যাহার আসনে স্থির হইয়া বসিল। পট উঠিল। দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় সুরু হইল। দর্শকের দলে আবার সেই চোখে-চোখে সঙ্কেতের বাণ ছুটিল।

নবাব ভাবিল, আমি ইহাদের কি করিয়াছি—যে ইহারা এমন বর্ব্বরের মত আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে! পারি কি আর আমায় চায় না? আমার সঙ্গে সব সম্পর্ক তাহার চুকিয়া গিয়াছে?

কিন্তু ছয়মাস! শুধু ছয়মাস নবাব পারিতে আসিয়াছেন। ছয়-মাসেই রাক্ষসের মত নবাবকে তাহার লুব্ধ গ্রাসে পুরিয়া চিবাইয়া হাড় জর-জর করিয়া পারি আজ পথে মাংসের হাড়েই মতই তাঁহাকে ফেলিয়া দিয়াছে! ছয় মাসেই সব নিঃশেষ হইল! নবাবের মাথার মধ্যে আগুন ছুটিতেছিল। দর্শকের দলে তখন অভিনয়-তারিফের সঘন করতালি-নাদ উঠিতেছিল। নবাব চিন্তার সূত্র কাটিয়া অভিনয়ে মনঃসংযোগ করিলেন। রঙ্গমঞ্চে নায়ক তখন বক্তৃতায় শ্লেষের পরা-কাষ্ঠা তুলিয়াছে! এই যে সহরের বুকে বসিয়া রক্তপিপাসু বাঘের

মতই সম্ভ্রান্ত সমাজ গরিবের রক্ত অহরহ শুষিয়া ফিরিতেছে—গরিবের রক্তে দেহ স্ফীত করিয়া, সেই গরিবেরই ঘাড়ে পা দিয়া জুলুমের একশেষ করিতেছে, ইহার কি কোন প্রতিকার নাই?

মুগ্ধ দর্শকের দল নবাবের পানে ঘন ঘন চাহিয়া দেখিতেছিল। যেন এই বিস্তীর্ণ সহরের মধ্যে নবাবই শুধু একটিমাত্র রক্তপিপাসু ব্যাঘ্র, আর উপরে ঐ যে হেমারলিং, লি-মার্কার, ঐ সজ্জিত বক্ষে অপরূপ সাজে সজ্জিত অতগুলা লোক,—উহারা সকলেই নিরীহ মেষ! লুঠ-তরাজের উহারা কিছুই জানে না! ক্রোধে নবাবের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল, সমস্ত শরীর অসহ্য তাপে তাপিয়া উঠিল। দর্শকদের সে দৃষ্টি নির্ব্বাক হইলেও যেন বলিতেছিল, "চলিয়া যাও, চলিয়া যাও, নবাব, তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও। আমাদের সহিত একঘরে বসিবার এতটুকু যোগ্যতাও তোমার নাই।"

নবাবের চোখের সম্মুখে কাহারা যেন নৃত্য করিতেছিল। তাহারাও যেন ঐ সকল দর্শকের সহিত মিশিয়া রুদ্রস্বরে কহিতেছিল, "তুমি চলিয়া যাও, চলিয়া যাও নবাব, এখান হইতে চলিয়া যাও।"

নবাবের মন ঝড়ের মেঘের মতই গর্জ্জন করিয়া উঠিল—কি, অযোগ্য আমি? লক্ষ্মীছাড়া রাক্ষসের দল, তোদের চেয়ে হাজার গুণে আমি শ্রেষ্ঠ! আমার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তোরা হিংসায় জ্বলিয়া খাক্ হইয়া যাইতেছিস—কিন্তু আমার এ ঐশ্বর্য্য, এ ছয় মাসে লুটিয়া লইয়াছে, কারা? তোরা। কাপুরুষ বর্ব্বর, শাদা মনের ফাঁদ পাতিয়া, ভণ্ডামির ঝুলি লইয়া, ভিখারীর বেশ ধরিয়া, নানা-ভাবে আমার এ ঐশ্বর্য্য তোরাই ত লুণ্ঠন করিয়াছিস্! ঘৃণ্য পথের কুকুরের মত আমার এক কণা প্রসাদ পাইবার আশায় আমার ভারী জুতা মাথায় বহিয়াছিস্—আমার এতটুকু উচ্ছিষ্ট পাইবার লোভে

আমার দোরের মাটী চাটিয়াছিস্,—আর আজ এখানে তোরা সাধুর খোলস পরিয়া আমার পানে বর্ব্বর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিতেছিস্—আমি ডাকাত, আমি চোর, আমি লুঠবাজ! ঐ যে মার্কুইস্ জারর জামা গায়ে আঁটিয়া, এক চরিত্র-হীনা নারীকে পাশে বসাইয়া অহঙ্কারে ধরাকে সরা দেখিতেছিস্, তুই ত এই সে দিন আমার পায়ে ধরিয়া সাধিয়া কাঁদিয়া একলক্ষ টাকা ভিক্ষা লইয়াছিলি! না দিলে ক্লাব হইতে অপমান করিয়া তোকে তাড়াইয়া দিবে! আর তুই, বিলাসিনী নারী, যে-সব মণি-মুক্তা আঁটিয়া এখানে আজ তোর ঐশ্বর্য্যের বহর দেখাইতে আসিয়াছিস, ও ঐশ্বর্য্য ত আমারই খোসামোদ করিয়া আমারই হাত হইতে তুই ভিক্ষা লইয়াছিলি! আর তুই নিলর্জ্জ মশার্দ—মাথায় সুধু কালো কালি ভরা, তুই ত আমারই উচ্ছিষ্টে শরীরটাকে এতদিন রক্ষা করিয়া আসিয়াছিস্, তারপর ভিক্ষা বন্ধ করিয়াছি বলিয়া আমায় আজ কুকুরের মত দংশন করিয়া ফিরিতেছিস্—তোকে কি মানুষ বলিয়া ভাবি? সে দিন পথে আমার হাতের চাবুক খাইয়াও তোর লজ্জা হয় নাই, তাই তুই ঐ ধবল-রোগী গণিকাটাকে লইয়া এখানে আসিয়া বসিতে পারিয়াছিস্! আর এই তোদের পারির সমাজ—তোদের মত পাষণ্ডদের মাথায় তুলিয়া নাচিয়া ফিরিতেছে! আমাকে পরিহাস করিস্ তোরা? আমার জুতা খুলিবার যোগ্যতাও যদি তোদের থাকিত রে! তোরা আমার কুৎসা করিস্? তোদের চেয়ে আমার আসন অনেক,—অনেক উপরে, তা তোরা জানিস্?

ক্ষুব্ধ প্রাণের মধ্যে কথাগুলা বিকট চাৎকারে গর্জ্জন করিতেছিল! একটা অস্থির উত্তেজনায় নবাবের শিরাগুলা ফুলিয়া উঠিতেছিল কেবলই তাঁহার মনে হইতেছিল, আর না, আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না। এখনই একটা বিরাট জলোচ্ছ্বাসের মত ঐ হতভাগা জনতার উপর লাফাইয়া পড়িয়া মুহূর্ত্তে তাহাদিগকে আহত, বিধ্বস্ত করিয়া

দি! দারুণ উন্মাদনায় নবাবের সারা চিত্ত মাতিয়া উঠিল। শুধু নখ দিয়াই এই বর্ব্বর দর্শকদের একটি একটি করিয়া টুঁটি ছিঁড়িয়া ঐ নির্লজ্জ মুখগুলাকে ছিন্ন-ভিন্ন করিবার বাসনা মুহুর্মুহু তাঁহার প্রাণখানাকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিতেছিল। নবাব ত গিয়াছেনই! সঙ্গে সঙ্গে এই লোকগুলারও অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিয়া যাইতে হইবে!

নববের চোখের সম্মুখে রঙ্গালয়ের উজ্জ্বল আলোগুলা চকিতে সহসা ম্লান হইয়া গেল—অভিনেতার উচ্চ চাৎকার ক্ষাণ হইল। নবাবের মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল, দেহ ঢুলিয়া আসিল। নবাবের মনে হইল, সহসা যেন পৃথিবীখানা ভীষণ ভূমিকম্পের বেগে দুলিয়া উঠিয়াছে—আসনে বসিয়া মাথাটাকেও আর খাড়া রাখা যায় না! কে যেন জোর করিয়া টানিয়া তাঁহাকে শোয়াইয়া দিতে চাহিতেছে! বুকের কাছে কি যেন ঠেলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে! সহসা পরক্ষণেই চোখ তাঁহার মুদিয়া আসিল। নবাবের শির হেলিয়া পড়িল।

চকিতে অমনি কে আসিয়া পিছন হইতে ডাকিল, "নবাব, মসুঁ—"! এ যে বড় পরিচিত স্বর—বড় স্নেহ-কোমল! কিন্তু বড় দূর হইতে এ সাড়া আসিতেছে না? মার্শেল—মার্শেল—সে যে বহুদূরে!

নিরুপায় মজ্জমানের মত নবাব শূন্যে হাত বাড়াইলেন—কাহার তপ্ত স্পর্শ উত্তেজিত শিরায় মুহূর্ত্তে অমনি স্নিগ্ধতার প্রলেপ সিঞ্চন করিল। তারপর ক্ষাণ, অতি-ক্ষীণ কণ্ঠে কে কহিল, "আমি এসেচি, নবাব, আমি—আমি গেরি!" নবাব মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। গেরি দুই হাতে টানিয়া নবাবকে বুকে তুলিয়া পাশের একটা জনহীন অন্ধকার বারান্দায় লইয়া আসিল। অধীর দর্শকের দল উল্লাসে মাতিয়া তখন "সাবাস, সাবাস!" বলিয়া চীৎকার করিতেছিল। আলোর লহরে রঙ্গালয় হাসিয়া সারা হইয়া যাইতেছিল।

রক্ত-ক্ষরণ, ক্যাপিং-গ্লাস, পুলটিস কিছুতেই আর সে অচেতন শরীরে চেতনা ফুটাইতে পারিল না। দুইজন ডাক্তার ও সুদক্ষ শুশ্রূষাকারী হিমসিম খাইয়া গেল, গেরি তাহার সকল শক্তি লইয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিল ; কিন্তু নবাবের চৈতন্য ফিরিবার কিছুমাত্র আশা দেখা গেল না। কার্দ্দেলাক নিজে দেখিতে আসিতে পারিল না ; তখন সে ভারী ব্যস্ত, তবে লোক পাঠাইয়া দিল, সেবার যেন কোন ত্রুটি না হয়! আরও সে লোকের মুখে বলিয়া পাঠাইল, পঞ্চম অঙ্কের যবনিকা পড়িলেই সে ছুটিয়া আসিবে!

বারান্দার এককোণে থিয়েটারের যত কিছু পরিত্যক্ত আসবাব পড়িয়াছিল,—ছিন্ন-ভিন্ন দৃশ্যপট, কাঠের বড় বড় বাক্স, কাঠের ভাঙ্গা সিঁড়ি, ফুটা বালতি, পায়া-হারানো অকেজো টেবিল, আবর্জ্জনার স্তূপ! তাহারই মধ্যে গেরি কোথা হইতে একখানা সোফা টানিয়া আনিয়া নবাবের দেহকে তাহার উপর শোয়াইয়া দিয়াছিল। এ যেন জল-গিরি-শৃঙ্গে চূর্ণ একখানা জাহাজকে ডাঙ্গার এক ধারে কাহারা টানিয়া তুলিয়াছে! তেমনই বিশাল দেহ, সর্ব্বাঙ্গে তাহার বিরাট হৃদয়-ভেদী ধ্বংসের তেমনই চিহ্ন!

কপালে হাত দিয়া গেরি নবাবের মুখের পানে চাহিয়া ছিল। তাহার চোখ জলে ভরা! হায়, একটু দেরী হইয়া গিয়াছে—আর যদি কয় মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সে আসিয়া পৌঁছিতে পারিত! রাক্ষসের গ্রাস হইতে কিছুও যে সে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে, এ খবরটা নিজের মুখে নবাবকে দিতে পারিলে হয়ত এতখানি কাণ্ড ঘটিত না!

বাহিরে আবার করতালির বজ্রনাদ উঠিল, সারা রঙ্গগৃহ সে শব্দে কাঁপিয়া উঠিল। তাহার পরক্ষণেই বাহিরে গাড়ী-ঘোড়ার শব্দ ও লোকের কোলাহল মুহূর্ত্তে জানাইয়া দিল, অভিনয় শেষ হইয়াছে—বিভ্রম-দীপ্ত দর্শকের দল দারুণ সুখের উচ্ছ্বাসে মাতিয়া গৃহে ফিরিতেছে! নবীন

নাট্যকারের ললাটে প্রশংসার জয়-টীকা পরাইয়া, তাহার প্রাণে নব-জীবনের উন্মেষ-রাগ ফুটাইয়া দলে দলে যখন সব গৃহে ফিরিয়াছে, তখন ও-ধারে এই থিয়েটারেরই এক পরিত্যক্ত নিভৃত কোণে—কি এক শোচনীয় করুণ নাটকের অভিনয় চলিয়াছে! কেহ জানে না, কেহ তাহার সন্ধানও রাখিতে চায় না! হৃদয়-হীন বর্ব্বর সহর!

অথচ এই রাত্রিটিরই আগমন-কল্পনায় নবাব কতদিন অধীর আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন! এই আলো, হাসি ও গানের সমারোহ-দৃশ্য ভাবিয়া কতখানি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছেন! হায়, ঘুণাক্ষরেও তিনি ভাবেন নাই, একদিন এখানে আলো জ্বলিবে, তবে সে তাঁহাকে পুড়াইবার জন্য—হাসিও ফুটিবে, কিন্তু হায়, সে তাঁহারই এই শান্ত সহানুভূতিকে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করিবার জন্য!

সহসা নবাবের দেহ একবার কম্পিত হইল—ওষ্ঠ একবার নড়িল, মুদিত চক্ষু একবার গেরির মুখ লক্ষ্য করিয়া পল্লব মেলিল—মৃত্যুর পূর্ব্বে সে চাহনি যেন গেরিকে পারির এই নিষ্ঠুর বর্ব্বর ষড়যন্ত্র, এই দারুণ শোচনীয় হত্যা-ব্যাপারের একমাত্র সাক্ষ্য থাকিবার করুণ মিনতি জানাইয়া পরক্ষণেই আবার চিরকালের জন্য মুদিয়া গেল!

শেষ

সৌরীন্দ্রবাবুর অন্যান্য গ্রন্থ

উপন্যাস

কাজরী	... ...	১॥০
দরদী	... (২য় সংস্করণ) ...	১৲
পথের পথিক	... ...	।৶০
মাতৃঋণ	... ...	১॥০
বন্দী	... (২য় সংস্করণ) ...	॥০

ছোটগল্প

শেফালি	... (২য় সংস্করণ) ...	৸০
মণিদীপ	... ...	১৲
পুষ্পক	... ...	১৲
নির্ঝর	... (২য় সংস্করণ) ...	॥০
পরদেশী	...(২য় সংস্করণ) ...	॥০
বৈকালি	... ...	॥০
সাঁঝের বাতি	... (ছেলেমেয়েদের গল্প) ...	॥০
ফুলের পাখা	... ঐ ...	যন্ত্রস্থ

নাট্যগ্রন্থ

যৎকিঞ্চিৎ	২য় সংস্করণ	ষ্টারে অভিনীত	...	...	॥৹
দশচক্র	২য় সংস্করণ	ঐ	...	...	।৶৹
পঞ্চশর	...	ঐ	...	...	।৵৹
শেষ বেশ	...	ঐ	...	...	।৴৹
গ্রহের ফের	...	কোহিনুরে অভিনীত	...	...	।৹
দরিয়া	...	মিনার্ভায় অভিনীত	...	...	॥৹
রুমেলা	...	ঐ	...	...	॥৹
হাতের পাঁচ	...	ঐ	...	...	।৴৹

সমস্ত গ্রন্থই রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয় ৬১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা ও গ্রন্থকারের নিকট ১৭নং মোহনবাগান রো, কলিকাতা—এই ঠিকানায় পাওয়া যায়।

জনসাধারণের প্রতি

অন্য কোন দোকানে যে কোন লেখকের পুস্তকের অর্ডার দিয়া না পাইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগের নিকট লিখিলেই বাধিত ও অনুগৃহীত হইব। খুব সম্ভব সে পুস্তক আমরা আপনাকে পাঠাইতে পারিব।

সাধারণের প্রতি

আমাদের প্রকাশিত পুস্তক সকল অন্যান্য দোকানে না পাইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগের নিকট পত্র লিখিলে বাধিত ও অনুগৃহীত হইব। পুস্তক প্রকাশিত না হইলে আমরা কখনও প্রকাশ্য সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন দিই না। ইতি

নিবেদক

রাজলক্ষ্মী পুস্তকালয়

৬১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লণ্ডন-কাহিনী

রত্ন-মন্দির

শ্রীমতী বনলতা দেবী প্রণীত

এরূপ উৎকৃষ্ট ধরণের উপন্যাস বহুকাল বাংলা সাহিত্যে প্রকাশিত হয় নাই। রেশমী প্যাডে বাঁধাই, মূল্য ১৷৷৹ টাকা।

অভিসার

শ্রীযুক্ত শ্রীপতিমোহন ঘোষ প্রণীত

অবসর যাপনের উপযোগী করিয়া লিখিত উপন্যাস।

মূল্য ১।৹ পাঁচসিকা।

শ্রীযুক্ত সুধাকৃষ্ণ বাগচি প্রণীত

বাজে উপন্যাস ও গল্প পাঠ করিয়া যাঁহারা বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে একবার এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহা উপহারের ও ভ্রমণকারীর অপূর্ব্ব সঙ্গী-পুস্তক। সাটিনে বাঁধাই দেখিয়া ক্রয় করিবেন বাজে সংস্করণ লইবেন না। মূল্য ১।৹ পাঁচসিকা।

শিল্প-বিজ্ঞান

অপূর্ব্ব কার্য্যকরী পুস্তক। সামান্য ১০।২০ টাকায় পরের চাকুরী করা অপেক্ষা এমন স্বাধীন-জীবিকা থাকিতে আর অর্থের জন্য এত ভাবেন কেন? কার্য্যকরী উপদেশসহ এই পুস্তকখানির প্রত্যেকটী পৃষ্ঠা নিরন্ন বাঙ্গালীর ঘরে অন্ন যোগাইবার জন্য, বেকার লোকের কাজকর্ম্ম জুটাইবার জন্য, আমাদিগের আশে পাশে, বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্ব্বতে, কোথায় কি ধনরত্ন, আছে তাহার সন্ধান বলিয়া দিবার জন্য; বিনা মূলধনে বা অল্প ও সামান্যমাত্র মূলধন বা পুঁজিতে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিবার জন্য, এক কথায় জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়া সংসারযাত্রা সহজে নির্ব্বাহ করিবার জন্য, "শিল্প বিজ্ঞান" বহু পরিশ্রমে ও আয়াসে লিখিত হইয়াছে, এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম-এ মহাশয়ের আষাঢ় সংখ্যা ভারতবর্ষে লিখিত প্রবন্ধে উল্লেখযোগ্য পুস্তক সকলের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। বহুমূল্য বিলাতি এণ্টিক কাগজে ছাপা, ডবলক্রাউন ১৬ পেজি সাইজ, মূল্য ১৲ মাত্র।

মাতৃদেবী

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত

নূতন ধরণের নূতন সুখপাঠ্য বই মূল্য ১।০ দেড় টাকা

ব্রহ্ম-নন্দিনী

সতী জগন্মোহিনী দেবী

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের সহধর্ম্মিণীর জীবনী। এই জীবনী এত অধিক ঘটনা-বহুল ও শিক্ষাপ্রদ যে ইহার আলোচনা ও অধ্যয়নে যথার্থই আত্মার পরম কল্যাণ সাধন হয়। এই পবিত্র জীবনীর উল্লিখিত বিবরণ সমুদয় অধিকাংশই কোচবেহারের মহারাজমাতা শ্রীশ্রীমতী সুনীতি দেবী সি, আই, ই এবং ময়ূরভঞ্জের মহারাণী শ্রীশ্রীমতী সুচারু দেবীর অমৃতনিস্যন্দিনী লেখনী প্রসূত। এরূপ অপূর্ব্ব শিক্ষনীয় জীবনী নারী জীবনের অলঙ্কার স্বরূপ। এ পুস্তক প্রত্যেক পাঠাগারে—প্রত্যেক স্কুলে ও প্রত্যেক গৃহে রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। ইহাতে ইংলণ্ডস্থ রাজ-পরিবারের ও প্রধান ব্যক্তিবর্গের লিখিত পত্রের প্রতিলিপি (যাহা কমলকুটীরে প্রকাশ্যস্থানে রক্ষিত আছে) প্রদত্ত হইয়াছে। বিপুল অর্থব্যয়ে বহুমূল্যকাগজে, বহুচিত্রে শোভিত হইয়া বিলাতী উৎকৃষ্ট বাঁধাই সহ সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইল। প্রকাণ্ড গ্রন্থ কিন্তু মূল্য তদনুসারে সামান্য ২৲ টাকা মাত্র।

স্বদেশ-কুসুম

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রাইজের জন্য নূতন ধরণের অপূর্ব্ব ছেলেভুলান ছড়ার বই। মূল্য।৹ আনা।

শ্রীমতীবনলতা দেবী প্রণীত

লক্ষ্মীশ্রী

দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থ কলেবর বহু বাড়িয়াছে।

এই পুস্তকখানি প্রত্যেক কুল-মহিলার পক্ষে কিরূপ অত্যাবশ্যকীয় তাহা সামান্য বিজ্ঞাপনের দ্বারা বুঝানো অসম্ভব। সামান্য অন্ন রন্ধন হইতে পোলাও, কালিয়া, মাংস, পিষ্টক, সন্দেশ মিঠাই প্রভৃতি প্রস্তুত-প্রণালী আধুনিক ধরণে বর্ত্তমান সময়োপযোগী করিয়া লিখিত ও সন্নিবেশিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যত প্রকার দেশী ও বিলাতী রন্ধন প্রচলিত হইয়াছে তাহার প্রায় সমস্তই ইহাতে সহজ ভাষায় বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলির নাম, নিম্নে প্রদত্ত হইল, তাহা হইতেই পাঠক কতকটা বুঝিতে পারিবেন।

স্বদেশী পাক, সহজ অন্ন-রন্ধন-প্রণালী, ঘৃত অন্ন, হলুদে ভাত, মিষ্টান্ন, খিচুড়ী প্রস্তুতকরণ, ভূনি খিচুড়ী, ভাজা ভাত, শাকের ঘণ্ট, মোচার ঘণ্ট, কড়াইসুটীর ঘণ্ট, শুক্তো, মুগের ডাউল প্রস্তুত প্রণালী, ঘি চাপা ওলের ডাল্না, ইচড় বা কাঁটালের ডাল্না, কাঁটালের চপ ও কাটলেট, নিমঝোল, মূলার শুক্তো, কাঁচা পেঁপের ডাল্না, বাঁশের কোঁড়ার ডাল্না, বাঁধাকপির ডাল্না, ছানার ডাল্না, ফুলকপির ডাল্না, করোলার দোল্মা, পটলের দোল্মা, কড়াইসুটীর ডাল্না, বাঁধাকপি ও দুধের পায়স, ও রাব্‌রি, ওল ভাজা, নিরামিষ অম্ল, খেজুর রসের অম্ল, নলেন গুড় ও বাতাসার পায়েস, মৎস্য ও মাংস রন্ধন-প্রণালী, মাছের বড়া,

মুড়ির ঘণ্ট, মাছের ঘণ্ট, বাঁধাকপির সহিত কৈ মাছের তরকারি, রুই মাছের প্রলেহ, মাছের ঝোল ও মাছের

খরচ, প্রভৃতি সাংসারিক খুটিনাটী, সময়ের সদ্ব্যবহার শিক্ষা, পিতামাতা, একান্নবর্ত্তী পরিবার, শ্বশুর-শাশুড়ী, গুরুজন, আত্মীয় স্বজন, দাসদাসী প্রভৃতির সহিত কর্ত্তব্য ও ব্যবহার ইত্যাদি এত অধিক শিক্ষণীয় বিষয় কুললক্ষ্মীদিগের জন্য আর কোনও বাংলা পুস্তকে লিখিত হয় নাই। একখানি লক্ষ্মীশ্রী থাকিলে সংসার লক্ষ্মীশ্রীতে ভরিয়া উঠিবে। প্রত্যেক বধূকে প্রকৃত-গৃহিণীতে পরিণত করিবে।